আজি হতে শতবর্ষ পরে

নারায়ণ সান্যাল

গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট | কলিকাতা-৭০০ ০১২

শ্রীজিতেন্দ্রিয়নাথ রায়চৌধুরী

বাল্যবন্ধুবরেষু—

॥ কৈফিয়ৎ ॥

: "সম্ভবপরের জন্য প্রস্তুত থাকার নামই সভ্যতা।"

—কথাটা অমিট্রায়ের। দুর্ভাগ্যবশতঃ কথাটা সেদিন আমরা তর্কের খাতিরে মেনে নিয়েছিলাম, জীবনের খাতিরে মেনে নিইনি। নিলে, প্রস্তুত থাকি না থাকি, সম্ভবপরের কথাটা আলোচনা করে দেখতাম। ভবিষ্যৎ-বিজ্ঞান বা Futurology নিয়ে কোনও চিন্তা, ভাবনা, আলোচনা অথবা গবেষণা যদি বাঙলা সাহিত্যে আদৌ হয়ে থাকে তাহলে সেটা আমার নজর এড়িয়েছে—মাসিক পত্রিকায় বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ছাড়া অবশ্য। যেন আমরা সবাই সর্ট-সাইটে ভুগছি—নাকের ডগা ছাড়া নজর চলে না। দণ্ডকারণ্যে আদিবাসীদের দেখেছি—তারা 'আজ' বোঝে, 'আগামীকালও' বোঝে, 'আগামী পরশুটা' বুঝতে হলে মাথা চুলকায়। 'ফিন হপ্তা' শব্দটার অর্থ যারা বোঝে, তারা রীতিমত পক্ককেশ জ্ঞানবৃদ্ধ—ওদের জাতে 'হোয়াইট হেড।' শহুরে শিক্ষিত আমাদের দৃষ্টি আর একটু দূরে যেতে পারে। হিসাব করি—কবে রিটায়ার করব, কবে দীর্ঘমেয়াদী জীবন-বীমাটায় পাকা-পেঁপের রঙ ধরবে, বড় জোর পৈত্রিক বসত বাড়িটা আমার অবর্তমানে কী ভাবে তিন-ছেলের মধ্যে ভাগাভাগি হবে। ব্যস্! তার চেয়ে বেশী দূরে তাকাতে গেলেই 'মস্তকপাতন'! যদি দুঃসাহসী কেউ গলা বাড়িয়ে একটু বেশী দূরে দেখতে চায়, তাকে জ্ঞানবৃদ্ধদের ধমক শুনতে হয়। বেচারী কাঁসার ঘটি যদি পরিমাপ করে দেখতে চায়—কতবার অসঙ্কোচে কূপের গভীরে ডুব মারা যাবে, তখনই কূপ ধমক দিয়ে ওঠে: কিন্তু বাপু তার লাগি তুমি কেন ভাব? যত বার ইচ্ছা যায় ততবার নাবো/তুমি যত নিতে পার সব যদি নাও/তবু আমি টিকে রব দিয়ে থুয়ে তাও/"

আতঙ্কিত চকোরী যদি চাঁদকে শুধায়, "তুমি নাকি একদিন রবে না ত্রিদিবে? মহাপ্রলয়ের কালে যাবে নাকি নিবে?" অমনি চাঁদও তাকে ধমকে ওঠে—"চাঁদ কহে, পণ্ডিতের ঘরে যাও প্রিয়া/তোমার কতটা আয়ু এস শুধাইয়া।"

পশ্চিমখণ্ডও কথাটা শুনেছিল। অমিট্রায়ের কণ্ঠে নয়, বার্টাণ্ড রাসেলের

লেখনীতে "Primary quality of a civilised being is fore-sight"— ভাষান্তরে যা অমিট্রায়েরই ভাষণ। ওরা কিন্তু কথাটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছিল। ও দেশের কাঁসার ঘটি চেঁচামেচি করেনি—খাতা-কলম-স্লাইডরুল এবং ইদানিং ইলেকট্রনিক কম্পুটার নিয়ে আঁক কষে দেখেছে—কতবার কুপে নামা যাবে।

ভবিষ্যৎ-বিজ্ঞান বা Futurology নিয়ে ও দেশে চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছিল অনেক দিন আগে থেকেই—অতি সাম্প্রতিককালে সে বিষয়ে অত্যন্ত ব্যাপক ও গভীর গবেষণা চলেছে। বিষয়বস্তুটা এখন বিজ্ঞানের একটি স্বীকৃত শাখা। পাঠক লক্ষ্য করলে দেখবেন, এ গ্রন্থের শেষে যে গ্রন্থপঞ্জীর তালিকা দিয়েছি, তার অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশকাল গত দশ বছরের ভিতর। আশ্চর্যের কথা —বাঙলা ভাষায় এ বিষয়ে মৌলিক-চিন্তার বহিঃপ্রকাশ তো দেখা যায়ই, এমন কি অনুবাদ সাহিত্যও গড়ে ওঠেনি। তার চেয়েও দুঃখের কথা, গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লিখিত বইগুলির শতকরা দশভাগও এখনও আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হয় নি!

লক্ষ্য করে দেখেছি—সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহের বুদ্ধিজীবী বাসিন্দাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে পশ্চিমখণ্ডের পণ্ডিতমহল দ্বিধাবিভক্ত। একদল নিরাশাবাদী অঙ্ক কষে বলছেন, মানব সভ্যতার অনিবার্য অবলুপ্তি প্রত্যাসন্ন, অবশ্য একই নিঃশ্বাসে তাঁরা বলছেন, 'যদি না আমরা সতর্ক হয়ে আত্মসংশোধন করি।' দ্বিতীয়দল আশাবাদী—তাঁরা পূর্বোক্তদলের ঐ নিদান হাঁকাটাকে নস্যাৎ করে প্রমাণ দিতে চান—মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ অবশ্যম্ভাবী, তার আশু অবলুপ্তির আশঙ্কা যারা করে তারা বাতুল।

আরও লক্ষ্য করে দেখছি, দু-দল চিন্তাবিদই হচ্ছেন মূলতঃ বৈজ্ঞানিক। তাঁরা ভবিষ্যৎকে ধরতে চেয়েছেন ল্যাবরেটারীতে, অঙ্কের বীতংসে, প্রযুক্তি বিদ্যার মাপকাঠিতে মেপে। দু'দলের বক্তব্য পড়ে অনধিকারী আমার মনে হয়েছে যে, বোধকরি মানবেতিহাসের ভবিষ্যৎকে শুধু অঙ্কের খ্যাপলা জালে ধরা যাবে না। 'দর্শন'ও একটি অনস্বীকার্য মাপকাঠি। প্রযুক্তি বিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে আগামী যুগে মানুষের শুভবুদ্ধিরও উন্নতি হতে বাধ্য। বুদ্ধ, যীশু, রোমা রোঁলা, রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন অথবা মার্কস্-এ্যাঙ্গেলস্-লেনিনের চিন্তাধারা—কোনটা প্রাধান্যলাভ করবে বলা কঠিন; কিন্তু সঙ্কট যখন চরমে উঠবে, তখন অস্তিদলকে বাধ্য হয়ে 'দুর্ভিক্ষের দ্বারে বসে ভাগ করে খেতে হবে সকলের সাথে অন্নপান।' এ কথাটা নিয়ে ওঁরা আলোচনা করেননি। বুদ্ধ যীশু-গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী সম্বন্ধে দু'দলই নীরব। অপরপক্ষে মার্কস্-লেনিনের চিন্তাধারায় তাঁরা স্পষ্টতই অবিশ্বাসী।

রাশিয়া, চীন বা অন্যান্য কম্যুনিস্ট দেশের ভবিষ্যৎ-বিজ্ঞানীরা কে কী বলছেন তা অবশ্য জানতে পারিনি—সে সব গ্রন্থ এদেশে ভিসাই পায় না।

তাই আমরা আমাদের আলোচনাটাকে এই ভাবে সাজিয়েছি: প্রথমে আমরা নৈরাশ্যবাদীদের যুক্তি শুনব, যাদের জুরিগানের মূল ধুয়ো: 'মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর!' দ্বিতীয়তঃ আমরা আশাবাদীদের প্রতিবাদটা শুনব, যাদের বক্তব্য—'এ তুফান ভারি দিতে হবে পাড়ি নিতে হবে তরী পার।' এবং তারপরে পশ্চিমখণ্ডের পণ্ডিত যে কথা বলেন নি, সেই কথাটাই বলবার চেষ্টা করব একবার, 'আমি মৃত্যু চেয়ে বড়, এই শেষ কথা বলে, যাব আমি চলে।'

ভেবেছিলাম, এবার নিছক বিজ্ঞান-ভিত্তিক প্রবন্ধ লিখব। পশ্চিমখণ্ডের পণ্ডিতেরা যেমন লিখেছেন। কাল হল, ঋত্বিক ঘটকের শেষ শিল্পসৃষ্টি দেখে এসে। যুক্তি-তর্কই নাকি শিল্পের শেষ কথা হতে পারে না। তাকে হতে হবে 'যুক্তি-তর্ক-গল্প'।

'আজি হতে শতবর্ষ পরে'-র অগ্রজ ঃ

বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প, বল্মীক, ব্রাত্য (ওপার বাঙলার আগে)
বাস্তুবিজ্ঞান, মনামী, নৈমিষারণ্য, দণ্ডকশবরী, অন্তর্লীনা,
অলকনন্দা, মহাকালের মন্দির, পথের মহাপ্রস্থান, নীলিমায় নীল,
সত্যকাম, অপরূপা অজন্তা, নাগচম্পা, তাজের স্বপ্ন,
আমি নেতাজীকে দেখেছি, নেতাজী রহস্য সন্ধানে, পাষণ্ড পণ্ডিত,
জাপান থেকে ফিরে, কালো-কালো, সার্লক হেবো,
আবার যদি ইচ্ছা কর, কলিঙ্গের দেব-দেউল,
আমি রাসবিহারীকে দেখেছি, গজমুক্তা, বিহঙ্গ বাসনা,
বিশ্বাসঘাতক, সোনার কাঁটা, মাছের কাঁটা, অশ্লীলতার দায়ে,
লাল-ত্রিকোণ, পথের কাঁটা, নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা,

'আজি হতে শতবর্ষ পরে'-র সহজাত ঃ

অবাক পৃথিবী
অজন্তা অপরূপা
পঞ্চাশোর্ধ্বে
Immortal Ajanta.

॥ প্রথম পর্ব ॥

॥ আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব ॥

এক—নৈরাশ্যবাদীদের বক্তব্য :

আজ থেকে ঠিক আট বছর আগে ১৯৬০ সালে রোমের একজন বিশিষ্ট শিল্পপতির আহ্বানে জনা-ত্রিশেক পণ্ডিত সমবেত হয়েছিলেন মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটি আলোচনা চক্রে যোগ দিতে। তা থেকেই জন্ম নিল চিন্তাবিদ্‌দের একটি সংস্থা—'দ্য ক্লাব অব রোম'। গোটা পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, প্রাকৃতিক সমস্যা নিয়ে তাঁরা আলোচনা করে সিদ্ধান্তে আসতে চাইলেন—মানবসভ্যতার পরিণাম কী! প্রাথমিক কয়েকটি মিটিং-এর পর ১৯৬০ সালে কেম্ব্রিজ অধিবেশনে আমেরিকার ম্যাসাচুসেট্‌স্ ইন্সটিট্যুট অব টেক্‌নোলজির অধ্যাপক ফরেস্টারের উৎসাহে স্থির হল—একদল বিশেষজ্ঞ এ-নিয়ে রীতিমত গবেষণা করে দেখবেন। ভক্সওয়্যাগন ফাউণ্ডেশনের অর্থানুকূল্যে ষোলোজন বিশেষজ্ঞ অতঃপর এ নিয়ে দীর্ঘ গবেষণা করেন, যার পরিণাম হিসাবে সঙ্কলিত হল কিছু টেক্‌নিক্যাল রিপোর্ট এবং '৬০ সালে প্রকাশিত হল সাধারণ-বোধ্য একটি গ্রন্থ—'দ্য লিমিট্‌স্ টু গ্রোথ' বা বৃদ্ধির সীমা। এই গ্রন্থটিকেই আমি নৈরাশ্যবাদী দলের মূল বক্তব্য বলে ধরে নিচ্ছি, যদিও সমসময়ে ও পরে অসংখ্য পণ্ডিত এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। 'ক্লাব অব রোম' যে বিষয়গুলির অবতারণা করেন নি অথচ যা পরবর্তী পণ্ডিতেরা আলোচনা করেছেন সে প্রসঙ্গেও যথাকালে আসা যাবে।

এঁদের মূল প্রতিপাদ্য—পৃথিবীর সামনে আজ একাধিক সমস্যা:

অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে, যার প্রতিবিধানের ক্ষমতা আমাদের নেই, যা অনিবার্য। অনতিবিলম্বে সেই বর্ধমান সমস্যাগুলি এমন ভয়াবহ ও ব্যাপক আকার ধারণ করবে যে, প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতি সত্ত্বেও গোটা পৃথিবী অদূর ভবিষ্যতে একটা অচল অবস্থার সম্মুখীন হতে বাধ্য। অসংখ্য সমস্যার ভিতর ওঁরা যেগুলিকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সেগুলি হ'ল —জনসংখ্যার বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, যন্ত্রসভ্যতার বৃদ্ধিজনিত সমস্যা, শক্তি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের অবক্ষয়, আবহাওয়া দূষিত হওয়া ইত্যাদি। ওঁরা যে সমস্যাগুলিকে খুব বেশী গুরুত্ব দেননি, অথচ যেগুলিকে পরবর্তী নৈরাশ্যবাদীরা গুরুতর বলে মনে করেছেন সেগুলি হচ্ছে—দ্রুতচ্ছন্দ পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ-খাইয়ে নেওয়ার অক্ষমতা, তদ্‌জনিত মানসিক বৈকল্য, অখণ্ড অবসরের অভিশাপ, পারমাণবিক যুদ্ধ, ইত্যাদি। আমরা এবার একে একে সমস্যাগুলিকে যাচাই করে দেখব।

কিন্তু তার আগে এ শাস্ত্রের ব্যাকরণটা মোটামুটি বুঝে নিতে হয়। একটু হয়তো খটমট—কিন্তু উপায় নেই! 'সারেগামার' ধাপ এড়িয়ে তো গান শেখা যায় না। প্রথম কথা—সংখ্যা-তত্ত্ব।

সংখ্যা-তত্ত্ব: ইংরাজী বইতে বৃহৎ-বৃহৎ সংখ্যাগুলি প্রকাশিত হয়—মিলিয়ান, বিলিয়ান, ট্রিলিয়ানে। আমরা তাতে অভ্যস্ত নই। তাই পারতপক্ষে আমরা 'লক্ষ' এবং 'কোটি' শব্দ দুটিই ব্যবহার করব। কিন্তু গোটা পৃথিবী কিম্বা মহাকাশ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে হলে স্থানে-স্থানে আমরা দেখব ঐ কোটির লগিতে 'একবাম মেলে না'! অর্বুদ, পরার্ধ, প্রভৃতি সংখ্যা এককালে ভারতীয় পণ্ডিতের কাছে যতই পরিচিত মনে হ'ক, আমাদের কাছে আজ তারা মিলিয়ান-বিলিয়ানের চেয়েও অপরিচিত। আবার হাজার কোটি, দশলক্ষ কোটি প্রভৃতি সংখ্যা শুধুমাত্র ধাঁধার সৃষ্টি করবে—বোধের জন্ম দেবে না। তাই সেসব ক্ষেত্রে আমরা বরং অঙ্কশাস্ত্রের প্রচলিত নিয়ম মেনে সংখ্যাগুলি লিখব। আমরা জানি, কোটি লিখতে হলে

‘এক’-এর পিছনে সাতটা শূন্য বসাতে হয়। কোটি লিখতে গণিতজ্ঞরা ১,০০,০০,০০০ না লিখে লেখেন ১০^{৭}। ফলে, দশ কোটি হচ্ছে ১০×১০^{৭}=১০^{৮}। এবার থেকে তাই ‘শতকোটি প্রণামান্তে নিবেদন’ না লিখে আমরা লিখতে পারি ‘১০^{৯} প্রণামান্তে নিবেদন’!

হ্রাসবৃদ্ধি তত্ত্ব : কোন কিছু যোগ হলে বাড়ে, বিয়োগ হলে কমে—এ তো আপার-প্রেপ্-এই শিখেছি ; এ নিয়ে আবার তত্ত্বকথা কেন? তত্ত্বকথা উঠছে এজন্য—যে শাস্ত্র নিয়ে আমরা বিচার করতে বসেছি, সেখানে যোগ-বিয়োগের ধাঁচটা একটু ভিন্ন প্রকারের। তার রকমফের হয়। শৈশবে শেখা যোগ-বিয়োগের অঙ্কে এখানে সবসময়ে হিসাব মিলবে না। জীবনটা তো শুধু সরল অঙ্কের ছকে বাঁধা নয়! কেমন জান? একটা উদাহরণ দিই—তাহলেই বুঝবে।

ধর রামবাবু বিবাহ-রাত্রে নববধূকে একটি লক্ষ্মীর ঝাঁপি উপহার দিয়েছিলেন, যাতে ছিল একটি একশ টাকার নোট এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, প্রতিটি বিবাহ বার্ষিকীতে তিনি ঐ বাক্সে দশ টাকা করে জমা দেবেন। ধরা যাক ওঁদের দাম্পত্যজীবনের সুবর্ণজয়ন্তী অতিক্রান্ত হওয়া মাত্র রামবাবু পটল উৎপাটন করলেন। এখন তাঁর স্ত্রী ঝাঁপি খুলে কত টাকা পাবেন? সোজা হিসাব—প্রথম জমা ১০০ টাকা এবং পঞ্চাশ বছরে দশ টাকা হিসাবে ৫০০ টাকা, একুনে সর্বসমেত ৬০০ টাকা। কেমন তো?

কিন্তু তা যদি না হয়? যদি পঞ্চাশ বছর বিবাহিত জীবনান্তে সদ্য-বিধবা তাঁর ঝাঁপি খুলে দেখেন তাতে জমা আছে মাত্র ২২০ টাকা? তখন কী বলবে? রামবাবু তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নি? ঝাঁপি থেকে টাকা চুরি গেছে? হতে পারে। এ দুনিয়ার যা হাল—দুটোই হতে পারে। কিন্তু তৃতীয় একটি বিকল্প সম্ভাবনার কথা তো কই তুমি বললে না? আমি যদি বলি—রামবাবু তাঁর প্রতিশ্রুতি আদৌ ভঙ্গ করেন নি এবং টাকাও চুরি যায় নি?

হ্যাঁ, তাও হতে পারি—যদি মনে করি রামবাবু তাঁর ধর্মপত্নীর

পাণিপীড়ন করেছিলেন কোন একটি লীপ-ইয়ারের ২৯শে ফেব্রুয়ারী। সে-ক্ষেত্রে পঞ্চাশ বছরে তাঁদের দাম্পত্যজীবনে বিবাহ-বার্ষিকী এসেছে মাত্র বারো বার। তাই নয় ?

রামবাবুর স্ত্রীর তহবিল বৃদ্ধির হিসাবটা অন্যরকমও হতে পারত। প্রতি বছরে লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে দশ টাকা জমার হারটা হত একটা সরলরেখায়। তাকে বলি 'রৈখিক-বৃদ্ধি'। অপরপক্ষে যদি ধরি যে, রামপত্নী বিবাহরাত্রে-প্রাপ্ত একশ টাকার নোটটা শতকরা ৭ টাকা

চিত্র—১

রৈখিক বৃদ্ধি এবং এক্সপোনেন্সিয়াল বৃদ্ধির গ্রাফ্
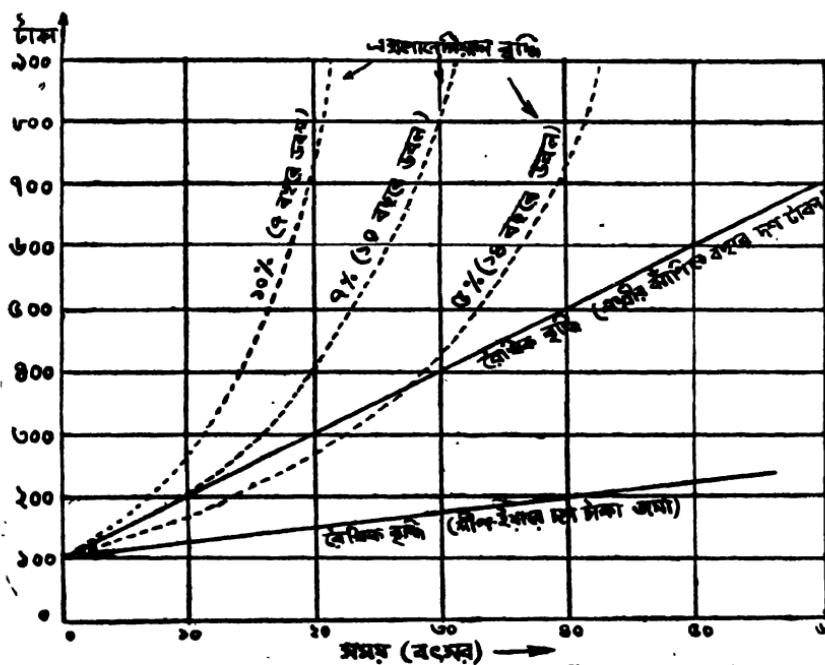
সুদে ব্যাঙ্কে জমা রেখেছিলেন, তাহলে পরবর্তীকালে রামবাবু প্রদত্ত কোনও টাকা জমা না দিলেও সেই আসল ১০০ টাকা পঞ্চাশ বছরে দেড় হাজার টাকা ছাপিয়ে যেত। এই বৃদ্ধির হারকে বলি 'এক্সপোনেন্সিয়াল-বৃদ্ধি'। চিত্র—১-এ ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে।

জমির সমান্তরাল রেখাটা (এ্যাবসিসা) এখানে বৎসর সংখ্যা সূচীত করছে, খাড়া লাইনটা (অর্ডিনেট) টাকার অঙ্ক। লক্ষণীয় প্রতি দশ বছরে ৭% সুদে মূল টাকাটা দ্বিগুণিত হয়েছে। আদিতে 'আসল' যদি হয় একশ', দশ বছরে সেটা সুদে আসলে হয় দু'শ, বিশ বছরে চারশ, ত্রিশ বছরে আটশ, ইত্যাদি। অনুরূপভাবে গ্রাফ থেকে দেখছি, সুদের হার যদি কমে ৫% হয়ে যায় তাহলে, দ্বিগুণিত হতে সময় লাগে চৌদ্দ বছর। আবার সুদের হার যদি বেড়ে গিয়ে হয় ১০% তাহলে দ্বিগুণিত হতে সময় লাগে মাত্র সাত বছর।

এই যে নির্দিষ্ট সময়ে দ্বিগুণিত হওয়া—এর প্রভাবটা কিন্তু প্রচণ্ড। আমরা অল্পমেয়াদী ক্ষীণদৃষ্টিতে সেটার প্রভাব সবসময় প্রণিধান করি না। অঙ্ক কষে উত্তর হয়তো একটা পাই। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সেটা যে কী প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করতে পারে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারি না। দু' একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলে বুঝতে পারা যাবে।

প্রথম উদাহরণ: যে হারে আজ পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ছে সেই হার অপরিবর্তিত থাকলে আগামী তেত্রিশ বছরের ভিতর পৃথিবীর জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে!

দ্বিতীয় উদাহরণ: মনে করুন একটা পুকুরের মাঝখানে কিছু কচুরিপানা আছে, সেটা প্রতিদিন আকারে দ্বিগুণ হয়ে যায়। ধরুন হিসাব কষে দেখা গেল, এভাবে প্রতিদিন দ্বিগুণিত হতে হতে গোটা পুকুরটি বুজে যেতে সময় লাগছে ত্রিশ দিন। অঙ্কের হিসাব গুণোত্তর শ্রেণীর সহজ অঙ্ক; কিন্তু তার বাস্তব অবস্থাটা কি? পুকুরের মালিক হয়তো প্রথম দিকে ব্যাপারটাকে কোনই গুরুত্ব দেবেন না—বাড়ছে বাড়ুক! কারণ প্রথম কিছুদিন ঐ বৃদ্ধিটা নজরেই পড়বে না। কিন্তু একদিন নিশ্চয়ই তাঁর নজরে পড়বে পুকুরের আধখানা ঢেকে গেছে! বুঝবেন—এখনই কিছু একটা

করা দরকার। সেটা মাসের কোন তারিখ? একেবারে মাস সংক্রান্তির পূর্বদিন। উনত্রিশ তারিখ। এখন যা হোক কিছু করবার জন্য তাঁর হাতে সময় থাকবে মাত্র একটি দিন! প্রশ্ন হচ্ছে—গোটা পৃথিবীর ক্ষেত্রে সেই মাস সংক্রান্তির পূর্বদিনটি কবে?

তৃতীয় উদাহরণ: আপনারা উজীর শিসা বেন দাহির এবং নবাব শিরহামের সেই ক্লাসিকাল গল্পটা শুনেছেন? আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা'য় সেটা শুনিয়েছি; কিন্তু এসব ক্লাসিকাল গল্পের ক্ষেত্রে পুনরুক্তি দোষে রসাভাস ঘটে না—বরং অঙ্কের ঐ ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরগুলি যে কী প্রচণ্ড শক্তিশালী তার ধারণা হয়। উজীর শিসাবেন অঙ্ক গুলে খেয়েছেন—দাবাখেলাটা নাকি তাঁরই আবিষ্কার। নবাবকে তিনি ঐ খেলাটা শিখিয়েছিলেন। নবাব খুশী হয়ে বললেন, বল তুমি কী পুরস্কার চাও?

আগেই বলেছে, উজীর আঁকে দড়। ছোট্ট একটি প্যাঁচ কষলেন তিনি। বললেন, এই সামান্য ব্যাপারের জন্য কী আর চাইব জাঁহাপনা, তবে আপনার যখন মর্জি হয়েছে তখন গরীবকে কয়েক মুঠি গমের দানা দিতে বলুন। আমার এই দাবার ছকে গুণতি করে কিছু গমের দানা দিতে বলুন। প্রথম ঘরে একটি দানা, দ্বিতীয় ঘরে দুটি, তৃতীয়ে চারটি, চতুর্থে আটটি, পঞ্চমে ষোলোটি—এইভাবে ডবল করতে করতে চৌষট্টিখানা ঘর পূর্ণ করে দেবার হুকুম হোক।

নবাব মনে মনে বললেন, আহা! উজীর বেচারি অঙ্কটাই শিখেছে, দর্শনটা বোঝে না! 'নাম্নে সুখমস্তি' মন্ত্রটাও জানে না। মুখে বললেন, তাই হোক।

কিন্তু গম দিতে গিয়ে রাজকোষ ফক্কা। রাজ্য লাটে উঠল!

কী ব্যাপার? ব্যাপার কিছুই নয়—সোজা অঙ্কের হিসাব। স্কুল-জীবনে অঙ্কের মাস্টারমশাই যেদিন গুণোত্তর শ্রেণীর অঙ্ক শিখিয়েছিলেন—জি. পি-র অঙ্ক আর কি—সেদিন যদি ক্লাস পালিয়ে

না থাকেন তবে হয়তো মনে পড়বে অল্পে-সন্তুষ্ট উজীর সাহেবের ঐ 'বিত্নুরের-খুদের' পরিমাণটা এইভাবে পাওয়া যাবে।

$$1+2+2^2+2^3+2^4....+2^{62}+2^{63}=2^{64}-1.$$

$$=18, 446, 744, 073, 709, 551, 615$$

সংক্ষেপে প্রায় 1.8×10^{19}

প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত জর্জ গ্যামো ঐ উনিশটি শূন্যওয়ালা সংখ্যার বিশালত্ব সম্বন্ধে ধারণা দিতে বলছেন—মানব সভ্যতার আদিমতম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ যত গমের দানা পয়দা করেছে তাও ঐ সংখ্যাটির চেয়ে কম!

এক্সপোনেন্সিয়াল বৃদ্ধি—যাকে বাঙলায় আপাতত বলা যাক 'স্বয়ং গুণন' বৃদ্ধি, সেটার সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা হয়েছে। কিন্তু যে-শাস্ত্রটা আমরা আলোচনা করতে বসেছি সেখানে সমস্যাগুলো আরও জটিল। কেমন জান? ধর আমি যে ব্যাঙ্কে টাকা জমা রাখলুম সেই ব্যাঙ্কের আইন হচ্ছে প্রতি বছর সুদের হারটা ১% বেড়ে যাবে। প্রথম বছর যদি থাকে ৫% তবে পরের বছর হবে ৬%, তৃতীয় বছরে ৭% ইত্যাদি। এক্ষেত্রে আমি জানতুম প্রথম বছরে ৫% হিসাবে আমার আসল টাকা দ্বিগুণিত হবে চৌদ্দ বছরে, কিন্তু তৃতীয় বছরে দ্বিগুণিত হওয়ার সময়টা হয়েছে দশ বছর। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতে বসলে আমরা হামে-হাল এমন জটিল বৃদ্ধির সম্মুখীন হব। যেমন জন-সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যাপারটা। ব্যাঙ্কের সুদের হার যেমন বছর বছর বাড়ছিল, এক্ষেত্রে সংখ্যা বৃদ্ধির 'হার'টাও তেমন বছর বছর বেড়েছে। এবার সমস্যাটা দেখি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা : সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যার একটা মোটামুটি হদিস পাওয়া যায়। আমরা যদি সংখ্যাগুলিকে একটি গ্রাফে সাজাই—যার 'এ্যাবসিসা' হচ্ছে বিভিন্ন শতাব্দী, এবং 'অর্ডিনেট' হচ্ছে জনসংখ্যা (কোটিতে) তাহলে গ্রাফটার চেহারা হবে চিত্র—২-এর মত।

চিত্র—২ সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার
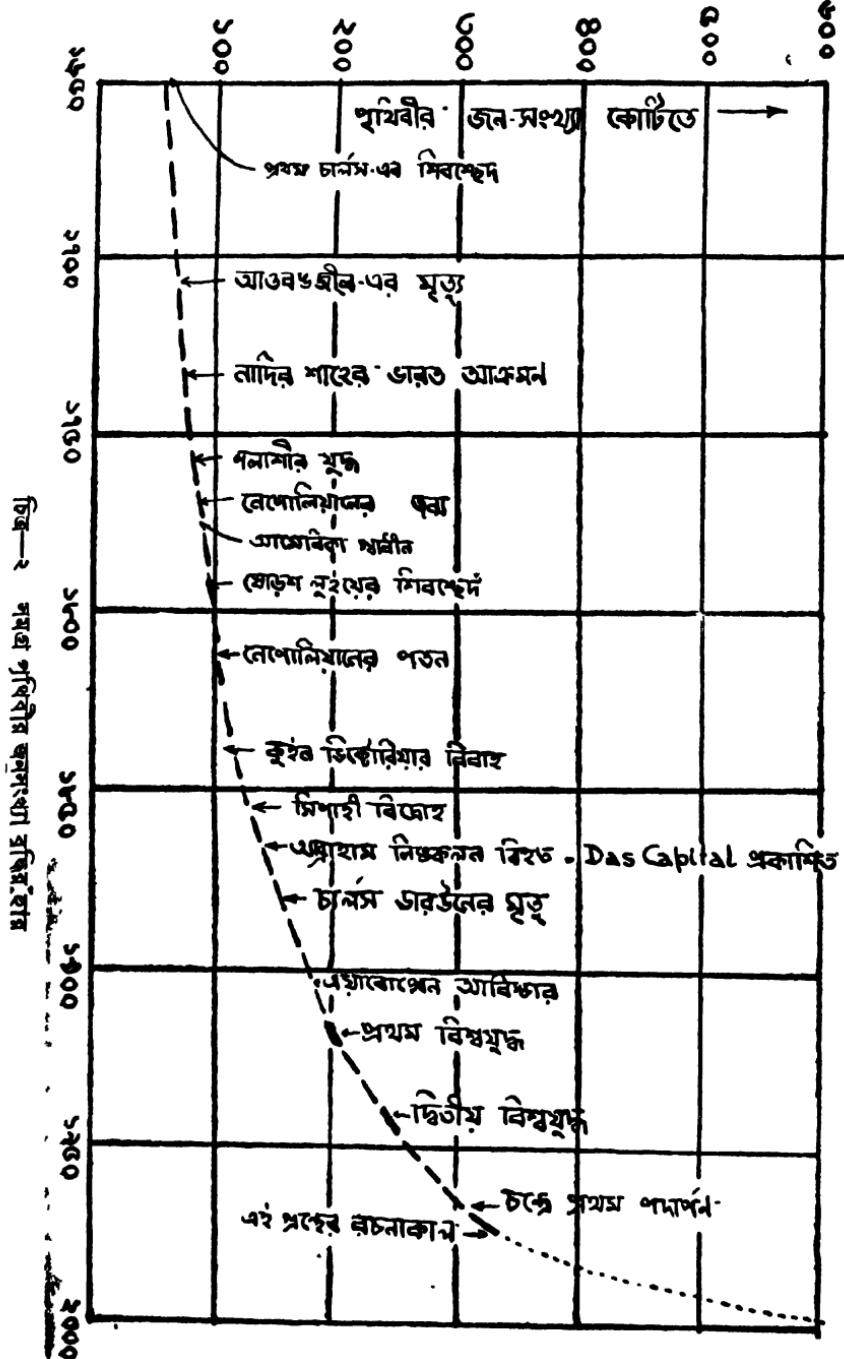
গ্রাফ থেকে দেখছি, ১৬৫০-এ পৃথিবীর জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৫০ কোটি; সেটা দ্বিগুণিত হয়েছিল পরবর্তী ২৫০ বছরে, প্রায় ১৯৫০ সাল নাগাদ।

এবার দেখুন, এ শতাব্দীর প্রারম্ভে সংখ্যাটা ছিল ১৭০ কোটি। বর্তমান দশকে পৌঁছবার আগেই সংখ্যাটা দ্বিগুণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী গ্রাফে (চিত্র—১) প্রতিটি বক্ররেখা বা গ্রাফের দ্বিগুণিত হওয়ার একটা নির্দিষ্ট সংখ্যা ছিল, যেমন ৫% এর ক্ষেত্রে চৌদ্দ বছর, ৭%এর ক্ষেত্রে দশ বছর, ১০%এর ক্ষেত্রে সাত বছর ইত্যাদি। কিন্তু বর্তমান ক্ষেত্রে (চিত্র—২) দেখছি, দ্বিগুণিত হওয়ার সময়কালটাও সময়ের সঙ্গে বাড়ছে। সুতরাং এটি একটি জটিল গ্রাফ। বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা হচ্ছে ২·১%। আগেই বলেছি, এই হারে দ্বিগুণিত হতে সময় লাগবে তেত্রিশ বছর। ভবিষ্য-বিজ্ঞানীরা এই দ্রুতচ্ছন্দ বৃদ্ধিহারের বৃদ্ধিকে বলেছেন 'সুপার-এক্সপোনেন্সিয়াল বৃদ্ধি।'

এবার বরং বিচার করে দেখি, জনসংখ্যা বৃদ্ধির 'হার'টা এই হারে বাড়ছে কেন? কী কারণে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের বৃদ্ধি-হারটা (০·৩%) ১৯৭০এ বেড়ে গিয়ে হল ২·১%। সেটা জানা না থাকলে কেমন করে মানবসভ্যতার এই মৌল সমস্যার সমাধান করব?

একেবারে গোড়ার কথাটায় আসুন—যাকে আমাদের বয়সীরা বলেন 'মোদ্দা কথা'; নওজোয়ানরা বলেন 'ফাণ্ডা'! জনসংখ্যা বাড়ে বা কমে কেন? উত্তরটা সহজ—মা ষষ্ঠীর কৃপায় জনসংখ্যা বাড়ে, বাবা যমের কোপে জনসংখ্যা কমে। আপনি আমি নিমিত্ত মাত্র—'ত্বয়া হৃষীকেশ' সব করাচ্ছেন! আমাদের দেশে দশ বছর অন্তর আদম সুমারী হয়। কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাথা গুণতি করেন। যদি আমরা কোনক্রমে জানতে পারতুম—গত দশ বছরে কত বাচ্ছা পয়দা করা গেছে এবং কতজন মাটি নিয়েছে বা চিতায় উঠেছে, তাহলে এত ছোটাছুটি না করে ঘরে বসেই অঙ্ক কষে

হিসাবের শেষ ফলাফলটা আমরা ঘোষণা করতে পারতাম। কারণ আমরা জানি—

বর্তমান জনসংখ্যা = দশ বছর পূর্বেকার জনসংখ্যা + দশ বছরে যত শিশু জন্মেছে – দশ বছরে যত নরনারী মারা গেছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি গোটা পৃথিবীর জন্মহার ছিল মৃত্যু হারের অতি সামান্য বেশী। তাই সমগ্র জনসংখ্যার বৃদ্ধির হারটাও ছিল অল্প। অনেক কারণে। তখন মানুষের গড় আয়ু ছিল মাত্র ত্রিশ বছর, চিকিৎসা-বিজ্ঞান ছিল অনুন্নত; প্রসূতি-বিদ্যা জানা ছিল না। এখন গোটা পৃথিবীর মানুষের গড় আয়ু তিপান্ন বছর (১)। মৃত্যুহার কমেছে। চিকিৎসাবিদ্যার উন্নতি হয়েছে। সেই অনুপাতে শিশু-জন্মের হার কিন্তু কমেনি। তারই ফলে আজ গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হয়েছে ২.১%।

নৈরাশ্যবাদীদের মতে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা অপরিবর্তিত থাকলে এ শতাব্দীর শেষে পৃথিবীর লোকসংখ্যা হবে ৬৫০ কোটি। ২১০০ খ্রীষ্টাব্দে সেটা হবে ৪৭০০ কোটি এবং মোটামুটি 'আজি হতে সহস্রাব্দী পরে' সংখ্যাটা অঙ্কের হিসাবে দাঁড়াবে ২.৫×১০^{২০}। দাঁড়ান মশাই। বিশটা শূন্যওয়ালা সংখ্যাটা কত বড়? কেমন করে বোঝাই? আচ্ছা বরং ঘুরিয়ে বলি—মনে করুন সারা পৃথিবীর যাবতীয় সমুদ্র, নদী, হ্রদ শুকিয়ে ফেলা হল, তারপর সেই নির্জলা পৃথিবীতে ঐ ২.৫×১০^{২০} জন মানুষকে ঠাশাঠাশি করে দাঁড় করাবার চেষ্টা করলাম। সেক্ষেত্রে প্রতিবর্গ গজে—'তিন ফুট বাই তিন ফুট' ভূমিতে সহস্রাধিক মানুষকে দাঁড়াতে হবে। সহজ কথায় এ সোনার পৃথিবী হাজার বছর পরে সোনার তরীতে রূপান্তরিত হবে—'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী।'

সুতরাং এখনই উঠে পড়ে লাগতে হবে—কী করে পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির ঐ হারটা কমানো যায়। অঙ্কশাস্ত্র মতে তার দুটো উপায়—মৃত্যুহার বাড়ানো অথবা জন্মহার কমানো। কিন্তু তাই

বলে তো গদা হাতে 'ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন' বলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড বাধানো যায় না, তাই মৃত্যুহার বাড়ানোর কথাটা বাদ দিই। বাকি থাকল একমাত্র সমাধান—মা ষষ্ঠীকে রোখা!

তা করতে গিয়ে কিন্তু একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করছি। ৩৩×১০^{৭} দেবতার মধ্যে একমাত্র মা ষষ্ঠীরই কৃপা দৃষ্টি পড়ে গরীবের উপর। অর্থাৎ যে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা যত উন্নত সেই দেশের জন্মহার তত কম! শুধু তাই নয়, যে-কোন দেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে—সমাজের যে-স্তরের অর্থনৈতিক অবস্থা যত ভাল সেই স্তরের জন্মহার তত কম। অর্থাৎ অর্থনৈতিক অবস্থার সঙ্গে জন্মহার অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। কোন দেশের জন্মহার কমাতে হলে সে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হবে। এটা নিঃসন্দেহে একটা 'বিষচক্র', কারণ কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি করতে হলে সর্বাগ্রে সেখানকার জন্মহার কমানো প্রয়োজন।

বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতি: গোটা পৃথিবীর দিকে তাকালে বলতে পারা যায় সামগ্রিকভাবে মানুষের অবস্থার উন্নতি হচ্ছে—জনসংখ্যার বৃদ্ধি সত্ত্বেও। বস্তুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি হচ্ছে, আগেই বলেছি, প্রায় ২% হারে; অথচ গোটা বিশ্বের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে শতকরা ৭-এর হারে। অঙ্কশাস্ত্র মতে তাই বলতে পারা যায়—গড় মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি হচ্ছে।

তা কিন্তু হচ্ছে না! এও একটা অঙ্কের ফাঁক। সেই ২৯শে ফেব্রুয়ারীর ভেল্কি। কারণটা তলিয়ে বোঝা যাক। ব্যাপারটা হচ্ছে এইরকম: পৃথিবীর কয়েকটি অত্যন্ত ধনী রাষ্ট্রের সংখ্যা-লঘিষ্ঠ মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি এত বেশী পরিমাণে হচ্ছে যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ গরীব জাতির উন্নতি না হওয়া সত্ত্বেও সামগ্রিক ফলাফলটা ঐ রকম দাঁড়াচ্ছে। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা গেল না বোধহয়। যদি ঘুরিয়ে বলি—'শতকরা আশিজনের মাথা তৈলতৃষিত থাকা সত্ত্বেও বাকি বিশজনের মাথায় তৈল সঞ্চার এত অধিক পরিমাণে গবগবায়িত

যে, তেলের পরিমাণকে সবগুলি মাথার সংখ্যা দিয়ে ভাগ দিয়ে মনে হচ্ছে সব কয়টি মাথাই মোটামুটি তেল চুকচুকে'—তাহলে বুঝলেন? নাকি আরও গুলিয়ে গেল? তাহলে চিত্র—৩ দেখুন।(২)

আশা করি এবার বোঝা গেছে। চিত্র—৩-এ প্রায় দেড়শ বছরের

চিত্র—৩

কয়েকটি রাষ্ট্রের মাথাপিছু আয়ের ক্রমোন্নতি
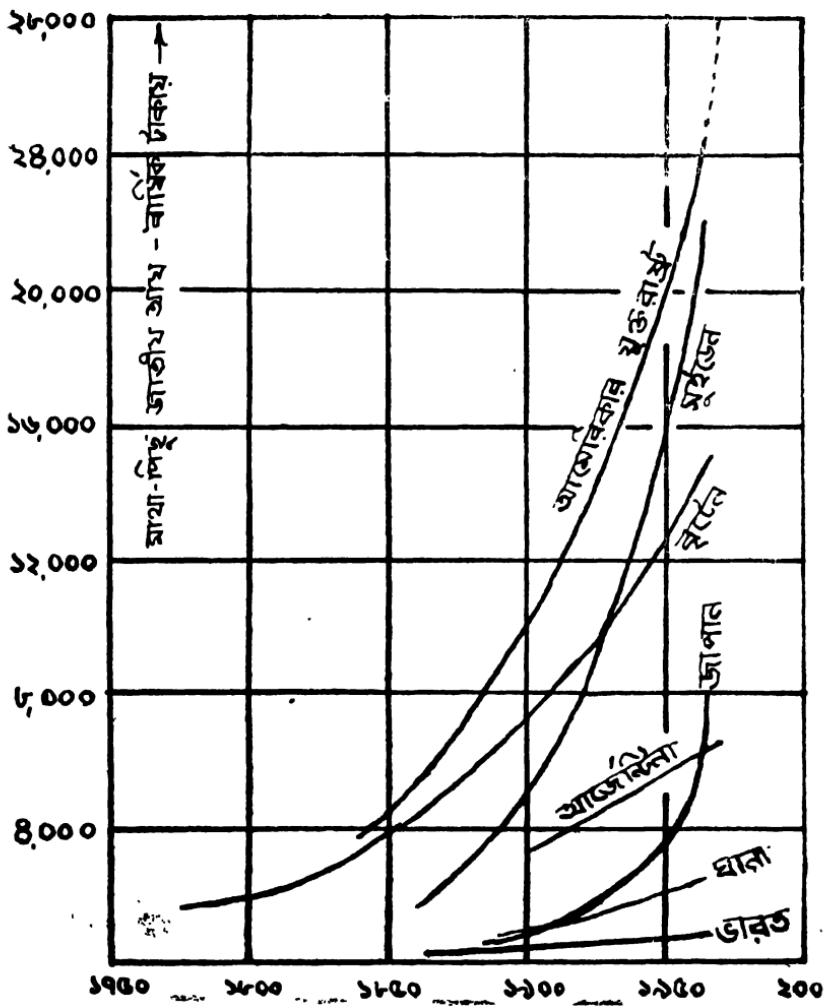
অর্থনৈতিক উন্নতির খতিয়ান দেখানো হয়েছে—বিশেষ কয়েকটি

দেশের। আমেরিকা, সুইডেন অথবা গ্রেটব্রিটেনের অর্থনৈতিক ক্রমোন্নতির হারের সঙ্গে অনুন্নত আর্জেন্টিনা, ঘানা বা ভারতবর্ষের তুলনা করুন। এবং মনে মনে লোকসংখ্যা কোন দেশে কত তা ভেবে দেখুন—তত্ত্বটা বুঝতে পারবেন। সমস্যাটাকে আরও তলিয়ে দেখা দরকার। তাই পৃথিবীর দশটি দেশের খতিয়ান আরও বিস্তারিতভাবে তালিকা—১-এ সন্নিবেশিত করে দিলাম। তথ্যটা পেয়েছি ইণ্টার ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের ১৯৭০ সালে সঙ্কলিত রিপোর্টে (৩)। শুধু এদেশী পাঠকের ধারণা করতে সুবিধা হবে বলে মার্কিন ডলারে উল্লিখিত সংখ্যাগুলিকে আমি 'এক ডলার=৮ টাকা' এই সূত্রে পরিবর্তন করে টাকায় উল্লেখ করেছি।

তালিকায় উল্লিখিত দশটি রাষ্ট্রের সম্মিলিত জনসংখ্যা পৃথিবীর জনসমষ্টির প্রায় ৬০ শতাংশ। হিসাবে দেখছি, এই ষাট শতাংশ পৃথিবীবাসীর মাথা-পিছু বার্ষিক গড় আয় ৫২৪১ টাকা, অর্থাৎ মাসিক প্রায় ৪৩৭ টাকা। বেশ স্বচ্ছল অবস্থাই আমাদের তুলনায়। কিন্তু হিসাবটা আর একটু তলিয়ে দেখলে অবস্থাটা অন্যরকম হয়ে যাবে।

বেছে নিন চারটি বড়লোকের রাষ্ট্র—আমেরিকা, রাশিয়া, জার্মানী ও জাপান। তাদের মিলিত জনসংখ্যা হচ্ছে পৃথিবীর ১৬ শতাংশ। ওদের চাররাষ্ট্রের মাথাপিছু গড় আয় হচ্ছে বার্ষিক ১৭,৩৩৬। অপর-পক্ষে বাকি ছয়টি রাষ্ট্রের—যাদের মিলিত জনসংখ্যা হচ্ছে পার্থিব জনসমষ্টির ৪৪ শতাংশ, তাদের মাথা-পিছু গড় আয় দাঁড়াচ্ছে ৮১৬ টাকা—সেই ভারতবর্ষের দারিদ্রের প্রায় সমপর্যায়ে।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে আর একটি হিসাব কষে দেখতে ইচ্ছা যাচ্ছে। এ শতাব্দীর শেষে ঐ দশটি দেশের মাথাপিছু গড় আয়ের অবস্থা কি দাঁড়াবে? আমরা আগেই দেখেছি, উন্নতিশীল দেশগুলির উন্নতির 'হার' অপেক্ষাকৃতভাবে অনেক বেশী এবং (বলা যায় অনেকটা সেজন্যও) তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধির 'হার'টা কম। ফলে একদিকে ওদের জাতীয় আয় দ্রুততর হারে বাড়বে, অপর দিকে

তালিকা—১ : দশটি জনবহুল রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অবস্থা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলাফল :—

দেশ	জনসংখ্যা ১৯৬৮ (কোটি)	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার (১৯৬১-৬৮) শতকরা/বছরে	মাথাপিছু বার্ষিক জাতীয় আয় (১৯৬৮) (টাকায়)	মাথাপিছু গড় আয়ের বৃদ্ধির হার (১৯৬১-৬৮) শতকরা/বছরে
লালচীন*	৭৩'০	১'৫	৭২০	০'৩
ভারতবর্ষ	৫২'৪	২'৫	৮০০	১'০
রাশিয়া	২৩'৮	১'৩	৮,৭০০	৫'৮
আমেরিকা	২০'১	১'৪	৩১,৮৪০§	৩'৪
পাকিস্তান†	১২'৩	২'৬	৮০০	৩'১
ইন্দোনেশিয়া	১১'৩	২'৪	৮০০	০'৮
জাপান	১০'১	১'০	৯,৫২০§	৯'৯
ব্রেজিল	৮'৮	৩'০	২,০০০	১'৬
নাইজিরিয়া	৬'৩	২'৪	৫৬০	—০'৩
পশ্চিম জার্মানী	৬'০	১'০	১৫,৭৬০	৩'৪
	মোট ২২৪'১		গড় ৫,২৪১	

---

† পাকিস্তান বলতে এখানে পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাঙলাদেশ) সমেত। এটা ১৯৬৮ সালের হিসাব।

* 'ইণ্টারন্যাশানাল ব্যাঙ্ক' তথ্য সংকলনের সময়ে স্বীকার করেছেন লালচীন ও রাশিয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাগুলি নির্ভুল নাও হতে পারে।

§ চিত্র—৭ অনুযায়ী দেখছি ১৯৬৮তে আমেরিকার মাথাপিছু জাতীয় আয় বছরে ২৪,০০০ টাকার কাছাকাছি, জাপানের ৮০০০ টাকার কাছাকাছি। দুটি তথ্যই প্রামাণিক গ্রন্থ থেকে সংকলিত ; কেন মিলল না জানি না। তবে তালিকা-১এর সংখ্যাটিই অন্যান্য গ্রন্থে দেখেছি। সেটাই বোধকরি গ্রহণযোগ্য।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি কম হওয়ায় মাথা পিছু রোজগারের অঙ্কটি আরও বাড়বে। বৃদ্ধির হারগুলি যখন জানা আছে তখন এ শতাব্দীর শেষাশেষি কী অবস্থা দাঁড়াচ্ছে তা হিসাব করে দেখা যায়। মনটা হয়তো খারাপ হয়ে যাবে, উপায় নেই, অঙ্কের ফলাফল যেটা পেয়েছি তা দাখিল করি :

তালিকা—২ : জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে ঐ দশটি রাষ্ট্রের মাথাপিছু গড় আয় কি হবে :—

দেশ	জনসংখ্যা (১৯৬৮) (কোটি)	২০০০ খ্রীঃ জনসংখ্যা কত হবে (কোটি)	২০০০ খ্রীঃ মোট জাতীয় আয় কত হবে শতকোটি টাকা/বার্ষিক	২০০০ খ্রীঃ মাথাপিছু গড় বার্ষিক আয় (টাকা)
লালচীন*	৭৩.০	১১৭.৫	৯৪০	৮০০
ভারতবর্ষ	৫২.৪	১১৫.৩	১,২৯১	১,১২০
রাশিয়া*	২৩.৮	৩৬.২	১৬,৩০৬	৫০,৬৪০
আমেরিকা	২০.১	৩১.৪	২৭,৫৩২	৮৮,০০০
পাকিস্তান	১২.৩	২৭.৯	৫৫৮	২,০০০
ইন্দোনেশিয়া	১১.৩	২৩.৭	২৪৬	১,০৪০
জাপান	১০.১	১৩.৯	২৫,৭৯৮	১৮৫,৬০০
ব্রেজিল	৮.৮	২২.৭	৭৯৯	৩,৫২০
নাইজিরিয়া	৬.৩	১৩.২	৬৩	৪৮০
জার্মানী	৬.০	৮.২	৩,৮৩৭	৪৬,৮০০

তার অর্থ—আজ একজন সাধারণ আমেরিকান একজন সাধারণ ভারতবাসীর চেয়ে চল্লিশগুণ বেশী ধনী (তালিকা ১)। এ শতাব্দী যখন শেষ হবে, অর্থাৎ ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের যাবতীয় উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সত্ত্বেও একজন গড় আমেরিকান হবে একজন গড় ভারতীয়ের তুলনায় ৮৮ গুণ ধনবান (তালিকা ২)। সেখানেই

কৌতুকের শেষ নয়, জাপানে উন্নতির হার এত বেশী যে, আজ যেখানে একজন মার্কিন নাগরিক একজন জাপানীর তুলনায় তিনগুণ ধনী, সেখানে শতাব্দীর শেষে একজন জাপানী একজন মার্কিনের চেয়ে দ্বিগুণের চেয়েও বেশী বড়লোক হয়ে যাবে! এশিয়াবাসী হিসাবে যদি সেই সন্দেশেই তৃপ্ত হন, আমি বাধ সাধি কেন?

চাষযোগ্য জমির হ্রাস ও খাদ্যাভাব: হিসাবে দেখছি, গোটা পৃথিবীতে জমি আছে ৩২০ কোটি হেকটেয়ার (৪)। হেকটেয়ার বুঝলেন? এক হেকটেয়ার হচ্ছে প্রায় আড়াই একর, অর্থাৎ পৃথিবীতে চাষের উপযুক্ত জমি আছে ৮০০ কোটি একর। মেট্রিক পদ্ধতি যখন চালু হয়েছে তখন হেকটেয়ারেই হিসাবটা কষি। বর্তমানে জমির যা গড় উৎপাদন ক্ষমতা তাতে মাথাপিছু প্রায় ০·৪ হেকটেয়ার (এক একর) জমির দরকার। তার মানে গোটা পৃথিবীর ৩২৬ কোটি লোকের জন্য জমির প্রয়োজন ৩২৬×·৪=১৩ কোটি হেকটেয়ার। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ জনসংখ্যা যদি হয় সাড়ে ছয় শ' কোটি তাহলে (কৃষিজাত উৎপাদনের হার অপরিবর্তিত থাকলে) তখন জমির প্রয়োজন হবে ২৬ কোটি হেকটেয়ারের। মুশকিল এই যে, জনসংখ্যাই বাড়ছে, পৃথিবীর চাষযোগ্য জমির পরিমাণটা কিছুতেই বাড়বে না। আমরা বর্তমানে তার প্রায় আধাআধি জমি, এই ধরুন প্রায় ১৫০ কোটি হেকটেয়ার জমি চাষের আওতায় এনেছি, তাতে চাষ করি। যদিও পৃথিবীর মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণ—ঐ ৩২০ কোটি সংখ্যাটা অপরিবর্তনীয়, তবু ঐ ১৫০ কোটি হেকটেয়ার সংখ্যাটা এখনও বাড়তে পারে। যদি আমরা নূতন নূতন জমিকে চাষের আওতায় আনি। তাতে অন্য জাতের অসুবিধা। ভাল ফলনের জমি সব আগেই চাষের আওতায় এসেছে, এখন দেখা যাচ্ছে নতুন জমি চাষের আওতায় আনতে গেলে আর পড়তায় পোষাচ্ছে না। অধিকাংশ ধনতান্ত্রিক বা তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশের কর্তাব্যক্তিরা হিসাব করে বুঝে

নিয়েছেন—'উস্‌মে নাফা নেহি!' নূতন জমিকে চাষের আওতায় আনতে যে-পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগে যে-পরিমাণ লাভ হয়, সেই সমপরিমাণ অর্থ কলকারখানায় খাটালে লভ্যাংশ বেশী হয়। ফলে অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছে—চাষের জমি চলে যাচ্ছে ঘর-বাড়ি রাস্তা-কারখানা বানাতে। অবস্থাটা ঠিক মত মালুম হবে চিত্র—৪-এর দিকে তাকালে। চিত্রে দেখুন, গোটা পৃথিবীর চাষযোগ্য
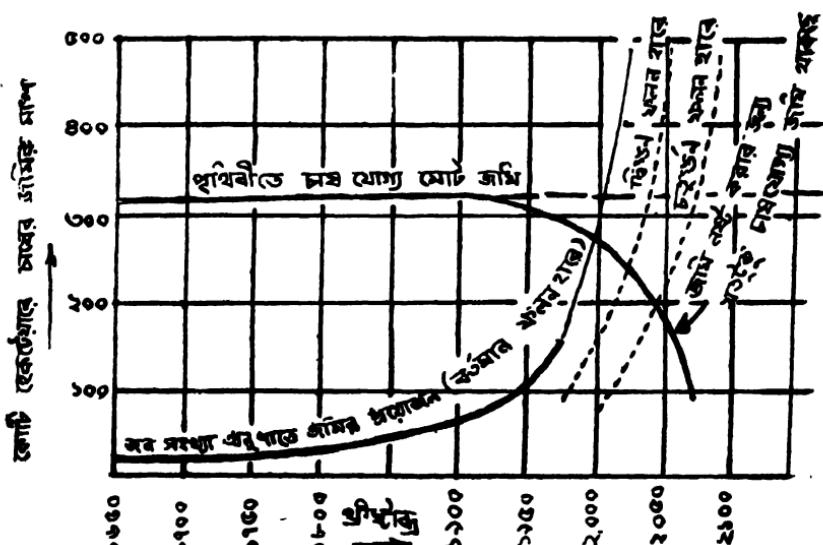
চিত্র—৪

পৃথিবীর জনসংখ্যা ও চাষযোগ্য জমির তুলনা

জমির পরিমাণটা ধ্রুব—ভূমির সমান্তরালে। অপর পক্ষে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চাষের প্রয়োজনীয় জমির গ্রাফটা ঊর্ধ্বমুখী। বাকি ১৭০ কোটি হেকটেয়ার জমিকে চাষের আওতায় আনতে যদিও যথেষ্ট খরচ পড়বে তবু ধরা যাক—তা চাষের আওতায় এল। সে-ক্ষেত্রে গ্রাফ অনুযায়ী অন্নাভাবকে আমরা ২০০5 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখতে পারি। কারণ ঐ সালেই দেখছি ঊর্ধ্বমুখী বক্র-

রেখাটা ভূমির সমান্তরাল ঐ ৩২০ চিহ্নিত সরলরেখাকে ছেদ করেছে।

আপনি হয়তো প্রতিবাদ করবেন—আগামী যুগে কি কৃষির উন্নতি হবে না? প্রতি একরে ফলনের পরিমাণ বাড়বে না? শুধু জনসংখ্যাই বাড়বে? ঠিক কথা!

সে কথাও চিন্তা করেছেন ক্লাব অব রোমের পণ্ডিতেরা। তাই পাশাপাশি আরও দুটি এক্সপোনেন্সিয়াল বক্ররেখা এঁকেছেন। প্রথমটি হচ্ছে—যদি প্রযুক্তিবিদ্যার কল্যাণে ফলন দ্বিগুণ হয়, দ্বিতীয় রেখাটা হচ্ছে—যদি উৎপাদন চতুর্গুণ হয়। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, ঐ দুটি আশাবাদী রেখা ঐ ৩২০ চিহ্নিত সরলরেখাকে যথাক্রমে ২০৪০ এবং ২০৭৫ সালে ছেদ করেছে। সোজা হিসাবে, চাষের উন্নতি করে উৎপাদন যদি চতুর্গুণও বৃদ্ধি করা যায় তাহলে 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর' আবির্ভূত হবে 'আজি হতে শতবর্ষ পরে'!

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, আসল অবস্থা আরও খারাপ। যেহেতু আমরা ক্রমাগত রেল-রাস্তা-বাড়ি-কল-কারখানা বানিয়ে যাচ্ছি তাই ঐ ৩২০ কোটি হেকটেয়ারের বরাদ্দটাও কমছে। ওটা আর সরল-রেখা নেই, বিংশ শতাব্দীতে পেঁৗছে সেটা নিচের দিকে যেন ক্লান্তিতে ঢলে পড়তে চাইছে। যার অর্থ উৎপাদন চতুর্গুণ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের চরম সমস্যা দেখা দেবে ২০৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই। গ্রাফে দেখে নিন।

ওঁদের বক্তব্য—সেই খাদ্যাভাবের সমস্যাটা ইতিমধ্যেই দেখা দিয়েছে। আজকের পৃথিবীতে তাই বছরে এক কোটি থেকে দুই কোটি নরনারী শুধু খাদ্যের অভাবে, অপুষ্টিজনিত কারণে মারা যাচ্ছে (৫)।

পৃথিবীর খনিজ সম্পদের ক্ষতির খতিয়ান: জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তারা প্রজননে সমর্থ বলে; কিন্তু পৃথিবীর গর্ভে নিহিত খনিজ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। আছে পরিমাণ হ্রাসের,

কারণ মানুষ ক্রমাগত তা খনি থেকে টেনে তুলছে, মনের আনন্দে দো-হাত্তা খরচ করছে। এতদিন কথাটায় কান দিইনি। মেনে নিয়েছিলাম কুপের অভয়বাণী : তুমি যত নিতে পার সব যদি নাও। তবু আমি টিকে রব দিয়ে থুয়ে তাও।' কিন্তু এতদিনে যেন আর সে আশা করতে ভরসা হচ্ছে না। মনে পড়ে যাচ্ছে সেই পুষ্করিণীর মালিকের কথাটা। ক্যালেণ্ডার হাৎড়ে দেখতে চাইছি—মাসের উনত্রিশ তারিখ এসে যায়নি তো ?

বিভিন্ন সূত্র থেকে তাই এ বিষয়ে তথ্য সঙ্কলন করে তালিকা—৩-এ সাজিয়ে দিলাম। যন্ত্রসভ্যতার অত্যাবশ্যক এগারোটি খনিজ পদার্থের ক্ষতির খতিয়ান। তালিকাটির একটু ব্যাখ্যা দিয়ে রাখা ভাল। দ্বিতীয় স্তম্ভে উল্লেখ করা হয়েছে—'বর্তমানে জ্ঞাত বিশ্বের ভাণ্ডারে সঞ্চিত আকরিক খনিজ পদার্থের মোট পরিমাণ।' তৃতীয় স্তম্ভের সংখ্যাগুলি বলছে 'বর্তমান হারে ব্যবহৃত হতে থাকলে কত বছরে ঐ সঞ্চয় নিঃশেষিত হবে।' কিন্তু বর্তমান ব্যবহারের 'হার'টাও যে বাড়ছে প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের কল্যাণে। ক্ষয় বৃদ্ধির সেই 'এক্সপোনেন্সিয়াল' গড় শতাংশটা দেওয়া হয়েছে চতুর্থ স্তম্ভে। পঞ্চম স্তম্ভে দেখা যাচ্ছে, 'ঐ এক্সপোনেন্সিয়াল বৃদ্ধির হারে সঞ্চয় শেষ হতে কত বছর লাগবে।' শেষ বা ষষ্ঠ স্তম্ভের সংখ্যাগুলি 'বৎসরে' প্রকাশিত। সংখ্যাগুলি বলতে চাইছে—'যদি নূতন খনির আবিষ্কারে বা প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে দ্বিতীয় স্তম্ভে উল্লিখিত পার্থিব সঞ্চয় পাঁচগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তাহলে এক্সপোনেন্সিয়াল হারে ঐ খনিজ বস্তু কতদিন ধরে পাওয়া যাবে।'

ধরা যাক সোনার কথাই। গোটা পৃথিবীতে স্বর্ণ-খনিতে বর্তমানে সোনার সঞ্চয় হচ্ছে ৩৫৩×১০^{৬} আউন্স। তার মানে ৩৫৩ সংখ্যার পর ছয়টি শূন্য। অর্থাৎ ৩৫৩০০০০০০ আউন্স = প্রায় ৩৫ কোটি আউন্স (ট্রয়) = প্রায় তের হাজার টন। এখন যে হারে স্বর্ণখনি থেকে সোনা আহরণ করা হচ্ছে তাতে মাত্র এগারো বছরে

তালিকা ৩ঃ—পার্থিব খনিজ-সম্পদের ক্ষয়-ক্ষতির ক্ষতিয়ান (৬)।

(১) খনিজ পদার্থ	(২) পৃথিবীর মোট সঞ্চয় (১৯৭০ সালে)	(৩) কত বছরে শেষ হবে (বছরে)	(৪) এক্সপোনেন্সিয়াল ক্ষয় বৃদ্ধির গড় শতাংশ (% বছরে)	(৫) ঐ হারে কত বছরে শেষ হবে (বছর)	(৬) সঞ্চয় পাঁচগুণ বেড়ে গেলেও চতুর্থ স্তম্ভের হিসাবে কত বছর লাগবে শেষ হতে।
এ্যালুমিনিয়াম	১'১৭ × $১০^{৭}$ টন	১০০	৬'৪	৩১	৫৫
তামা	৩০৮ × $১০^{৬}$ ঐ	৩৬	৪'৬	২১	৪৮
সোনা	৩৫৩ × $১০^{৬}$ আউন্স	১১	৪'১	৯	২৯
লোহা	১ × $১০^{১১}$ টন	২৪০	১'৮	৯৩	১৭৩
সীসা	৯১ × $১০^{৬}$ টন	২৬	২'০	২১	৬৪
ম্যাঙ্গানীজ	৮ × $১০^{৮}$ টন	৯৭	২'৯	৪৬	৯৪
রূপা	৫'৫ × $১০^{৯}$ আউন্স	১৬	২'৭	১৩	৪২
টিন	৪'৩ × $১০^{৬}$ লং টন	১৭	১'১	১৫	৬১
দস্তা	১২৩ × $১০^{৬}$ টন	২৩	২'৯	১৮	৫০
কয়লা	৫ × $১০^{১২}$ টন	২৩০০	৪'১	১১১	১৫০

সব সোনা তোলা শেষ হয়ে যাবে। অর্থাৎ ১৯৮১ সাল নাগাদ। কিন্তু স্বর্ণ নিষ্কাশনের বৃদ্ধির হারটা যে আবার স্থির নয়, সেটা প্রতি বছরে ৪'১ শতাংশ বাড়ছে। তাই আশঙ্কা করা হচ্ছে মাত্র নয় বছরে পৃথিবীর সব স্বর্ণখনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদি মনে করি, ইতিমধ্যে নূতন নূতন স্বর্ণখনির আবিষ্কারে তের হাজার টন সঞ্চয়টা বেড়ে গিয়ে হয় পঁয়ষট্টি হাজার টন, তাহলেও এ ভাণ্ডার শেষ হবে ২৯ বছরে।

কথায় বলে—'বসে খেলে কুবেরের ভাণ্ডারও একদিন শেষ হয়।' নৈরাশ্যবাদীরা বলতে চান সেই 'একদিন'টা সমাগত। উপরে উল্লিখিত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থগুলি—যাদের বাদ দিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যার কথা চিন্তাই করা যায় না—তারা প্রায় সকলেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে 'আজি হতে শত বর্ষ পরে।'

এক বিংশ শতাব্দীর মানুষ তখন কি করবে? ওঁরা বলছেন, তখন মানুষ অব্যবহার্য খনিজ দ্রব্য আবার গালিয়ে নিয়ে ব্যবহার করতে চাইবে। ঠিক যেভাবে নিজের বিয়েতে পাওয়া সাবেকি গহনা গালিয়ে হাল-ফ্যাসানের গহনা বানিয়ে মা মেয়ে পার করেন। কিন্তু তারও তো একটা সীমা আছে। প্রতিবারেই গহনা গালালে কিছু 'পানমরা' বাদ যায়। বিজ্ঞান বলে, পদার্থের নাকি বিনাশ নেই—কিন্তু রূপান্তরিত সেই পদার্থের কত ভাগ কাজে লাগাবে? প্রতি-বারই খাদটা বাতাসে, মাটিতে, সমুদ্রে পড়ে পৃথিবীকে দূষিত করে তুলবে। সমুদ্রের জলে তেলের পরিমাণ ইতিমধ্যে ভয়াবহভাবে বেড়ে গেছে। শহরের বাতাসে ভাসমান দূষিত পদার্থের ভাগ যে কত তা কলকাতাবাসী আমরা হাড়ে হাড়ে জানি এভাবেই জন্ম নিচ্ছে পরবর্তী আলোচ্য সমস্যাটা :

বাতাবরণ দূষিতকরণ : নানান কারণে আমাদের বাতাবরণ—আকাশ, বাতাস, জল, মাটি ক্রমশঃ দূষিত হয়ে পড়েছে। তার সব চেয়ে বড় কারণ যন্ত্র-সভ্যতার দ্রুত প্রসার। কল কারখানায় যে

শক্তির প্রয়োজন হয় তার শতকরা ৯৭ ভাগ আসে জীবাশ্ম তৈল থেকে (অর্থাৎ কয়লা, পেট্রোল, প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি) (৭)। এই জাতীয় তেল জ্বলবার সময় যে সব গ্যাসীয় পদার্থ আবহাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে CO_2 বা কার্বন ডায়ক্সাইড। গোটা পৃথিবীতে বর্তমানে এভাবে আবহাওয়ায় যে পরিমাণ কার্বন ডায়ক্সাইড ছড়িয়ে পড়ছে তার পরিমাণ বৎসরে ২০০০ টন (৮)। শুধু তাই নয়, এই আবহাওয়া দূষিতকরণটাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে বছরে বছরে—ঐ 'এক্সপনেন্সিয়াল হারে'। ঐ ২০০০ টন CO_2-এর প্রায় আধাআধি মিশে যাচ্ছে বাতাসে, বাকি অর্ধেক মিশে যাচ্ছে সমুদ্রের উপরিভাগের জলের সঙ্গে। শুধু ঐ গ্যাসই নয়, কয়লা, পেট্রল, বা দাহ্য গ্যাস জ্বললে যে উত্তাপ উৎপন্ন হয় তার একটি বৃহৎ অংশ বাতাসকে উত্তপ্ত করে তুলছে, জলকে গরম করছে। বহু কারখানা সংলগ্ন প্রবহমান নদীতে এজন্য মাছ মরে যাচ্ছে (৯)।

কলকারখানার পরিত্যক্ত বস্তু ছাড়াও সভ্যজগত দৈনিক যে-পরিমাণ আবর্জনা ফেলছে—তার অপসারণ বা গতি করার সমস্যাটাও কম নয়। এ সমস্যা তীব্র আকার ধারণ করে শহরাঞ্চলে, যেখানে বসতি ঘন। ক'লকাতা শহরে রাস্তার ধারে জমে থাকা আবর্জনার পাহাড় আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ সত্য। আবর্জনা অপসারণের ব্যবস্থা যত উন্নততর হচ্ছে তার চেয়ে দ্রুততর হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে আবর্জনার দৈনিক সঞ্চয়ের পরিমাণ। গোটা ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে ১৯৭২ সালে ডাস্টবীনে ময়লা জমেছিল ১·৮ কোটি টন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার পরিমাণ ছিল ২২ কোটি টন (১০)। সংখ্যাটা এত বড় যে, আমরা তার ধারণা করতে পারছি না, তাই বুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষায় বলি—যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন মিউনিসিপ্যালিটিতে সারা বছরে যে পরিমাণ আবর্জনা জমে তা সমান এক ফুটের স্তরে ছড়িয়ে দিলে ২,৫০০ বর্গমাইল স্থান আবর্জনায় ঢেকে যাবে। এই আবর্জনা অপসারণের জন্য ব্রিটেনে খরচ পড়ে টন-পিছু প্রায় সাতাশ

টাকা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে টন-পিছু প্রায় পোনে দু-শ' টাকা। তার অর্থ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতি বছর প্রায় বার হাজার কোটি টাকা খরচ করে এই ময়লা সরাতে (১০)। শুধু খরচটাই বড় কথা নয়, শহর থেকে দূরে যেখানে সেই আবর্জনার পাহাড় জমছে সেই 'ধাপার মাঠ' আশপাশের আবহাওয়াকে দূষিত করছে। সংখ্যাতত্ত্ববিদরা বলছেন, আবর্জনা ফেলার 'হার' যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে ১৯৮০ সাল নাগাদ মাথা পিছু ৬০ শতাংশ বেশী আবর্জনা নিকেশ করার প্রয়োজন হবে। মাথার সংখ্যাটাও যেহেতু মা ষষ্ঠীর কৃপায় ক্রমবর্ধমান তাই এটি একটি 'সুপার এক্সপোনেন্সিয়াল' সমস্যা। কলকাতার বর্ধমান ধাপার মাঠ কি তাহলে শতাব্দীর শেষাশেষি বর্ধমান-তক পৌঁছে যাবে?

শক্তির উৎস: ইতিপূর্বেই বলেছি, আমরা যে-শক্তি ব্যবহার করি তার প্রায় সবটাই হচ্ছে জীবাশ্ম-কেন্দ্রিক! সহজ কথায় কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা নানান জাতের 'ক্রুড-অয়েল'। জলবিদ্যুৎ, সৌরশক্তি বা পারমাণবিক শক্তি সংগ্রহের প্রচেষ্টা এখনও অত্যন্ত সীমিত। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে বলছেন, ভূগর্ভস্থ এই শক্তি-উৎস—কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি অত্যন্ত দ্রুতহারে ক্ষয় প্রাপ্ত হচ্ছে। 'দ্রুতহার' বলতে এখানেও সেই 'সুপার এক্সপোনেন্সিয়াল বৃদ্ধি'। ব্যাপারটার সম্বন্ধে ধারণা করা যাবে ডঃ ভাবার একটি উক্তি থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে পারমাণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার কি-ভাবে হতে পারে সেটা বিচার করে দেখতে বিশ্ববিজ্ঞানের পণ্ডিতেরা সমবেত হয়েছিলেন। সেই মহাসম্মেলনে সভাপতি ছিলেন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডক্টর হোমি ভাবা। সভাপতির ভাষণে তিনি প্রসঙ্গক্রমে বললেন, "পৃথিবী কি-হারে শক্তির ব্যবহার করছে সেটা অনুমান করতে ধরা যাক তিন হাজার তিনশ কোটি টন ($৩\cdot৩ \times ১০^{10}$ টন) কয়লা জ্বালিয়ে যে শক্তি পাওয়া যায় তাকে আমরা বলছি 'ক' পরিমাণ শক্তি। এখন বলা যায়, খ্রীষ্টজন্মের

পর আঠারো শ' বছর ধরে বিশ্বমানব প্রতি শতাব্দীতে '½ ক' পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করেছে। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সেটা বেড়ে গিয়ে হয়েছে প্রতি শতাব্দীকে 'ক' পরিমাণ শক্তি। বর্তমান শতাব্দীতে আমরা '১০ক' পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করছি। ভাষান্তরে বলা যায়—গত দু-হাজার বছর ধরে মানুষ যত শক্তি ব্যবহার করেছে বর্তমান শতাব্দীতেই আমরা প্রায় সেই পরিমাণ শক্তি ব্যবহার করছি।"

পাঠক নিশ্চয় সেই পুষ্করিণীর মালিকটির কথা ভুলে যাননি। মাসের উনত্রিশ তারিখ সকালে ঘুম থেকে উঠে সে কি ঠিক ঐ কথাই বলেনি—'গত উনত্রিশ দিনে আমার পুকুরের যতটা ঢাকা পড়েছে আজ এক দিনে ঠিক ততটাই ঢাকা পড়বে।'

আশ্চর্য! দুটো হিসাব খাঁজে খাঁজে মিলে যাচ্ছে। জ্যামিতির উপপাদ্যে যেমন একটা ত্রিভুজকে আর একটা ত্রিভুজের উপর ফেলে আমরা দেখি তা রেখায় রেখায়, কোণে কোণে সর্বতোভাবে মিলে যাচ্ছে! ডক্টর ভাবার ভাবনায় প্রথম আঠারো শ বছরে শক্তি ব্যয়িত হয়েছে 'শতাব্দীতে ½ ক' পরিমাণের হিসাবে ৯ক এবং তারপরের একশ বছরে ১ক—একুনে দশ-ক। যে দশ-ক আমরা বর্তমান শতাব্দীতে খরচ করছি। পুষ্করিণীর মালিকের ক্ষেত্রেও হুবহু তাই—উনত্রিশ দিনে পুকুর ভরে ছিল আধাআধি, বাকি আধাআধি ভরল মাস সংক্রান্তির শেষ দিনে!

তার মানে—এই বিংশ শতাব্দীই কি 'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর!'

তালিকা—৩-এ আমরা দেখেছি বর্তমানে সমগ্র পৃথিবীর ভূ-গর্ভস্থ কয়লার পরিমাণ ৫×১০^{১২} টন এবং যে এক্সপোনেন্সিয়াল হারে তা আমরা তুলে খরচ করছি তাতে ১১১ বছরে সব কয়লা আমরা ফুঁকে দেব! এ তথ্যটা আমরা তখন সঙ্কলন করেছিলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ব্যুরো অব মাইন্‌স্'-এর রিপোর্ট থেকে। তখন হিসাবটা আমরা যাচাই করে দেখতে পারিনি—আপ্তবাক্যের মত

মেনে নিয়েছিলাম মাত্র। এখন ডক্টর ভাবার ঐ উক্তি থেকে বিকল্প পদ্ধতিতে হিসাবটা আমরা মোটামুটি যাচাই করে দেখতে পারি। হিসাবটা এই রকম : ডক্টর ভাবা $৩·৩ \times ১০^{১০}$ টন কয়লার শক্তিকে বলেছিলেন 'ক' পরিমাণ শক্তি। অর্থাৎ পৃথিবীর এখন মোট সঞ্চয় = $৫ \times ১০^{১২} + ৩·৩ \times ১০^{১০} = ১৫০$ক পরিমাণ শক্তি। যদি ধরি আমরা প্রতি শতাব্দীতে এখন ১০ক পরিমাণ খরচ করছি, তাহলে মোটামুটি আমাদের সঞ্চয় শেষ হবে ১৫০০ বছরে।

কয়লার চেয়ে পেট্রোলিয়ামের অবস্থাটা আরও শোচনীয়। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এখন দৈনিক প্রায় বাহান্ন কোটি গ্যালন তেল খরচ হয়। তার প্রায় পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ দশ কোটি গ্যালন তাকে বাইরে থেকে আমদানী করতে হয়। ১৯৮০ সাল নাগাদ সেই আমদানীর পরিমাণটা দাঁড়াবে দৈনিক ৪২ কোটি গ্যালনে, যার দাম বছরে আড়াই হাজার কোটি টাকা (১১)। আশা করা যায় মধ্যপ্রাচ্যের তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলি আরও প্রায় কুড়ি বছর ধরে আমেরিকাকে তেল সরবরাহ করতে পারবে। তারপর? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণনাতীত মটোরগাড়ির হাল তখন কি হবে? শুধু আমেরিকা কেন, আপনার আমার প্রতিবেশী ক'লকাতার বর্ষায় কি করে আমাদের গায়ে কাদা ছিটাবেন?

কয়লা পেট্রোলের কথা থাক—ওরা তো দালাল মাত্র—রাজার রাজা কে? শক্তি-উৎসের সেই রাজার রাজা আছেন ন কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল দূরে, মাত্র আট আলো-মিনিটের ব্যবধানে—যাঁকে ডেকে কবি বলেছিলেন—'তোমার হোমাগ্নি মাঝে আমার সত্যের আছে ছবি, তারে নমো নম।' কয়লা-কাঠ-পেট্রোল-মোমবাতি-কেরোসিন মায় ঘুঁটে পর্যন্ত তাঁর কাছে দালালী করতে যায়। শক্তির মূল উৎস সেই 'জবাকুসুম সঙ্কাশং'—যে শক্তি উদ্ভিদ জগৎ ধরে রেখেছিল বা রাখছে। জ্বালানি-কাঠ বা ঘুঁটে হচ্ছে উদ্ভিদের সাম্প্রতিককালে সঞ্চিত শক্তি; আর কয়লা পেট্রোল-মোমবাতি-

কেরোসিন ইত্যাদি হচ্ছে সেই সৌর শক্তি যা উদ্ভিদ জগত কোটি কোটি বছর পূর্বে সঞ্চয় করেছিল। বিজ্ঞান বলছে, গোটা পৃথিবীতে মানব সভ্যতা আজ যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় করছে তার পরিমাণ $১০^{১৪}$ কিলোওয়াট ঘণ্টা (১১)। তুলনায় আজকের দিনে সারা পৃথিবীর উদ্ভিদ জগত ফটোসিন্থেসিস্-এর মাধ্যমে সৌর শক্তি সঞ্চয় করছে ৩×১০^{১৫} কিলোওয়াট ঘণ্টা। অর্থাৎ আয় হচ্ছে ব্যয়ের ত্রিশ গুণ। অথচ আমরা আগেই দেখেছি ব্যয়ের হারটা বর্ধিত হচ্ছে এক্সপোনেন্সিয়াল-হারে! ফলে একশ বছরের ভিতরেই দেখা যাবে—উদ্ভিদ জগৎ (যে হারে আমরা গাছ কেটে চলেছি সে প্রসঙ্গ না তুলেই) আর ততটা সৌরশক্তি সঞ্চয় করতে পারছে না, যতটা আমরা খরচ করছি। তার ভয়াবহ ফলাফলটা ভেবে দেখুন—সারা পৃথিবীতে শুধু লোড শেডিংই নয়, অরন্ধন। উনুন জ্বালা যাবে না!

উপসংহার ঃ ক্লাব অব রোমের পণ্ডিতেরা দীর্ঘ গবেষণা করে যে সিদ্ধান্তে এলেন তার চুম্বকসার দিয়েই এ পরিচ্ছেদ শেষ করি ঃ

১। যদি সমগ্র পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসার, আবহাওয়া দূষিত করণ, খাদ্য উৎপাদন এবং (খনিজ) সম্পদের ব্যবহারের বর্তমান হার অপরিবর্তিত থাকে তাহলে এই গ্রহে (মানব সভ্যতার) উন্নতির শেষ সীমান্তে পৌঁছাতে আর এক শ' বছরের কম সময় লাগবে। খুব সম্ভব অত্যন্ত আকস্মিক, দ্রুত এবং অনিবার্যভাবে যবনিকা নেমে আসবে। জন-সংখ্যা ও প্রযুক্তিবিদ্যার দ্রুত অবনতি ঘটবে।

২। এই সব দ্রুতহারে ক্ষয়বৃদ্ধির পরিবর্তন করা অসম্ভব নয়। সামগ্রিক স্থিতাবস্থার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করা সম্ভব, যার ফলে মানব সভ্যতা সুদূর ভবিষ্যৎকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারবে। সমগ্র বিশ্বের সর্বাঙ্গিন সুস্থিতি (global ecological equilibrium) এভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করা উচিত যাতে প্রতিটি মানব সন্তান তার প্রয়োজন মত প্রাকৃতিক মৌল উৎপাদন সংগ্রহে সক্ষম হয়।

৩। পৃথিবী যদি শুভবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে এবং প্রথমোক্ত অনিবার্য পরিণামের বিষয়ে অবহিত হয়ে দ্বিতীয়োক্ত পন্থার শরণ নিতে চায় তাহলে যত শীঘ্র তা করা হবে সাফল্যের সম্ভাবনা ততই বাড়বে।

* * *

ক্লাব অব রোমের ঐ রিপোর্টখানা যাঁরা প্রণয়ন করেছেন তাঁরা লব্ধপ্রতিষ্ঠ পণ্ডিত—তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, ওঁদের যুক্তি আমি নির্দ্বিধায় সব সময় মেনে নিতে পারিনি। আমার কেমন যেন মনে হয়েছে—ওঁরা গবেষণা করতে বসার আগেই একটা পূর্ব-সিদ্ধান্ত ধরে নিয়ে ক্রমাগত একদেশদর্শী যুক্তির অবতারণা করেছেন। ওঁরা জুরী নন, বিচারক নন, কাউন্সেল অব দ্য প্রসিকিউশান। নানান তথ্য, নানান সাক্ষীসাবুদ জোগাড় করে কাঠগোড়ায় দাঁড়ানো বিংশ শতাব্দীর মানব সভ্যতার দোষ প্রমাণ করতে চেয়েছেন! তবে হ্যাঁ, সে যদি মুচলেখা লিখে দেয় তাহলে তাকে এ-যাত্রা ক্ষমা করা যেতে পারে।

আমার আপত্তি কোথায় তা পরবর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত বলব। আপাততঃ বলি—ওঁদের ঐ শেষ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে বাধা দেখি না। কেমন জানেন? অজানা অচেনা জায়গায় কেউ যদি বলে—'রাত্রিবেলা টর্চ ছাড়া বাইরে যেও না, এখানে ভূত আছে, ভূতে ধরবে!'—তখন হয়তো আপত্তি করব না। কারণ ভাবব, ভূতের ভয়টা অহেতুক হলেও পরামর্শটা তো ভালই। ভূত না থাক, খানা-খন্দ, সাপ-বিছে তো থাকতে পারে। টর্চ হাতে যাবার কথাটায় প্রতিবাদ করি কেন?

দুই—আশাবাদীদের যুক্তিঃ

পূর্ব পরিচ্ছেদে আমরা শুধুমাত্র 'ক্লাব অব রোম'-এর রিপোর্টখানা নিয়ে আলোচনা করেছি। কারণ সেটি কোন একজন একক

লেখকের রচনা নয়, একাধিক দিকপাল বিশেষজ্ঞের সম্মিলিত মননের ফল। ওঁদের কমিটিতে যে ষোলোজন বৈজ্ঞানিক কাজ করেছেন তাঁরা বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন শাস্ত্রের পণ্ডিত। অর্থনীতি, সমাজনীতি, কৃষিবিদ্যা, ফলিত বিজ্ঞান, সংখ্যাতত্ত্ব ইত্যাদি। ওঁদের ভিতর ছিলেন ইংরাজ, জার্মান, তুরস্ক দেশীয়, ইরাণী, নরওয়েবাসী এমন কি একজন ভারতীয়—শ্রীনির্মলা এস, মূর্তি। বস্তুতঃ একই বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা বিভিন্ন সমসাময়িক গ্রন্থের মধ্যে এই সব কারণেই আমরা 'লিমিটস্ টু গ্রোথ' গ্রন্থটিকে প্রতিনিধিমূলক বলে ধরে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলাম।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, প্রায় ঐ একই সময়ে—১৯২৮-২৯ সালে একই চিন্তাধারার অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল—ইউরোপে ও আমেরিকায়। নামেই তাদের বিষয়বস্তুর পরিচয়—The Doomsday Book, The Population Bomb, Only One Earth, The Last Days of Mankind, Eco-Doom, Blueprints for Survival অথবা Famine—1955! শেষোক্ত গ্রন্থের নিদান হাঁকা ইতিমধ্যে ব্যর্থ হলেও অন্যান্য গ্রন্থের ভয়াবহ চিত্র স্বতই আমাদের পীড়িত করে। কাকতালীয় ঘটনা বলে মনে হতে পারে, কিন্তু হিসাবে দেখছি, ঐ একই সময়ে প্রযুক্তি-বিদ্যা একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ করেছিল। ১৯২৮ সালে মনুষ্যবাহী আকাশযান এ্যাপোলো—৮ চাঁদের কাছাকাছি ঘুরে আসে এবং ১৯২৯ সালে মার্কিন নভোচারী নীল আর্মষ্ট্রং প্রথম চন্দ্রলোকে পদার্পণ করেন। তখনই মানুষ প্রথম পৃথিবীর বাইরে গিয়ে পৃথিবীর দিকে ফিরে তাকালো। ফটো তুলল—সে ফটো ছাপা হল পৃথিবীর অসংখ্য পত্র-পত্রিকায়। যে কথা খাতা-কলমে বা মনে মনে জানতাম, এবার চর্মচক্ষে তাই দেখলাম—মহাশূন্যের মাঝখানে অদৃশ্য রজ্জুতে ঝুলতে ঝুলতে পৃথিবী চলেছে তার নিরুদ্দেশ যাত্রায়। মসীকৃষ্ণ মহাকাশের পশ্চাদপটে নিঃসঙ্গ একান্ত অসহায় ভূ-গোলকের

ছবি দেখে বুকের মধ্যে কেমন যেন ছাঁৎ করে উঠল। 'বিপুলা এ পৃথিবী'-কে দেখলাম হাতের তালুতে রাখা ছোট্ট আমলকী ফলের মতো। দিগন্ত অনুসারী ধানের ক্ষেত, ভীমনাদিনী নায়েগ্রা, তুষারমৌলী হিমালয়, প্রশান্ত মহাসাগরের ব্যাপ্তি—যা কিছু এতদিন মহান-বিশাল-অফুরন্ত বলে জানতাম, তা তুচ্ছ হয়ে গেল প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে। সেই আতঙ্ক থেকেই কি ঐ জাতের চিন্তা-ভাবনার বন্যায় ভেসে গেল বিশ্বসাহিত্য ?

'ক্লাব অব রোম' রিপোর্টে উল্লিখিত যুক্তির বিশ্লেষণ করার পূর্বে এই প্রসঙ্গে আরও বলি—ঐ জাতের চিন্তাধারার সমান্তরালে দ্বিতীয় একদল বৈজ্ঞানিকও কিন্তু মুখর হয়ে উঠলেন। দেখা দিল এক ঝাঁক বিরুদ্ধ যুক্তির গ্রন্থ : The Future of Man (1959), To Live on Earth (1959), Tomorrow's World (1951), Challange of the Stars (1952), The Next Ten Thousand Years (1955) প্রভৃতি। ওঁরা যদি লেখেন The Future Shock (1952) এঁরা লেখেন Future Without Shock (1954)। আমাদের দুর্ভাগ্য, সাম্প্রতিক এসব বই যথেষ্ট পরিমাণে ভারতবর্ষে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। বৈদেশিক মুদ্রার অপব্যয় হতে দেবেন না সরকার। তাই আপনার আমার মত সামান্য মানুষ, যাদের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় নেই, তার পক্ষে পশ্চিমের জানালাটা খুলবার কোন উপায় নেই। তবু যে-সব গ্রন্থ বহু আয়াসে নানান সূত্র থেকে সংগ্রহ করেছি তাদের ভিত্তিতেই আসুন আলোচনা করা যাক।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা : ক্লাব অব রোমের বিশেষজ্ঞরা বললেন —বর্তমান বৃদ্ধির হারে এ শতাব্দীর শেষে জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৬৫০ কোটিতে। অঙ্কের হিসাবে ভুল নেই, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারটা ধ্রুব থাকবে কেন ? এতদিন সেটা বেড়েছে—কিন্তু এবার হয়তো কমবে। এমন ইঙ্গিত ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। ইউ-

-নাইটেড নেশনস্ তাঁদের ১৯৬০ সালের বার্ষিক রিপোর্টে এমন কথাই বলেছেন। তাঁদের সঙ্কলিত একটি তালিকা এখানে সন্নিবেশিত করে দিলাম। তালিকার দ্বিতীয় স্তম্ভে যে বৎসরটির উল্লেখ আছে, দেখা যাচ্ছে বাড়তে বাড়তে ঐ বৎসরে এসেই ঐ দেশের শিশুজন্মের হারটা থমকে দাঁড়িয়েছে, তারপরে আর বাড়েনি। কমেছে। কি হারে কমেছে তার উল্লেখ করা হয়েছে পঞ্চম স্তম্ভে :

তালিকা ৪—কয়েক রাষ্ট্রে শিশুজন্ম-হ্রাসের খতিয়ান (১২)

দেশ	সর্বোচ্চ সংখ্যার বৎসর	সে-সময়ে বৎসরে শিশু জন্ম (হাজারে)	১৯৫৯ সালে অথবা উল্লিখিত বৎসরে শিশুজন্ম (হাজারে)	শিশুজন্ম-হারে হ্রাসের শতাংশ (%)
এশিয়া :				
সিংহল	১৯৫৯	৩৭১	২৭০ (১৯৫৮)	২৭·২
হংকং	ঐ	১১৯	৮৩	৩০·২
পাকিস্তান	১৯৬০	৫,১০৩	৪,৯৫০ (১৯৫৫)	৩·০
তাইওয়ান	ঐ	৪২৪	৩৫৩	১৬·৭
আফ্রিকা :				
আলজিরিয়া	১৯৫৭	৫৬২	৫৩০	৫·৭
সংযুক্ত আরব	ঐ	১,২৩৫	১,:৯ɩ	৩·২
আমেরিকা :				
কানাডা	১৯৫৯	৪৭৯	৩৭১	২২·৫
কিউবা	১৯৬০	২৬৪	২৩২ (১৯৬৭)	১২·১
চিলি	১৯৫৩	২৯২	২৮৩ (ঐ)	৩·১
যুক্তরাষ্ট্র	১৯৬০	৪২৬৮	৩,৫৭১	১৬·৩

দুর্ভাগ্য, ভারতবর্ষের পরিসংখ্যান সংগ্রহ করতে পারিনি। কোনও পাঠকের তা জানা থাকলে ও অনুগ্রহ করে আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা লিপিবদ্ধ করতে পারি। লক্ষণীয় এখানে

আমরা শুধু শিশুজন্ম হ্রাসের শতাংশ দেখিয়েছি এবং তা থেকে একথা বলা যায় না যে, ঐ ঐ দেশে জনসংখ্যা ঐ হারে কমেছে। কারণটা আগেই আলোচনা করেছি—জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রিত হয় দুটি কারণে, জন্ম ও মৃত্যুহারের সংযুক্ত ফলাফলে। চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি, গণস্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, পারিপার্শ্বিকতার উন্নতি প্রভৃতি কারণে এসব দেশে মৃত্যুহারও ইতিমধ্যে কমেছে। সে যাই হোক, ঐ ৪নং তালিকা থেকে এই প্রশ্নই মনে জাগে না কি—ঐ সব অনগ্রসর দেশে জন্মহার কমল কেন? কানাডা বা যুক্তরাষ্ট্রে '৫৯ বা '৬১ সালে যেটা ঘটল মাত্র কয়েক বছরের ভিতরেই কেমন করে তা সম্ভব হল এই অনুন্নত গরীব দেশগুলিতে?

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একজন মার্কিন বৈজ্ঞানিকের একটি বিচিত্র পরীক্ষার কথা (১৩)। জীববিজ্ঞানীটির নাম জন ক্যালহুন। তিনি একটি বড় খাঁচা বানিয়ে তাতে পাঁচটি নরওয়ে দেশের এক-জাতের ইঁদুরকে রাখলেন। খাঁচাটা এতবড় যে, তাতে আন্দাজ পাঁচ হাজার সুস্থ সবল ইঁদুর কোনক্রমে টিকে থাকতে পারে। এই ইন্দুরগুলির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, এরা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বংশবৃদ্ধি করে। হিসাব মত, দুই বছরে পাঁচটি ইঁদুর থেকে তাদের সংখ্যা হওয়ার কথা পঞ্চাশ হাজার। ক্যালহুন দেখতে চাইলেন, ইঁদুর সংখ্যার বৃদ্ধিজনিত কারণে সীমাবদ্ধ খাঁচায় ওদের যখন স্থানাভাব হবে তখন ওদের প্রজননের হার আপনা থেকেই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় কি না। ইঁদুর সংখ্যা পাঁচ হাজার অতিক্রম করার পরেই স্থানাভাব জনিত কারণে ওদের মৃত্যুহার নিশ্চয়ই বাড়বে—তখনও কি প্রাণধারণের জৈবিক তাগিদে ওদের জন্মহার কমবে না? ইঁদুরের সংখ্যা যেমন যেমন বাড়তে থাকে উনি ওদের খাদ্যের পরিমাণও তেমন তেমন বাড়াতে থাকেন। ক্রমে ইঁন্দুর বংশ বৃদ্ধি পেতে পেতে দুইশতে দাঁড়ালো। তারপর অবাক কাণ্ড! আর বাড়ল না। দৈনিক যত ইঁদুর মরে প্রায় ততগুলিই জন্মায়। দুই

বৎসর পার হয়ে গেল। দীর্ঘদিন পরীক্ষা চালিয়েও দেখা গেল ইঁদুরের সংখ্যা ঐ দুইশতের কাছাকাছি রয়ে গেছে।

জাতিগত আত্মরক্ষার তাগিদে ইঁদুর যে সত্যটা ষষ্ঠ-ইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝে নিল, বুঝে সংযত হল, পঞ্চেন্দ্রিয়ের মালিক বুদ্ধিমান মানুষ সেটা বুঝবে না ?

সব বুদ্ধিমান মানুষ কিন্তু বোঝে না। মার্কিন পণ্ডিত Paul Ehrlich তাঁর গ্রন্থ The Population Bomb-এ তাই নির্বিচারে একথাও লিখতে পারলেন যে, যেসব রাষ্ট্র জন্ম নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হবে না সেইসব দেশে মার্কিন অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়া উচিত! ভাষান্তরে; 'যতক্ষণ তোমরা জন্মনিয়ন্ত্রণ না করছ ততক্ষণ তোমাদের কোনও সাহায্য দেওয়া হবে না।' এ যেন কোনও রুগীকে বলা—'তোমার এতবড় সাহস যে, তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছ! দাঁড়াও মজা দেখাচ্ছি! যতক্ষণ না তুমি সুস্থ হচ্ছ ততক্ষণ তোমাকে কোনও ঔষধপত্র দেওয়া হবে না।'

এই জাতীয় পণ্ডিতের দল ভেবে দেখেন না—অনগ্রসর দেশের মানুষ কেন জন্মনিয়ন্ত্রণ করতে চায় না। যে যত গরীব সে তত সন্তান পায়। শুধু তাই নয়, যে যত গরীব সে তত সন্তান চায়! এ বিষয়ে আমার পূর্ববর্তী গ্রন্থ 'লাল-ত্রিকোণে' বিভিন্ন তালিকার মাধ্যমে আলোচনা করেছি। কারণটা সহজবোধ্য। যে যত গরীব সে ততই তার সন্তানের দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধে আশঙ্কিত। বস্তুতঃ নিচের মহলে শিশুমৃত্যুর হার সব দেশেই বেশি। সেই দুর্দৈবকে ওরা এড়াতে চায় সন্তান সংখ্যার বৃদ্ধি করে। সচেতন চিন্তায় নয়, অবচেতনের তাগিদে। ফল হয় ঠিক উল্টো—উপার্জন কম, অন্নাভাব বেশি, সন্তান সংখ্যা বেশি, ফলে শিশুমৃত্যুর হারও বাড়ে। বিষচক্র পাক খেতে থাকে। ঠিক এই কারণেই আমেরিকা, রাশিয়া, ইউরোপ, জাপান প্রভৃতি অবস্থাপন্ন দেশগুলিতে—যেখানে চিকিৎসা

বিজ্ঞান উন্নত ও সুলভ, শিশুমৃত্যুর হার কম, গড় আয়ু বেশি সেখানে জনসংখ্যার সামগ্রিক বৃদ্ধির হার শতকরা 'এক'-এরও কম। অথচ নিরন্নদের দেশে—যেখানে শিশুমৃত্যুর হার বেশি, গড় আয়ু কম, চিকিৎসার ব্যবস্থা অল্প ও দুর্লভ সেখানে অঙ্কশাস্ত্রকে শিঁকেয় তুলে সামগ্রিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা 'দুই'-এরও বেশি। আমি অনেক পণ্ডিতকে বলতে শুনেছি—ওদের মরাই উচিত। বেটারা খেতে পায় না, অথচ গণ্ডায় গণ্ডায় বাচ্চা পয়দা করে। কেন করে—সেটা ওঁরা তলিয়ে বুঝতে চান না। ওঁরা পল এর্লিক-এর মত অহেতুক মেজাজ খারাপ করেন, কারণ রমেশের জ্যাঠাইমার মত কেউ এসে ওঁদের বুঝিয়ে দেয় নি—'তাহলেই বুঝে দেখ, ওরা কত অসহায়।'

ক্লাব অব রোমের পণ্ডিতরা কিংবা পল এর্লিক-ধর্মী বিশেষজ্ঞদের গবেষণার মূলধন তো সেই টমাস ম্যালথাসের সর্বজনবিদিত সূত্রটা? ম্যালথাস্ তাঁর ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Essays on the Principle of Population' নামক অমর গ্রন্থে বলেছিলেন—জনসংখ্যা বাড়ে গুণোত্তর শ্রেণীতে (জি. পি-তে) অথচ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বাড়ে সমান্তর প্রগতিতে (এ. পি-তে)। ফলে খাদ্যাভাব, স্থানাভাব সমস্যা দেখা দিতে বাধ্য—আজ অথবা কাল। বলেছিলেন, প্রকৃতি এই সমস্যার সমাধান করে, বিশ্বের স্থিতাবস্থা ফিরিয়ে আনে অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, পঙ্গপাল, মহামারী এমন কি মহাযুদ্ধের মাধ্যমে। কিন্তু ঐ সব পণ্ডিত খেয়াল করে দেখেন না যে, মহামতি ম্যালথাস্ পাঁচ বছর পরে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় একটি অত্যন্ত জরুরী কথা যোগ করেছিলেন তাঁর সূত্রে: unless controlled by some moral restraint' অর্থাৎ 'যদি না নীতিগত কোন প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে এ দুর্ভাগ্যকে এড়ানো যায়।' নীতিগত প্রতিবন্ধকতা কাকে বলি? ক্যালহনের খাঁচার মনুষ্যেতর জীবগুলির নিশ্চয় নীতিবোধ ছিল না। Moral (নীতিগত) শব্দটার বদলে Conscious (সচেতন) শব্দটা কি

সুপ্রযুক্ত হত? তা সে যাই হোক, এ কথা বলব যে, ম্যালথাসের ঐ তথাকথিত 'নীতিগত প্রতিবন্ধকতার' বর্তমান শতাব্দীতে স্বীকৃত সংজ্ঞা: জন্মনিয়ন্ত্রণ বা লাল-ত্রিকোণ।

ইউনাইটেড নেশন্‌স্ প্রকাশিত সাম্প্রতিক বুলেটনে তাই আশা প্রকাশ করা হয়েছে—গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির বর্তমান হার (২'১%) আগামী আশির দশকেই যথেষ্ট কমে যাবে। এ শতাব্দীর বাকি কয় বছরে তা থাকবে ১'৫ থেকে ১'৯-এর ভিতর। আগামী শতাব্দীর প্রথম পাদেই তা শূন্য হয়ে যাবে অর্থাৎ পৃথিবীতে জন্ম-মৃত্যু সমান সমান হয়ে বিশ্বমানব একটা স্থিতাবস্থায় পৌঁছাবে। সেই স্থিতাবস্থায় বিশ্ব-জনসংখ্যা হাজার কোটি কিছুতেই অতিক্রম করবে না।

সেই সুস্থিত হাজার কোটি নরনারী আগামী শতাব্দীগুলিতে কীভাবে খাদ্য, বস্ত্র, বাসভূমি, খনিজ-সম্পদ, শক্তি ইত্যাদির সংস্থান করবে সেকথা আমরা ক্রমে ক্রমে দেখব।

পার্থিব খনিজ সম্পদ: নিরাশাবাদীরা একটা কথা হিসাবে ধরেন নি। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিটাও 'এক্সপোনেন্সিয়াল হারে' বাড়ছে। 'ক্লাব অব রোমের' পণ্ডিতেরা যদি এই শতাব্দীর উষালগ্নে তাঁদের গবেষণা করতে বসতেন, তাহলে তাঁরা বলতেন ১৯৭৫ সালের ভিতরেই এসে যাবে—'শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর'। কারণ তখন তাঁরা ইউরেনিয়ামের ব্যবহারের কথা জানতে পারতেন না, পারমাণবিক শক্তি উৎসের কথা তখন ছিল কল্পনার বাইরে; এয়ারোপ্লেন, প্লাস্টিকস্, স্টেনলেশ স্টীল ইত্যাদির কথা ছিল অজানা। ওঁরা হিসাব করে বলতেন, বাজারে ল্যাঙড়ার পরে ফজলি আসবে—কিন্তু তারপর? ফজলিতর আম বাজারে আসবে না—আর ফল খেতে পারবে না! ওঁরা খেয়াল করতেন না, আমরা তখন চাকরকে বলব—'বাজারে আতা উঠেছে কিনা দেখিস তো রে।' পঞ্চাশ বছর আগে ওঁরা যে ভুলটা করতেন আজ তাই করা হচ্ছে। আজ আমরা

কল্পনা করতে পারছি না—আগামী যুগের প্রযুক্তিবিদ কী ভাবে কলকারখানার কাঁচামালের চাহিদা মেটাবে—ফজলির পরে যে আতা আসতে পারে এটা মনে পড়ছে না। হয়তো একবিংশতি শতাব্দীর মেটালার্জিস্ট বা ব্যবহারিক-রসায়নবিদ নতুন জাতের 'বিষম ধাতুর মিলন ঘটায়ে' নূতন বিবাহ ব্যবস্থা করবেন, নূতন ধাতব পদার্থ আবিষ্কার করবেন। আজ যে কাজে যতটা কাঁচামাল লাগছে তখন তার অনেক কম লাগবে। একটা উদাহরণ দিই—

প্যারিসের বিশ্ববিখ্যাত আইফেল টাওয়ার তৈরী হয়েছিল গত শতাব্দীতে—১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। উচ্চতার সেটা তিনশ মিটার বা ৯৮৪ ফুট। তার আটষট্টি বছর পরে টোকিওতে যে টাওয়ারটি নির্মিত হল তার উচ্চতা ৩৩৩ মিটার বা ১০৯৩ ফুট। অথচ আইফেল টাওয়ারে যে পরিমাণ লোহা লেগেছিল তার চেয়েও উঁচু টাওয়ার বানাতে টোকিওতে লোহার প্রয়োজন হল তার ২৫% কম। কি করে হল? প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতিতে। উন্নতধরণের স্টীল ব্যবহার করে, ডিজাইনের হিসাব আরও সূক্ষ্মতর করে।

খাদ্য সমস্যা: অনুরূপভাবে বলা যায়, প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতিতে খাদ্যসমস্যার সমাধান কী-ভাবে হতে পারে তা আমরা আজ চিন্তাই করতে পারছি না। কিছুদূর পর্যন্ত এখন দেখতে পাচ্ছি—জুলভের্ন-এর নায়ক ক্যাপ্টেন নিমো যে-ভাবে তাঁর 'নটিলাস'-এ খাদ্যাভাবের সমস্যা দূর করেছিলেন। মানুষ এখনও সেদিকে বড় একটা নজর দেয়নি। ক্লাব অব রোম বলেছেন—পৃথিবীর চাষযোগ্য জমির পরিমাণ অপরিবর্তনশীল—৩২০ হেকটেয়ার। যে কথাটা তাঁরা বলেন নি তা কিন্তু আমরা স্কুলপাঠ্য ভূগোলেই পড়েছি: পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল। ঐ তিনগুণ ক্ষেত্রফলের সমুদ্রে যে উদ্ভিদ জন্মায় বস্তুত এখনও তাতে আমরা প্রত্যক্ষভাবে হাতই দিইনি। সামুদ্রিক মাছ ও জলজন্তুর মাধ্যমে তা পরোক্ষভাবে গ্রহণ করেছি বটে, কিন্তু সে দিকেও আমরা ঠিকমত নজর দিইনি। হাজার

বছর আগে মানুষ যেমন জমিতে সার দিত না—সহজলভ্য সোনা ফলানো জমি শুধু ক্রমাগত চাষই করে যেত। এবার থেকে হয়তো সমুদ্রে 'সার' দেওয়ার ব্যবস্থা হবে—অর্থাৎ কী-ভাবে সামুদ্রিক জীবজন্তু, মাছ, উদ্ভিদের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তা আমরা দেখব।

'ক্লাব অব রোম'-এর আর একটি তত্ত্বকে অন্য এক কারণে মেনে নিতে পারছি না। ওরা বলেছিলেন—জনসংখ্যার বৃদ্ধি ও চাষ-যোগ্য জমির অপ্রতুলতার বিষময় ফল ইতিমধ্যেই দেখা গেছে, "আজকের পৃথিবীতে বছরে এক কোটি থেকে দুই কোটি নরনারী শুধুমাত্র খাদ্যাভাবে, অপুষ্টিজনিত কারণে প্রাণ দিচ্ছে।"

উদ্ধৃত তথ্যটা সত্য, তার পিছনের তত্ত্বটা নয়! আমার তো মনে হয়েছে ঐ দুর্ভাগ্যের জন্য মানুষের সমাজ-ব্যবস্থা যতটা দায়ী প্রকৃতির কৃপণতা ততটা মোটেই দায়ী নয়। আজকের পৃথিবীতে উৎপন্ন খাদ্যের পরিমাণ আজকের জন-সংখ্যার পক্ষে অপ্রতুল নয়; অভাব যেটা দেখতে পাচ্ছি—ঐ বাৎসরিক দুই এক কোটি মানুষের অপুষ্টিজনিত মৃত্যু, তার হেতু অসম ধনবণ্টন ব্যবস্থা। মুষ্টিমেয় একদল অস্তি-মানুষ যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ নাস্তিদলকে শোষণ করার সুযোগ না পেত—উৎপন্ন খাদ্য যদি সমান পরিমাণে বণ্টন করা যেত তাহলে আজকের দুনিয়ায় ঐ দুই এক কোটি মানুষ মরত না।

বর্তমান এবং অদূর ভবিষ্যতের কথা ছেড়ে একটু দূরে যদি দৃষ্টি দিই তাহলে মনে প্রশ্ন জাগে—পরবর্তী শতাব্দীতে খাদ্যসমস্যার বিষয়ে কোন মৌলিক সমাধানে উপস্থিত হওয়া কি এতই অসম্ভব? একদিন মনে করা হত—মানুষ কোনদিন আকাশে উড়তে পারবে না; রাইট ব্রাদার্স সেটা অপ্রমাণ করলেন। একদিন মনে করা হত—পৃথিবীর অভিকর্ষের বাধা অতিক্রম করে মানুষ কোনদিন মহাশূন্যে যেতে পারবে না; উরী গ্যাগারিণ সেটা অপ্রমাণ করলেন। চাঁদে পদার্পণ করার মত অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভব হল। শব্দের গতির সীমা আমরা অতিক্রম করেছি সুপারসনিক জেট প্লেনে।

অনুরূপভাবে খাদ্যসমস্যার যেটি মূল বাধা, তাও যে একবিংশতি শতাব্দীর মানুষ অতিক্রম করবে না তাই বা কে বলল? সেই মৌল বাধাটা কী?

আমরা জানি, মানুষ প্রত্যক্ষভাবে হ'ক পরোক্ষভাবে হ'ক উদ্ভিদ জগতের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। গাছের পাতা জানে কী কায়দায় সূর্যরশ্মি থেকে শক্তি আহরণ করে ফোটোসিন্থেসিসের মাধ্যমে জীবনরস সঞ্চার করা যায়! জীব তা জানে না, মানুষ তা পারে না। মানুষ ভাত খেয়ে বাঁচে, রুটি খেয়ে বাঁচে—কিন্তু কী ভাবে? চাল বা গমের ভিতর থেকে সে বস্তুত সেই শক্তিটুকুই গ্রহণ করে যে-শক্তি ঐ ধানের শীস বা গমের দানা একদিন সূর্য থেকে সংগ্রহ করে সঞ্চিত করেছিল। বাঘ শস্য খায় না, খায় তৃণভোজী প্রাণীকে, যে তৃণভোজী তৃণের কাছে ঋণী। এমন কি আমরা যে মাছ খাই খোঁজ নিলে দেখব সেই মাছও জীবন ধারণ করেছে আরও ছোট জাতের মাছ খেয়ে। আরও ছোট, আরও ছোট—মাৎস্যন্যায়ের শেষ সোপানে পৌঁছে দেখব সেই ছোট্ট প্রাণী জলজ উদ্ভিদ খেয়ে জীবনধারণ করে। পৃথিবীতে জীবন কী-ভাবে বিকশিত হল বিজ্ঞান তা আজও জানে না, তবে অনুমান করে, ষাট সত্তর একশ কোটি বছর পূর্বে জীবনের প্রথম বিকাশ ঘটেছিল সমুদ্র বক্ষে, উদ্ভিদরূপেই! সেই আদিম প্রাণীর সাধারণ নাম 'ব্লু-এ্যালগী'; এক-কোষ-বিশিষ্ট এক আধা-উদ্ভিদ। কল্প-কল্পান্তরের বিবর্তনে সেই এক-কোষ-বিশিষ্ট প্রায়-উদ্ভিদ থেকেই বিকশিত হয়েছে মানুষ—যার দেহে কোষের সংখ্যা $১০^{১৪}$। এই জটিল মনুষ্য দেহের সঙ্গে আদিম উদ্ভিদের কোনও সাদৃশ্য নেই—তবু তাদের সম্পর্কটা তো অস্বীকার করা যায় না। সেই সম্পর্কটা আজও আছে—মানুষ আজও তার জটিল শরীর ধর্মটাকে টিকিয়ে রাখছে একই পদ্ধতিতে—সৌরশক্তি থেকে ফটো-সিন্‌থেসিসের মাধ্যমে জীবনরস আহরণ করে; তবে সে আজকাল সেটা স্বয়ং করে না—সাহায্য নেয়

উদ্ভিদের। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রতিটি মানুষ যেমন চাষ করত, শীকার করত—আজ করে না। আজকের শহরবাসী মানুষ চাষও করে না। তারা সেজন্য বহাল করেছে চাষীকে, পশুপালককে, মৎস্যজীবীকে! মানুষ তেমন সৌরশক্তি আহরণের দায়িত্বটা দিয়েছে উদ্ভিদ জগতকে।

যদি আগামী যুগের প্রযুক্তিবিদেরা এমন একটা আবিষ্কার করতে পারেন যাতে মানুষকে আর উদ্ভিদের মাধ্যমে, শস্যের মাধ্যমে সৌরশক্তি আহরণ করতে হবে না? যান্ত্রিক পদ্ধতিকে ফটো-সিন্‌থেসিস প্রক্রিয়ায় যদি সে প্লাষ্টিক খাদ্য তৈরী করে? ঐ তৃণাদপি সুনীচ এক-কোষ-বিশিষ্ট উদ্ভিদ যে কাজটা পারে বুদ্ধিমান মানুষ যদি তা করতে সমর্থ হয়? তখন খাদ্য সমস্যার সমাধান হবে নতুন পথে। চাষযোগ্য জমির জন্য তখন আর আমাদের মাথা খুঁড়ে মরতে হবে না। কথাটা নিতান্ত অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে? সেটাই তো স্বাভাবিক। আকাশে ওড়া, মাধ্যাকর্ষণের বন্ধন ছাপিয়ে ওঠা, শব্দের গতিকে অতিক্রম করাও যে একই রকম অসম্ভব মনে করেছিলেন গত যুগের ধুরন্ধরেরা।

শক্তির উৎস : একই ভঙ্গিতে বলব, এখানেও আমাদের প্রচলিত চিন্তাধারার মৌলিক পরিবর্তন সম্ভব। বস্তুতঃ সে পরিবর্তন ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। 'ক্লাব অব রোম'-রিপোর্টে ধরে নেওয়া হয়েছে—মানুষ আগামী যুগেও তার শক্তির ৯৭ শতাংশ সংগ্রহ করবে কয়লা ও পেট্রোল থেকে। এখানেও একই কথা বলব—শক্তির মূল উৎস তো সেই সূর্য। সেই মূলশক্তি-উৎসের কতখানি অংশ পৃথিবীতে এসে পৌঁচাচ্ছে? আমরা ইতিপূর্বে বলেছিলাম—মানবসভ্যতা বর্তমান শতাব্দীতে যে পরিমাণ শক্তি খরচ করছে তাকে যদি বলি '১০ক' পরিমাণ শক্তি তা হলে সারা পৃথিবীর উদ্ভিদ জগৎ প্রতি বছরে সৌর-শক্তি সংগ্রহ করছে '৩০০ক' পরিমাণ। ঐ সূত্রটি নিয়ে বলি প্রতি বছরে সৌর-শক্তির যে অংশ এই পৃথিবীতে

এসে পৌঁচাচ্ছে তার পরিমাণ '১০,০০০ক'। ঐ বিপুল শক্তিকে মানবসভ্যতা এবার কাজে লাগাতে চায়, সে কাজ শুরুও হয়ে গেছে। আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনে বহু বাড়ির ছাদে 'সৌর-দর্পণ' বসানো হয়েছে, যার সাহায্যে সে-সব বাড়ির শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও গরম জল সরবরাহ ব্যবস্থা করা হয়েছে বিনা বিদ্যুতে। একথা প্রথমেই বললাম এজন্য যে, ছোট ছোট সৌর-দর্পণে ব্যাপকভাবে শক্তি ব্যবহার করা সহজ। এছাড়া কেন্দ্রীভূত সৌর-শক্তির আধার তো বহু দেশেই বসানো হয়েছে বা হচ্ছে। যতদূর জানি, পৃথিবীর সব চেয়ে বড় সৌর-দর্পণ বসানো হয়েছে—ফ্রান্সে। যার মাপ বাইশ হাজার বর্গফুট। অত প্রকাণ্ড আয়নায় প্রতিফলিত সূর্যালোক যে বিন্দুতে সঞ্চিত হয় সেখানে উত্তাপ উঠে যায় ৪০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। অর্থাৎ যে উত্তাপে লোহা অথবা সোনা তো বটেই হীরকখণ্ড পর্যন্ত গলে যাবে। সেটাই শেষ কথা নয়, এর চেয়েও একটি অদ্ভুত যন্ত্র বর্তমানে বানাচ্ছেন তিনটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে। ওঁরা বিচার করে দেখলেন, সৌরশক্তির একটা বিরাট অংশ অহেতুক নষ্ট হয়ে যায় বায়ুমণ্ডল ভেদ করে আসার সময়। তাই এবার ওঁরা ঐ সৌর-দর্পণটি বসাতে চাইছেন একটি কৃত্রিম উপগ্রহে। পঞ্চাশ বর্গ কিলোমিটার স্থান থেকে সৌরশক্তি সংগ্রহ করবে ঐ যন্ত্রটি। পৃথিবী থেকে তেইশ হাজার মাইল দূরে থেকে সেই কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবে। ঐ কৃত্রিম উপগ্রহ সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে একটি মাইক্রোওয়েভ জেনারেটারের মাধ্যমে পৃথিবীর দিকে পাঠাবে এবং পৃথিবীস্থিত একটি প্রকাণ্ড এ্যানটেনা (সাত কিলোমিটার ব্যাসের) গঙ্গাবতরণ-কালে মহাদেবের মত সেই বিদ্যুৎশক্তিকে মস্তকে ধারণ করবে। সমস্ত তথ্যটাই সংগ্রহ করেছি বি, বি, সি প্রচারিত টি, ভি প্রোগ্রাম থেকে। বৈজ্ঞানিকরা আশা করছেন ১৯৯০ সাল নাগাদ ঐ প্রকল্প চালু হবে এবং তা থেকে ৫×১০^{৬} কিলোওয়াট (পাঁচ হাজার

মেগাওয়াট) বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাবে (১৪)। বলা বাহুল্য এ জাতের কারখানায় ধোঁয়া বা কার্বন ডায়ক্সাইড আবহাওয়াকে দূষিত করবে না, পারমাণবিক শক্তি ষ্টেশনের মত তেজস্ক্রিয়তার ভয়ও থাকবে না।

শক্তির দু-নম্বর উৎসের সন্ধান পাওয়া গেছে—পারমাণবিক রাজ্যে—সে সম্বন্ধে নিরাশাবাদীরা আশ্চর্য রকমে নীরব। যেন ক্লাব অব রোমের পণ্ডিতেরা এখনও খবরই পাননি রাদারফোর্ড, চাডউইক, কুরি, ফার্মি, অটো হানের সাধনায় আইনস্টাইনের সেই আশ্চর্য ফর্মুলা $E=mc^2$ বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে। তাই আশ্চর্য লাগে—কয়লা আর পেট্রোলিয়াম নিয়ে অত বড় বড় আঁক কষে ওঁরা ষোলো জনে মিলে কী করে বললেন—পৃথিবী আঁধার হয়ে যাবে একশ বছরের মধ্যেই! ওঁরা কি হিরোসিমা নাগাসাকির নামও শোনেননি? জানেন না, সেই দৈত্যকে আমরা এখন কাজে লাগাচ্ছি?

যুদ্ধোত্তর গ্রেট ব্রিটেনে 'ক্যালডেন হল' প্রকল্প সাফল্যমণ্ডিত হবার পর গ্রেট ব্রিটেন একাধিক পারমাণবিক শক্তি-প্রকল্পে হাত দিয়েছিল। ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ইংরাজ বৈজ্ঞানিকেরা ঘোষণা করেছিলেন—পরের এই সত্তরের দশকে সমগ্র গ্রেট ব্রিটেনে ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তির এক-তৃতীয়াংশ পরমাণুর অন্দর থেকে সংগৃহীত হবে। সে পরিকল্পনা কত দূর সাফল্যলাভ করেছে সে খবর আর পাইনি, তবে নূতন নূতন পারমাণবিক স্টেশন যে গড়ে উঠেছে এ খবর পেয়েছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫৯ সালে ছয়শত বিলিয়ান (৬×১০^৯) ডলারের চেয়েও বেশি খরচ করেছে নূতন শক্তির সন্ধানে—অর্থাৎ প্রচলিত পেট্রোল, কয়লা, কাঠ, কেরোসিনের পরিপূরকের সন্ধানে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে (তিন বছর আগের খবর) আঠাশটি পরমাণু-প্রকল্প ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে, পঞ্চাশটিতে কাজ চলছে, এবং আরও সত্তরটির জন্য যন্ত্রপাতির অর্ডার গেছে। মার্কিন

সরকার ঘোষণা করেছিলেন—১৯৫৯ সালের ভিতরে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তির (৩'৭ লক্ষ মেগাওয়াট !) প্রায় এক তৃতীয়াংশ ওরা পারমাণবিক শক্তি থেকে পাবে।

তৃতীয় শক্তি-উৎস আছে পৃথিবীর অভ্যন্তরে। কয়লা, পেট্রোল নয়—পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ উত্তাপ। কয়লাখনির ভিতরে দেখা গেছে প্রতি ১২০ ফুট গভীরে গেলেই উত্তাপ বৃদ্ধি হয় এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। এই ভূগর্ভস্থ উত্তাপ সংগ্রহের অনেক প্রকল্প ইতিমধ্যেই সুফলপ্রসূ হয়েছে—বিশেষ করে নিউজিল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, আইসল্যাণ্ড, রাশিয়া ও ইটালীতে। শেষোক্ত রাজ্যের লার্ডারেলো প্রকল্পে নাকি ইটালীতে ব্যবহৃত বিদ্যুৎশক্তির এক চতুর্থাংশ এভাবেই বর্তমানে সংগৃহীত হচ্ছে (১৫)। এই প্রসঙ্গে আরও একটা খবর জানাই: নটিংহ্যাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্যার অধ্যাপক লর্ড এনারগ্লিন একটি অভিনব থিয়োরি দিলেন। বললেন, পৃথিবীর বুকে যদি পাশাপাশি দুটি ফুটো করা যায় এবং এক নম্বর ফুটো দিয়ে জল পাঠিয়ে দু-নম্বর ফুটোয় বাষ্প সংগ্রহ করা হয়, তাহলে প্রায় নিখরচায় প্রচুর শক্তি পাওয়া যাবে। নটিংহ্যামের ঐ অধ্যাপক মহাশয়ের থিয়োরিটা নিয়ে আমেরিকার লস্ এ্যালমস-এ কম্পুটার এ্যানালিসিস্ করা হল। হিসাব মত দেখা গেল, ফুটো দুটি যদি দশ মাইল গভীর হয় তা হলে এভাবে প্রায় বিনা খরচে দেড়শ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। অবশ্য ক্রমশঃ উত্তাপটা কমতে থাকবে। তবু দশ বছর পরেও একশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এভাবে উৎপন্ন হবে। নিউ মেক্সিকো অঞ্চলে এ নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে।

এ ছাড়াও অন্যান্য শক্তি-উৎস—সাবেক উইণ্ডমিল থেকে শুরু করে জোয়ার-ভাঁটা, জলবিদ্যুৎ প্রভৃতি পদ্ধতিতে নানাভাবে আজ পৃথিবী শক্তি সংগ্রহের চেষ্টা করছে। কয়লা পেট্রোলিয়াম মোমবাতি কাঠ ও ঘুঁটের ভরসায় পৃথিবী বসে নেই।

আবহাওয়া দূষিত-করণ ঃ আগেই বলেছি শক্তির উৎস সন্ধানে আমাদের দৃষ্টি যখন এতাবৎকালের প্রচলিত বস্তু—কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি থেকে সৌরশক্তি বা পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তির দিকে যাবে তখন কলকারখানার ধোঁয়া, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডায়ক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস অনেক কম পরিমাণে বাতাসকে দূষিত করবে। কিন্তু শহরের আবর্জনার কি ব্যবস্থা হবে? সে বিষয়েও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ব্রিটেন, ডেনমার্ক, আমেরিকা ও জাপানে এ নিয়ে অনেক কিছু করা হয়েছে। একটা উদাহরণ দিই। ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেন-এর একশ কিলোমিটার দূরে কালুন্দবোর্গ শহরের পৌরসংস্থা যে ব্যবস্থা করেছেন তার কথাই বলি। খুব বড় শহর নয়, লোক-সংখ্যা প্রায় বারো হাজার। দৈনিক সেখানে প্রায় বারো টন আবর্জনা জমে। ওঁরা একটি যন্ত্র বসালেন শহরের উপকণ্ঠে, তার নাম দিলেন 'ডেস্ট্রগ্যাস'। ঐ যন্ত্রের অভ্যন্তরে আবর্জনাকে অক্সিজেন-গ্যাসের অনুপস্থিতিতে উত্তপ্ত করা হয়। অক্সিজেন থাকলে আবর্জনা পুড়ে যেত—যেমন যায়, আমাদের দেশে 'ইনসেনিরেটারে'। এ-ক্ষেত্রে ওটা পুড়ে যায় না—আবর্জনায় অবস্থিত পূতিগন্ধময় জান্তব অনু (organic molecules) ভেঙে যায় এবং বিভিন্ন পরমাণু নূতনভাবে নিজেদের সাজিয়ে নিয়ে অর্থাৎ রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নূতন পদার্থের জন্ম দেয়—মিথেন, এথিলিন, বিভিন্ন তৈল এবং নিছক হাইড্রোজেন। সেগুলি পুনরায় কাজে লাগে। প্রতি এক টন আবর্জনা থেকে ওরা প্রায় ৬০০ ঘন-মিটার গ্যাস উৎপন্ন করে।

আমেরিকাতেও এই জাতের যন্ত্রাদি বসানো হচ্ছে। সাবেক পন্থায় আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলার ব্যবস্থাপনা ক্রমে ক্রমে বাতিল হয়ে যাচ্ছে। আবর্জনা দাহ করলে একদিকে যেমন ধোঁয়া, কার্বন ডায়ক্সাইড এবং বাতাসে-ভাসমান দগ্ধাবশেষে আবহাওয়াকে দূষিত করে, অপরদিকে তেমনি বহু-প্রয়োজনীয় বস্তু নষ্ট হয়। তাই

আধুনিক ব্যবস্থায় আবর্জনা থেকে' যাবতীয় প্রয়োজনীয় বস্তু নিষ্কাশনের আয়োজন হচ্ছে।

ব্রিটেনে ওরা অন্যরকম ব্যবস্থা করেছে। যেখানে ময়লা জমে (যেমন আমাদের হগ মার্কেট বা কোলে বাজার) এবং যেখানে ময়লাটা এতদিন ফেলা হত (যেমন আমাদের ধাপার মাঠে) তার মাঝামাঝি স্থানে, শহরের উপকণ্ঠে ওরা একটা যন্ত্র বসিয়েছে যাতে আবর্জনাকে চাপ দিয়ে আকারে সঙ্কুচিত করা হয়—যেমন আমাদের পাটের গাঁটরি ব্রামা-প্রেস-এ চেপ্টে ছোট করা হয়। ওরা হিসাব কষে দেখেছে, এতে ময়লা অপসারণে অনেক সুবিধা হচ্ছে। আবর্জনার সমস্যা হচ্ছে তার আকার, ওজন নয়। একটা লরী যত ওজন নিতে নিতে পারে তা লরিতে ওঠানো যায় না—বহনযোগ্য ওজনের আধাআধি পৌঁছাতেই লরি 'উপচীয়মান' হয়ে যায়। কলকাতায় এ দৃশ্য আমরা নিত্য দেখছি—কর্পোরেশনের লরি যখন পদচিহ্ন রাখতে রাখতে চলতে থাকে তখন মনে পড়ে যায়, মদনভস্মের পরের কথা—'করেছ এ কি সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে!' লণ্ডনের পৌরকর্তারা হিসাব কষে দেখেছেন, মাঝ রাস্তায় আবর্জনাকে এভাবে সঙ্কুচিত করলে লরি যাতায়াতের দূরত্ব বছরে প্রায় চার লক্ষ মাইল কমে যাবে।

জাপান এই প্রক্রিয়াটিকে আবার আরও একধাপ এগিয়ে নিয়ে নিয়ে গেছে। তারা যন্ত্রের সাহায্যে ঐ আবর্জনা স্তূপে এত প্রচণ্ড চাপ দিতে পারছে যে, তা একেবারে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়ে যায়। ওরা তখন সেই চৌকো আবর্জনা-পিণ্ডগুলির গায়ে একপ্রস্থ সিমেন্টের পলেস্তারা অথবা এ্যাসফল্ট লাগিয়ে দেয়। ঐ শক্ত আবর্জনা-পিণ্ড অতঃপর পীচের রাস্তা তৈরীর কাজে লাগে। রাস্তার নিচে আমরা ইট-পাথর বিছাই, ওরা বিছিয়ে দেয় ঐ আবর্জনার অবশেষ।

মোটকথা আবর্জনায় বাতাস দূষিত যাতে না হয় সেদিকে

প্রযুক্তিবিদেরা ইতিমধ্যেই অবহিত হয়েছেন। নানান জাতের ব্যবস্থা হচ্ছে। আগামী যুগে এ সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান হবে না একথা মনে করার কোন হেতু দেখি না।

পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা : সাধারণ লোকের তো বটেই অনেক বিজ্ঞান-শিক্ষিত পণ্ডিতের ধারণা—বিভিন্ন শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে আজ যে পরিমাণ পারমাণবিক অস্ত্র সঞ্চিত তার ব্যাপক প্রয়োগ হলে এই পৃথিবীতে মানব সভ্যতা চিরতরে লুপ্ত হতে বাধ্য। ক্লাব-অব-রোমের পণ্ডিতেরা এ প্রসঙ্গ তোলেন নি, কিন্তু অন্যান্য লেখকেরা তুলেছেন। এ সম্বন্ধে আমাদের জানা তথ্য এত কম যে, সন্তোষজনক জবাব দেওয়া শক্ত। কার ভাঁড়াতে কতটা 'ভবানী' আছে তাই যে জানিনা ছাই! তবু যে-টুকু জানা যাচ্ছে তাই নিয়েই বিচার করে দেখা যাক। আড্রিয়ান বেরী বলছেন "It is true that nuclear weapons have been stockpiled to such an extent that the equivalent in explosive power of ten tons TNT exists for every human being in the world [এ কথা সত্য যে, পারমাণবিক অস্ত্র এ-ভাবে নির্মিত হয়েছে যাতে পৃথিবীর প্রতিটি ব্যক্তির জন্য মাথাপিছু দশ-টন টি-এন-টি বিস্ফোরণ শক্তি সম্পন্ন মরণাস্ত্র এ পর্যন্ত সঞ্চিত হয়েছে]। স্বতই মনে হয় কথাটা অত্যুক্তি। কিন্তু কে জানে, খুনে ব্যাটারা হয়তো সত্যিই তা করেছে ইতিমধ্যে। ফলে, সেটাই মেনে নিয়ে দেখি যে, সেই পরিমাণ মারণাস্ত্রে যুদ্ধবাজরা পৃথিবী থেকে মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করতে সক্ষম কিনা। আসুন, 'যা-থাকে বরাতে' বলে অঙ্কটা কষেই ফেল :

আড্রিয়ান বেরী-সাহেবের হিসাবমত পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের পুঞ্জীভূত পারমাণবিক ব্রহ্মাস্ত্রের শক্তি

= পৃথিবীর জন-সংখ্যা × দশ-টন টি.এন.টি

= ৩.৬×১০^{১০} টন টি.এন.

কিন্তু তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে যুদ্ধবাজেরা কিছুতেই এই পরিমাণ এ্যাটম বোমা সারা পৃথিবীতে সমানভাবে নিক্ষেপ করতে পারবে না—যাতে প্রতিটি ভাগ্যবান নরনারী তার মাথা-পিছু বরাদ্দ দশটনী বোমা ব্রহ্মতালুর কেন্দ্রবিন্দুতে লাভ করবে। বোমাগুলি অধিকাংশই মেগাটনি—অর্থাৎ এক-একটি পেল্লায় বোমায় দশলক্ষ টন টি.এন.টির বিস্ফোরণ-ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। ফলে ওভাবে মাথাপিছু সে বিস্ফোরণ-শক্তিকে ভাগ করে দেওয়া অসম্ভব। যুদ্ধবাজেরা বড়জোর ঘনবসতি অঞ্চলে তাদের মেগাটনী উপহার ফেলতে পারে। মার্কিন সরকার দুজন অভিজ্ঞ সেনেটারকে নিয়ে একটি কমিটি তৈরী করে অনুরোধ করেন—এ বিষয়ে গবেষণা করে তার ফলাফল জানাতে (১৭)। অর্থাৎ ওঁরা কল্পনায় তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে আমেরিকায় পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করে তার সম্ভাব্য ফলাফল রিপোর্ট করবেন। ১৯৫৮ থেকে ১৯৫৯ পর্যন্ত গবেষণা করে, বিভিন্ন পণ্ডিত, মিলিটারীতে অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষ্য ও জবানবন্দী নিয়ে ওঁরা যে রিপোর্ট দাখিল করলেন, সেটাই আমাদের বিচার্য বিষয় হতে পারে। মুশ্‌কিল এই যে, মূল রিপোর্টখানি গোপন তথ্য, মিলিটারী সিক্রেট! তা হ'ক, তবু তার বেশ খানিকটা উদ্ধৃতি পেয়েছি রবিন ক্লার্কের লেখায় The Science of War and Peace (1922) গ্রন্থে। তা থেকেই আপনাদের কিছু সন্দেশ পরিবেশন করি, চেখে দেখুন :

অনুমান করা হল নিউ-ইয়র্কের বাণিজ্য-কেন্দ্রবিন্দুতে দুটি দশ-মেগাটন (বুঝতে সুবিধা হবে বলে উল্লেখ করছি এক-একটি দশ-মেগাটনী বোমা হিরোসিমায় পতিত এ্যাটম-বোমার চেয়ে পাঁচশতগুণ শক্তি সম্পন্ন) বোমা পড়ল যখন শহরের ঘন-বসতি এলাকার দিকে ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল বেগে বাতাস বইছে (যাতে তেজস্ক্রিয় রশ্মি সেদিকে বাহিত হয়)। এ ছাড়া একই সময়ে বোস্টন থেকে ওয়াশিংটনের মধ্যে জনবহুল এলাকায় তাক্ করে করে ২৭৫ মেগাটন (অর্থাৎ হিরোসিমা-বোমার চৌদ্দ হাজার গুণ শক্তিসম্পন্ন) বোমা

পড়ল। তা ছাড়া ঐ একই সময়ে সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৪০০ মেগাটন বোমা (অর্থাৎ ৭২,৫০০ গুণ হিরোসিমায় বোমা) বিক্ষিপ্ত-ভাবে পড়ল। ফল কী হবে ?

এই অকল্পনীয় প্রলয়ঙ্কর বোমাবর্ষণের ফলে, বিশেষজ্ঞরা হিসাব করে বললেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রর ৩১ শতাংশ নরনারী (প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি) তৎক্ষণাৎ নিহত হবে। এ ছাড়া ১২ শতাংশ (প্রায় দু-কোটি) গুরুতররূপে আহত হবে, হয়তো পরে মারা যাবে। তা ছাড়া আরও আধ-কোটি নরনারী তেজস্ক্রিয়-রশ্মিতে এ ভাবে আক্রান্ত হবে যাতে তাদের বেঁচে থাকাই বিড়ম্বনা। ও দেশের যাবতীয় ঘরবাড়ির আধাআধি মুহূর্তমধ্যে ভূতলশায়ী হবে। বলা বাহুল্য জল, বিদ্যুৎ, পয়ঃপ্রণালী, যানবাহন সম্পূর্ণরূপে অকেজো হয়ে যাবে।

না হবে কেন ? কল্পনায় আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে পরিমাণ পারমাণবিক বোমা বর্ষণ করেছি, তা হচ্ছে হিরোসিমায় বর্ষিত ঐতিহাসিক বোমার প্রায় একলক্ষ গুণ শক্তিসম্পন্ন মারণাস্ত্র।

তবু, আশ্চর্যের কথা—বিশেষজ্ঞরা হিসাব কষে বললেন, এত করেও পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মার্কিন সভ্যতাকে চিরতরে মুছে ফেলা যাবে না ! এই অপরিসীম ক্ষতি সহ্য করে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় ফিরে আসতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সময় লাগবে দুই দশক ! কারণ জনসংখ্যার শতকরা সাতান্নভাগ নরনারী (দশ কোটিরও বেশি) থাকবে অনাহত।

শুধু ঐ বিশেষজ্ঞ কমিটিই নয়, ঐ একই বিষয়ে গবেষণা করে হারমান কাহ্‌ন তাঁর 'On Thermonuclear War' গ্রন্থে সিদ্ধান্তে এসেছেন—তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যদি হয় এবং তাতে যুযুধান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলি যদি সুপরিকল্পিতভাবে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার করে তবু সৌরমণ্ডলের তৃতীয় গ্রহের এই 'মানুষ' নামধেয় দ্বিপদী জীবটির সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটবে না। নিঃসন্দেহে তাৎক্ষণিক

বিচারে সে দুর্ঘটনা হবে পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বেদনাদায়ক—তবু সহস্রাব্দী এমন কি শতাব্দীর মানদণ্ডে সে ঘটনার স্থায়ী চিহ্ন একদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন আঘাত সইবার ক্ষমতা পৃথিবীর আছে। একাধিকবার হিম-যুগ বা 'আইস-এজ' সে পার হয়ে এসেছে, ক্রাকাটোয়ার বিস্ফোরণ সহ্য করেছে—মহাকালের খতিয়ানে তা আজ ছায়ার চেয়েও ছায়া—'চিহ্নও নাহি তার'।

আপনি এখানে দুটি সঙ্গত প্রশ্ন তুলতে পারেন। বলতে পারেন—'বাপু হে, তোমার হিসাব মত দেখছি, মার্কিন মুলুকে তুমি কল্পনায় মোট ১,৭৪৫ মেগাটন বোমা ঝেড়েছ এবং তার ক্ষয়ক্ষতির খতিয়ান বাৎলেছ—কিন্তু তাতে তো ব্যাপারটার গুরুত্ব ঠিক মত মালুম হল না। পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশগুলির পুঞ্জীভূত শক্তির তুলনায় ঐ ১,৭৪৫ মেগাটন বোমা কতখানি? দ্বিতীয় কথা—আমেরিকার চেয়ে ঘন বসতিওয়ালা দেশ—ভারতবর্ষ বা চীনে প্রতিক্রিয়াটা কি-জাতের হবে তাও তো বোঝা গেল না?'

আমি সবিনয়ে অক্ষমতা স্বীকার করব। প্রথম কথা, মার্কিন কংগ্রেসের ঐ রিপোর্টখানা আমি হাতে পাইনি। সেটা গোপন তথ্য। তার সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতিমাত্র দেখেছি। দ্বিতীয় কথা, বহু সন্ধান করেও হারমান কাহ্‌ন-এর গ্রন্থটি জোগাড় করতে পারিনি। ঐ সব গ্রন্থ ক্রয় বাবদ কোন বৈদেশিক মুদ্রা কলকাতার কোন গ্রন্থাগার বোধকরি খরচ করতে পারেনি—অন্তত আমার অনুসন্ধানে তাই বুঝেছি। ঐ গ্রন্থের আংশিক উদ্ধৃতিমাত্র অন্যত্র পেয়েছি। তবে হ্যাঁ, আপনার যদি অঙ্ক কষতে আপত্তি না থাকে তাহলে আমরা একটা মোটামুটি থাওকা ধারণা করতে পারি। আসুন, অঙ্কটা কষেই ফেলা যাক:

ধরা যাক, আদ্রিয়ান বেবীর ঐ উক্তটাই আমাদের হাইপথেসিস্—অর্থাৎ পৃথিবীর পারমাণবিক অস্ত্রের মোট পরিমাণ মাথাপিছু দশ টন টি.এন.টি। আগেই দেখেছি, অঙ্কের হিসাবে সেটা ৩.৬×১০^{১০} টন টি.এন.টি।

আমেরিকায় কল্পিত বোমাবর্ষণের মোট শক্তি $=$ ১,৭৪৫ মেগাটন টি. এন. টি
$= ১\cdot৭ \times ১০^{৯}$ টন টি. এন. টি.

সুতরাং শতকরা অনুপাত $= (১\cdot৭ \times ১০^{৯} \times ১০০) \div ৩\cdot৬ \times ১০^{১০}$
$= ৫\%$ ... . (i)

আমরা জানি, পৃথিবীর সম্পূর্ণ ভূ-ভাগ $= ৫\cdot৭ \times ১০^{৭}$ বর্গমাইল
এবং জানি, আমেরিকার ক্ষেত্রফল $= ৩\cdot৬ \times ১০^{৬}$ ঐ
ফলে, আমেরিকার ভূ-ভাগ গোটা পৃথিবীর তুলনায় শতাংশের হিসাবে
$= (৩\cdot৬ \times ১০^{৬} \times ১০০) \div ৫\cdot৭ \times ১০^{৭} = ৬\%$ ... ... (ii)

সুতরাং আপনার প্রথম প্রশ্নটির জবাবে বলতে ইচ্ছা করছে যে, মার্কিন বিশেষজ্ঞ যে কল্পিত বোমাবর্ষণ করেছিলেন তা হয়তো পৃথিবীর সঞ্চিত বোমার কথা চিন্তা করেই। নাহলে শতাংশের সংখ্যা দুটি এত কাছাকাছি হত না। এটা হয়তো কাকতালীয় নয়, আপনি-আমি না জানলেও ঐ মার্কিন ধুরন্ধর আন্দাজ করতে পারেন পৃথিবীর সর্বমোট পারমাণবিক মারণাস্ত্রের পরিমাণটা কত।

এবার আপনার উত্থাপিত দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব :

আমেরিকার জনসংখ্যা গোটা পৃথিবীর জনসংখ্যার তুলনাতেও প্রায় ৫%। সুতরাং জনসংখ্যার অনুপাতেও বোমাবর্ষণের পরিমাণটা সামঞ্জস্য রেখে ধরা হয়েছে। ভারতবর্ষ বা চীনে বসতি ঘন হওয়ায় হতাহতের সংখ্যা নিশ্চয় বেশি হত।

উপসংহার : মোট কথা আশাবাদীদের মূল বক্তব্যটা—'এ-ভাবে মানব সভ্যতা ধ্বংস হতে পারে না', এ কথাটা মেনে নেওয়ায় বাধা দেখি না। আমার তো মনে হয়েছে, মনুষ্যসৃষ্ট পারমাণবিক অস্ত্রের সাহায্যে সম্পূর্ণ আত্মহনন—অর্থাৎ এই পৃথিবী থেকে মানবজাতীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার কাজটা প্রায় অসম্ভব। সৌরমণ্ডলের এই তৃতীয় গ্রহ থেকে চিন্তাশীল জীবনের অস্তিত্ব চিরতরে মুছে ফেলতে হলে নিম্নলিখিত চারটি সর্ত পূরণ করতে হবে :

(১) পৃথিবীর প্রতিটি নরনারীকে হত্যা করতে হবে। ঘটনা-চক্রে কোন অতি দূর দ্বীপের গুহা-কন্দরে যদি মাত্র জনা-পঞ্চাশ প্রজনন-ক্ষমতাসম্পন্ন নরনারী বেঁচে যায়, তাহলে আন্দাজ পাঁচ লক্ষ বছরের ভিতরেই পৃথিবীর জনসংখ্যা এবং মানবসভ্যতার উন্নতি বর্তমান অবস্থায় এসে পৌছাবে।

(২) শুধু মানুষ নয়, এই পৃথিবীর যাবতীয় বনমানুষ, বানর, বেবুন, সিম্পাঞ্জী, গরিলাদেরও শেষ করতে হবে; কারণ তা না হলে তাদের যে-কোন একটি শাখা হয়তো কয়েক নিযুত বছরে একই বিবর্তনের মাধ্যমে এক শক্তিশালী সভ্যতার জন্ম দেবে।

(৩) শুধু বানরজাতীয় নয়, পৃথিবীর যাবতীয় স্তন্যপায়ী জীবকেও ধ্বংস করতে হবে, না হলে আন্দাজ তের-চৌদ্দ কোটি বছরের ভিতর হয়তো এই মানুষের অবস্থায় এসে উপনীত হবে ঐ স্তন্যপায়ী জীবের কোন একটি শাখা।

(৪) তাই বা কেন? বলতে পারা যায়, এই পৃথিবীর সমস্ত জলচর প্রাণীকেও ধ্বংস করা প্রয়োজন। সামুদ্রিক প্রাণী থেকে মানবজাতির বর্তমান অবস্থায় উপনীত হতে পঞ্চাশ ষাট কোটি বছর লাগে—এটা কি পরীক্ষিত সত্য নয়?

আপনি হয়তো থমকে দাঁড়াবেন। পঞ্চাশ-ষাট কোটি বছর! সে যে অনেকটা সময়! পৃথিবী ততদিন টিকে থাকবে তো? মহাপ্রলয় আসবে না ইতিমধ্যে? সূর্য নিভে যাবে না? চঞ্চল হয়ে হয়তো সূর্যকেই প্রশ্ন করে বসবেন, "তুমি নাকি একদিন রবে না ত্রিদিবে? মহাপ্রলয়ের কালে যাবে নাকি নিবে?"

আসছি, সেই প্রসঙ্গেই আসছি এবার।

তিন—আশা-নিরাশার সমন্বয় :

আশাবাদী ভবিষ্য-বিজ্ঞানী আদ্রিয়ান বেরী তাঁর 'দ্য নেক্সট টেন থাউসেণ্ড ইয়ারস্' নামক সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থে বলেছেন—তিনটি দুর্দৈবকে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলে মানব-সভ্যতা সহস্র সহস্র বৎসর কাল ধরে ক্রমোন্নতির পথে বিকশিত হবে। তাঁর সেই সর্তত্রয় হল :

(১) সূর্যের তাপ বিকীরণ ছন্দে কোন পরিবর্তন হবে না।

(২) বহিঃপৃথিবীর কোন অজ্ঞাত বুদ্ধিমান জীবের আক্রমণে পৃথিবী ধ্বংস হবে না।

(৩) মানব-প্রকৃতিতে কোন মৌল পরিবর্তন হবে না—অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতি মানুষের দেহে-মনে একই জাতের প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেবে (human reaction to stimuli will remain constant)

ঐ তিনটি সর্তকে এবার বিস্তারিতভাবে বিচার করে দেখি :

প্রথম সর্ত—সূর্যের তাপ বিকীরণ ছন্দ : খ্রীষ্টানদের যেমন বাইবেল, হিন্দুর যেমন বেদ তেমনি এই শাস্ত্রের জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী-দের হাতে আছে একটি গবেষণা-সূত্র—'হার্ৎস্প্রাং-রাসেল চার্ট'। দিনেমার পণ্ডিত হার্ৎস্প্রাং এবং মার্কিন জ্যোতির্বিদ হেনরী নরিস্ রাসেল যৌথভাবে এই চার্টটি প্রণয়ন করেছিলেন। ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ডঃ মেঘনাদ সাহারও অবদান আছে এতে। তালিকাটি কয়েক লক্ষ নক্ষত্রের জীবনেতিহাসের সংক্ষিপ্তসার, যার অন্যতম আমাদের 'সূর্য' নামক নক্ষত্র। সৌরমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী কয়েক লক্ষ তারকার যাবতীয় সংবাদ তাঁরা নথীবদ্ধ করে গেছেন—তাদের রঙ, ঔজ্জ্বল্য, আকার, রাসায়নিক গঠন, উত্তাপ প্রভৃতি।

শুধু দূরবীণের মাধ্যমে দেখা বর্ণ ও ঔজ্জ্বল্য থেকেই অঙ্ক কষে অন্যান্য তথ্য লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এই চার্টটিকে আমাদের মোটামুটি বুঝে নিতে হবে কারণ তা থেকেই আমরা পূর্ব-পরিচ্ছেদে উত্থাপিত প্রশ্নটার জবাব পাব—অর্থাৎ সূর্য কতদিন আমাদের বেঁচে থাকার সুযোগ দেবে।

কোন একটি তারকার জীবনেতিহাস সংক্ষেপে এই রকম: নীহারিকায় ভাসমান বস্তুকণা তার ঘূর্ণন-ছন্দে মহাকর্ষের আইন অনুসারে ক্রমশঃ কেন্দ্রের দিকে ঘনীভূত হতে থাকে। প্রাথমিক অবস্থায় তার উত্তাপ বা ঔজ্জ্বল্য থাকে খুব কম। কিন্তু ক্রমশঃ তারকার কেন্দ্রস্থলটি জমাট বাঁধতে থাকে। তখন তার উত্তাপও বাড়ে। ঔজ্জ্বল্যও! শেষে কোন এক সময় তার উত্তাপ এত বেড়ে যায় যে কেন্দ্রস্থলে পারমাণবিক বিক্রিয়া (নিউক্লিয়ার রি-এ্যাকসন) শুরু হয়ে যায়—যার অর্থ, কেন্দ্রস্থলের হাইড্রোজেন পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ হতে শুরু করে এবং হাইড্রোজেন থেকে পরমাণু-তালিকার পরবর্তী পরমাণু হিলিয়ামের জন্ম দিতে শুরু করে। প্রতিটি হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ার সময় কিছুটা 'ভর' হারায় এবং কিছু শক্তি (আলোক, উত্তাপ বিভিন্ন জাতের রশ্মি) বিকীরণ করে। এছাড়া তার আর কোনও পরিবর্তন হয় না। যতদিন ঐ তারকার হাইড্রোজেন-ভাণ্ডার নিঃশেষিত না হচ্ছে ততদিন তারকাটি 'সুস্থিত অবস্থায়' (main sequence-এ) আছে বলে ধরা হয়।

একটা সমান্তরাল-তুলনা বা 'এ্যানালজি' দিলে হয়তো ব্যাপারটা বুঝতে সুবিধা হবে। মনে করুন গনগনে আগুনে এক ডেকচি জল চাপালেন। ডেকচিতে থার্মোমিটার ডুবিয়ে দেখতে পারেন গনগনে আঁচে জলের তাপমাত্রা হুহু করে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে জল যখন তার স্ফুটনাঙ্কে পৌঁছাল, অর্থাৎ 'তাপমাত্রা একশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড হল, তখন ডেকচির জল ফুটতে শুরু করল। তা করুক,

কিন্তু তাপযন্ত্রের পারদটা আর উঠছে না। অর্থাৎ তাপমাত্রা বাড়ছে না। যতক্ষণ ডেক্‌চির সবটা জল বাষ্পে পরিণত না হচ্ছে ততক্ষণ যতই আঁচ দেওয়া যাক, তাপমাত্রা আটকে থাকবে ঐ একশ ডিগ্রিতেই। সমস্ত জলটা বাষ্পে রূপান্তরিত হবার পর আবার তাপাঙ্ক বাড়ানো যাবে। আমাদের 'এ্যানালজি' অনুসারে ডেক্‌চির জলটা নক্ষত্র হলে বলা যেত—ফুটতে শুরু করা থেকে জলটা ছিল সুস্থিত অবস্থায়, যতক্ষণ না সবটা জল বাষ্পে পরিণত হল।

তারকার ক্ষেত্রেও হাইড্রোজেন ভাণ্ডার যখন নিঃশেষ হবে তখন তারকাটা আর সুস্থিত অবস্থায় থাকবে না। সেটা আকারে প্রকাণ্ডভাবে বেড়ে যাবে—পরিণত হবে 'লাল-দানবে'।

একটা উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করি। উদাহরণটি আমাদের অতি নিকটবর্তী 'তারকা'—সূর্য। কোন সুদূর অতীতে আমাদের ঘূর্ণ্যমান গ্যালাক্‌টিক-সিস্টেমের বস্তুকণা সংগ্রহ করে সূর্য প্রথম দানা বাঁধতে শুরু করে তার হিসাব নেই ; কিন্তু মহাকর্ষের আইনে ক্রমশঃ তার কেন্দ্রস্থল জমাট বাঁধতে থাকে এবং উত্তপ্ত হতে থাকে। তারপর যথানিয়মে উত্তাপ এত বেড়ে গেল যে, নিউক্লিয়ার-রি-এ্যাকসন শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ কেন্দ্রস্থ হাইড্রোজেন পরমাণু হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতে শুরু করল। সেটা আজ থেকে প্রায় পাঁচশত কোটি বছর আগে। এই দীর্ঘ সময়কাল ধরে ঐ একইভাবে সূর্যের কেন্দ্রস্থ হাইড্রোজেন পরমাণু ক্রমাগত হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে—ফলে সূর্য প্রায় একই ছন্দে শক্তি বিকীরণ করে যাচ্ছে এবং তার ভর (ওজন) কমছে। শক্তি বিকীরণও যেমন প্রচণ্ড, ক্ষয়ের পরিমাণও তেমনি অসামান্য। প্রতি সেকেণ্ডে সূর্য চল্লিশ লক্ষ টন পরিমাণ ক্ষয়িত হচ্ছে। কিন্তু তার দেহাবয়ব এতই বড় যে, আগামী ছয় শত কোটি বছরেও তার হাইড্রোজেন-ভাণ্ডার নিঃশেষিত হবে না। ফলে সংক্ষেপে বলতে পারি—অতীতের ৫০০ কোটি এবং ভবিষ্যতের ৬০০ কোটি, একুনে ১১০০ কোটি বছর সূর্যের সুস্থিত

অবস্থায় আকার আয়ুষ্কাল।

ছয় শত কোটি বছর পরে সূর্যের হাইড্রোজেন ভাণ্ডার যখন নিঃশেষ হয়ে যাবে, তখন সে ফেটে পড়বে—'লাল দানবে' পরিণত হবে। তার ঔজ্জ্বল্য ও আকার যাবে বেড়ে—সূর্যের প্রসারিত বাহু বুধ, শুক্র ছাড়িয়ে পৃথিবী পর্যন্ত এসে যাবে। বলা বাহুল্য তখন পৃথিবীতে জীবন অবশিষ্ট থাকবে না। হয় অতি বুদ্ধিমান মানুষ তার আগেই মানে মানে অন্যত্র কেটে পড়বে। না হলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে!

মহাকাশকে জানবার জন্য আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের একমাত্র প্রথমটিই শুধু কার্যকরী। আর কার্যকরী আমাদের বুদ্ধি। বাকি চারটি ইন্দ্রিয়ের কেরামতি পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দৃষ্টি দিয়ে—কর্মচক্ষেই হক অথবা দূরবীনের ক্যামেরা দিয়েই হক—আমরা কতটুকু জানতে পারি? আমরা তারকার দুটি মাত্র গুণ উপলব্ধি করি—তাদের ঔজ্জ্বল্য এবং বর্ণ। বাদবাকি তথ্য সংগৃহীত হয়েছে বুদ্ধির মাধ্যমে। কী করে? বলছি। কিন্তু তার আগে কী দেখছি তাই আগে বলি।

দেখছি ঔজ্জ্বল্য ও রঙ। প্রথম কথা ঔজ্জ্বল্য। আমরা জানি আলোর উৎস যত দূরে থাকে ততই সেটা অনুজ্জ্বল লাগে। নৈশ আকাশের ঐ যে নক্ষত্র মণ্ডলী ওদের ঔজ্জ্বল্য তাহলে নির্ভর করছে—তারা কত কাছে আছে বা কত দূরে আছে তার উপর। আপাত-দৃষ্টিতে যেটিকে যত উজ্জ্বল মনে হচ্ছে আসলে তাদের ঔজ্জ্বল্য সেই অনুপাতে নয়। তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানে চোখে-দেখা আপাত ঔজ্জ্বল্যকে (apparent magnitude) তালিকাভুক্ত করার সময় সেটাকে কমিয়ে বাড়িয়ে নেওয়া হল তাদের দূরত্ব অনুসারে। অর্থাৎ ধরে নেওয়া হল প্রতিটি নভোচারী যদি একই দূরত্বে থাকত তাহলে তাদের যে ঔজ্জ্বল্য হত সেটাই তাদের মৌল ঔজ্জ্বল্য (absolute magni-

tude)। সেই নির্দিষ্ট দূরত্বটা হচ্ছে ৩২·৬ আলোকবর্ষ*। প্রতিটি নভোচারীর মৌল ঔজ্জ্বল্য হচ্ছে সেটা ৩২·৬ আলোকবর্ষ দূরে থাকলে যতটা উজ্জ্বল দেখাত। ঐ দূরত্বে থাকলে অতি নিকটবর্তী সূর্য হয়ে যেত প্রায় সপ্তর্ষি-মণ্ডলের বশিষ্ঠ কণ্ঠলগ্না অরুন্ধতীর মত ম্লানপ্রভ। সূর্যের সেই 'মৌল ঔজ্জ্বল্য'কে 'এক' ধরে বিভিন্ন নক্ষত্রের মৌল ঔজ্জ্বল্যকে তালিকাভুক্ত করা হল। তাকে বলা যায় 'সূর্য আনুপাতিক মৌল ঔজ্জ্বল্য।'

দ্বিতীয় কথা: বর্ণ বা রঙ। এখানে আমাদের চোখ ভারি ভুল করে। কারণটা মনস্তাত্ত্বিক। তাতো বটেই! নিজের মেয়ের যে 'রঙ'কে বলি 'উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা', পরের মেয়ের সেই গাত্রবর্ণকেই বলি 'রক্ষেকালির বাচ্চা!' এখানেও বিজ্ঞানীরা ফটোগ্রাফিক প্লেটে বর্ণালী অনুসারে নক্ষত্রগুলিকে সাজালেন। ক্যামেরার চোখে দেখা নক্ষত্রের কোনটা লাল, কোনটা হলদেটে, কোনটা হলুদ, কোনটা নীল বা সাদা। ওঁরা তাদের সাজালেনও ঐভাবে—নীল (O), নীলাভ-সাদা (B), সাদা (A), হলদেটে সাদা (F), হলুদ (G), কমলা (K), এবং লাল (M)। দুটির মধ্যে পার্থক্যকে আবার দশভাগে ভাগ করলেন—যেমন নীল ও নীলাভ-সাদার মধ্যে দশটি সূক্ষ্মভাগ O_1 O_2 $O_3 \cdots O_9$ O_{10}। বোঝা সহজ যে, O_9 বর্ণের তারা

* আলোকবর্ষ জ্যোতির্বিজ্ঞানে দূরত্বের সূচক। এক বছরে আলোকরশ্মি (তথা বেতার তরঙ্গ) যতটা যায়। দূরত্বটা অত্যন্ত বেশি। তাই সহজবোধ্য ধারণা করতে বলি—সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে মাত্র আট মিনিট; আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারকা থেকে প্রায় চার বছর। কিম্বা প্রতি সেকেণ্ডে আলোকরশ্মি পৃথিবীকে সাতপাকে বাঁধতে পারে! স্বতই পাঠকের মনে হবে, ঐ ৩২·৬ সংখ্যাটি এল কোথা থেকে? জবাবে জানাই—আলোকবর্ষ ছাড়াও জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর একটি দূরত্বের মাপকাঠি আছে। তাকে বলে 'পারসেক'=৩·২৬ আলোকবর্ষ। সুতরাং ঐ সাড়ে-বত্রিশ-ভাজা মার্কা সংখ্যাটি ১০ পারসেক দূরত্বকে সূচীত করছে।

নীলের চেয়ে সাদারই কাছাকাছি। বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে দেখলেন, ঐ যে বর্ণের সূক্ষ্ম তারতম্য ও থেকেই নক্ষত্রগুলির যাবতীয় তথ্য পাওয়া যাচ্ছে—তাদের বয়স, আকার, ভর, উত্তাপ, গঠন এবং সুস্থিত-অবস্থায় থাকার ব্যাপ্তি। তা হোক, কিন্তু ঐ অদ্ভুত অক্ষরগুলো এল কোথা থেকে—ঐ OBAFGKM? অনেক সন্ধান করেও তার হদিস পাইনি। তবে ঐ আপাত অসংলগ্ন অক্ষরগুলি ক্রমান্বয়ে মনে রাখবার জন্য যে-সূত্রটি জ্যোতির্বিজ্ঞান মহাবিদ্যালয়ে ব্যবহৃত হয়, সেটির বিষয়ে একটি কৌতুককর সংবাদ পেয়েছি। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পক্ককেশ অধ্যাপকেরা সে সূত্রটি নাকি শুধু ছাত্রদেরই শেখান, ছাত্রীদের নয়। সাহস পান না! তবে ছাত্রীরাও তা জানতে পারে, ক্রমশঃ সংগ্রহ করে ছাত্রদের কাছ থেকে জনান্তিক অবকাশে। সূত্রটা—Oh! Be A Fine Girl, Kiss Me!

এবার আমরা হার্ৎস্প্রাং-রাসেল সাঙ্কেতিক চিত্রের প্রসঙ্গে (১৮) ফিরে আসতে পারি। চিত্র ৫—এ একটি চার্ট দেওয়া হয়েছে। জমির সমান্তরালে (এ্যাবসিসায়) সাজানো হয়েছে বর্ণালী—ঐ OBAFGKM পদ্ধতিতে এবং খাড়াভাবে (অর্ডিনেট) সাজানো হয়েছে, 'সূর্যের মৌল ঔজ্জ্বল্য' অনুসারে নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্য। লক্ষ্য করে দেখুন, ঐ চার্টে সূর্যের অবস্থান এ্যাবসিসায় Goতে এবং অর্ডিনেটে +৫-এ। আরও লক্ষ্য করে দেখুন, চার্টের উপরে উত্তাপও উল্লেখ করা হয়েছে। নক্ষত্রের বর্ণ ও উত্তাপ আনুপাতিক। ঐ চার্টে পরিচিত নক্ষত্রদের অনেকগুলিকে খুঁজে পাবেন—বাংলা ইংরাজী দু'জাতের নামই উল্লেখ করেছি। যেমন ধরুন, 'ক্যাপেলা' বা 'ব্রহ্মহৃদয়'। চার্টে তার অবস্থান দেখেই বলে দেওয়া যাচ্ছে—তার 'মৌল ঔজ্জ্বল্য' হচ্ছে '-১' তার উত্তাপ প্রায় ৬০০০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং তার গাত্রবর্ণ Go—হলুদ।

চার্টের মাঝ-বরাবর—লক্ষ্য করে দেখুন, যেন আকাশ-গঙ্গার মত একটা কল্পিত নদী নেমে এসেছে। রেখা দুটি কল্পিত—কারণ ঐ

চিত্র—৫

হার্ৎস্প্রাং-রাসেল ডায়াগ্রাম
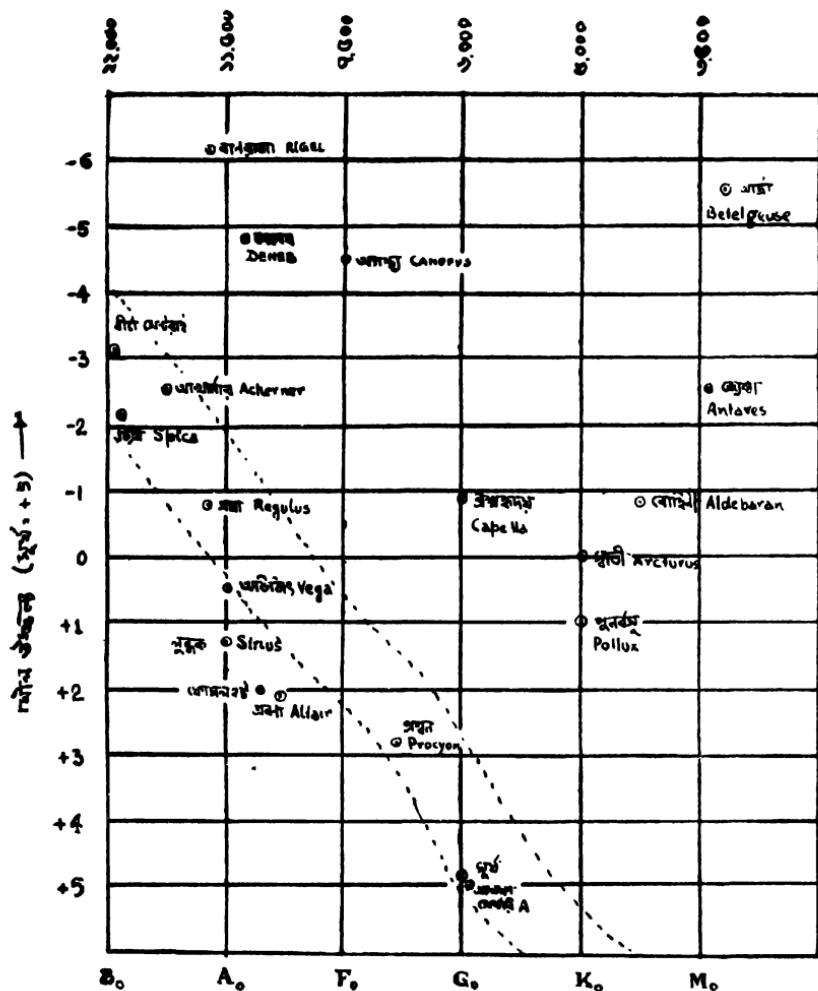
কল্পিত নদীবক্ষে যে নক্ষত্রগুলি পড়েছে সেগুলি আছে সুস্থিত-অবস্থায় বা মেইন সিকোয়েন্সে। অর্থাৎ ঐ অংশে অবস্থিত নক্ষত্র-গুলির অবস্থা আমাদের সূর্যের মত—বর্তমানে তারা রয়েছে সুস্থিত অবস্থায়। তালিকার বাঁয়ে উপরের দিকে যে সব নক্ষত্র রয়েছে যেমন 'বাণরাজা' বা 'দেনেব' তাদের গাত্রবর্ণ নীল/সাদা, তাদের উত্তাপ খুব বেশী, তারা বয়সে নবীন। আবার ডানদিকে উপরে অবস্থিত নক্ষত্র—যেমন আর্দ্রা বা জ্যেষ্ঠা—ওরা আকারে বৃহৎ, উত্তাপে কম, বয়সে প্রবীন এবং বর্ণে রক্তিম, ওরা 'লাল-দানব' শ্রেণীর।

একথা সহজেই অনুমেয় যে, সৌর-মণ্ডলের বাইরে কোন নক্ষত্রের কোন গ্রহে যদি জীবন আদৌ বিকশিত হয়, তাহলে সেই তারকা 'লাল দানব' বা 'সাদা বামন' শ্রেণীর হতে পারে না। দীর্ঘদিন একই সঙ্গে তাপ তথা শক্তি বিকীরণ না করলে সেই নক্ষত্রের কোনও গ্রহে বা উপগ্রহে জীবন বিবর্তিত হতে পারে না। ভাষান্তরে—বহির্বিশ্বে জীবনের সন্ধানে আমাদের খোঁজ করতে হবে ঐ 'মেন সিকোয়েন্স' অন্তর্ভুক্ত নক্ষত্রগুলিতে—তার বাইরে নয়।

সে সন্ধান না হয় পরে করা যাবে, আপাততঃ এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, আমাদের সূর্য নামক তারকার সুস্থিত-অবস্থায় থাকার কালটা হচ্ছে ১১০০ কোটি বছর। তার ৫০০ কোটি বছর অতিক্রান্ত, বাকি আছে ৬০০ কোটি বছর। সূর্য শিশুও নয়, বৃদ্ধও নয়, মাঝ বয়সী ভদ্রলোক। বাল্যের ডিপ্‌থিরিয়া, হাম, পান-বসন্ত প্রভৃতির আশঙ্কা আর নেই, কৈশোরের হাত পা ভাঙার কালও গেছে। যৌবনে বেমক্কা একটা বেজাতের মেয়ে বে-করে অথবা লোটা-কম্বল নিয়ে বাউণ্ডুলে হয়ে যাবার আতঙ্কও অতিক্রান্ত। ওদিকে বুড়ো বয়সে টপ্‌ করে পটল তোলার সময়ও হয়নি। সূর্য এখন নিতান্ত ছাঁ পোষা হরিপদ কেরানী—বাঁধা স্কেলে রিটায়ারমেন্টের দিকে এগিয়ে চলেছেন। পেনসন পাবেন ছয় শত কোটি বছর পরে। কে তখন তাঁকে 'ফেয়ার-ওয়েল' দেবে?

সূর্যের শক্তি-বিকীরণ ছন্দে সামান্য হ্রাসবৃদ্ধি হয় বটে তবে তাতে আমাদের এমন কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। পৃথিবীর ইতিহাসে আমরা জানি, একাধিক হিম-যুগ বা আইস-এজ এসেছিল—কেন এসেছিল জানি না। সূর্যের শক্তি-বিকীরণ ছন্দে হের ফের হওয়াতে এমনটা ঘটেছিল কিনা বলতে পারি না; কিন্তু দেখা গেছে তাতে কোনবারই পৃথিবী থেকে জীবনের চিহ্ন একেবারে মুছে যায়নি। এ থেকে আন্দাজ করতে পারি—আরও পাঁচ ছয় শত কোটি বছরেও অমন দুর্দৈব আসবে না—সূর্যদেব একই পরিমাণে, একই ছন্দে আলো, উত্তাপ, শক্তি-বিকীরণ করে আমাদের সঞ্জীবিত রাখবেন।

ছয় শত কোটি বছর! কালের ব্যাপ্তিটা ধারণাতেই আসে না। একটা কথা বললে হয়তো কিছুটা মালুম হবে। মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাসটাকে যদি বিশ লক্ষ বছর বলে ধরে নিই, তাহলে সেই আদিম প্রায়-বানর হোমোস্যাপিয়ান্স-এর প্রথম উৎপত্তি থেকে আজকের এই বিংশ শতাব্দীর ব্যাপ্তি হচ্ছে সূর্যের বাকি জীবনকালের তিন হাজার ভাগের মাত্র একভাগ।

তার মানে কি এক নম্বর সূত্র সম্বন্ধে আশঙ্কা করার কিছু নেই?

আদালতে দাঁড়িয়ে হলপ করে যদি বলতে না হয় তবে বলব—না নেই। হলপ করেই বা কেন বলতে পারি না? তার দুটি হেতু। প্রথমতঃ দশ বিশ লাখে এমন একটা নক্ষত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে যে নক্ষত্র অজ্ঞাত কারণে ঐ সুস্থিত-অবস্থাতে থাকতে থাকতেই অহৈতুকি উল্লাসে ফেটে পড়ে। সূর্যের বেলা যে তেমনটি হবে না, একথা হলপ করে কি করে বলি? তবে না হবার সম্ভাবনা শতকরা শতভাগ, ঐ পনের বিশ লাখে একটি ব্যতিক্রম ছাড়া। দ্বিতীয়তঃ কোন কোন বৈজ্ঞানিক (১৯) এমন ইঙ্গিতও করেছেন যে, হয়তো সূর্যের কেন্দ্রস্থিত কিছু বিষমধাতুর জন্য আন্দাজ একশ কোটি বছর পরে সূর্যের শক্তি-বিকীরণ ছন্দে কিছুটা তারতম্য ঘটবে। যার ফলে পৃথিবীর উপরিভাগের তাপমাত্রা যাবে দ্বিগুণ বেড়ে। এখন যে

গড় তাপমাত্রা আছে ৫৮ ডিগ্রি ফারেনহীট, তা হয়ে যাবে ১২০ ডিগ্রি। তখন উত্তর মেরুর বরফ যাবে গলে, বহু ভূভাগ যাবে সমুদ্রগর্ভে ডুবে। তবু গড় তাপমাত্রা যদি হয় ১২০ ডিগ্রি ফারেনহীট তাহলে এমন এলাকা নিশ্চয় থাকবে, যেখানে মানুষ আশ্রয় নিতে পারবে, নয় কি? কিন্তু এখনই তা নিয়ে কেন মাথা ঘামাই? সে দুর্ভাগ্য যদি আদৌ আসে, তবে তা তো আসবে একশ কোটি বছর পরে।

দ্বিতীয় সর্ত—অপার্থিব জীবের আক্রমণ: এ বিষয়ে বিজ্ঞান-সম্মত আলোচনা করবার মত যথেষ্ট তথ্য আমাদের হাতে নেই। আকাশের উড়ন্ত চাকি অথবা ফন দানিকেন প্রদত্ত থিয়োরির সাহায্যে বলা চলে না যে, বহিঃপৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান জীব পৃথিবীর সঙ্গে ইতিমধ্যেই যোগাযোগ করেছে। তাদের অস্থিত্বটাই এখনও অসিদ্ধ, প্রমাণাভাবাৎ। এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞান যেটুকু জানে তাতে বলতে পারি—আমাদের সৌর মণ্ডলে—বুধ থেকে প্লুটো বা তাদের কোনও উপগ্রহে অমন বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব অসম্ভব। সৌরমণ্ডলে জীব হয়তো আছে—মঙ্গলে, শুক্রের আবহাওয়ায় অথবা অন্যত্র; কিন্তু তা থাকলে আছে জীবাণুরূপে—মাইক্রোকস্‌ম্‌ রূপে। অথচ বিজ্ঞান বিশ্বাস করে সৌরমণ্ডলের বাহিরে—আমাদের এই গ্যালাক্টিক সিস্টেমেই হয়তো একাধিক নক্ষত্রের গ্রহে-উপগ্রহে জীব আছে, উন্নত ধরনের জীব—বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে—হয়তো বুদ্ধিমানরূপেও। বিজ্ঞান কেন এ জাতীয় সিদ্ধান্তে এসেছে সে কথা পরে আলোচনা করব। আপাতত বলি যে, নক্ষত্রান্তরের তেমন কোন বুদ্ধিমান জীব নিশ্চয় এ পর্যন্ত পৃথিবীতে আসেনি। দশ-বিশ আলোকবর্ষ পাড়ি দিয়ে তাদের কেউ যদি আসত, তবে ধরে নিতে হবে মনুষ্য বিজ্ঞান আজ যে উন্নতি করেছে তার চেয়ে পাঁচ সাত হাজার বছরের বেশি বিবর্তন তারা করেছে। অত উন্নত, অত বুদ্ধিমান জীব যদি আদৌ প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীতে পদার্পণ করত

তাহলে তারা নিশ্চয়ই এই সিদ্ধান্তে আসত যে, এই পৃথিবীর জীবও এককালে বুদ্ধিমান জীবে (মানুষে) রূপান্তরিত হবে এবং বহির্বিশ্বের অন্যান্য জীবের সন্ধান করবে। সে-ক্ষেত্রে তারা নিশ্চয় তাদের আগমনের কোন স্থায়ী সন্দেহাতীত প্রমাণ রেখে যেত। যে-সব প্রমাণ ঐ মতাবলম্বীরা এ পর্যন্ত দাখিল করেছেন, তা এতই সহজ-সরল ও জড়বুদ্ধির পরিচায়ক যে, নক্ষত্রান্তর পাড়ি দেওয়ার মত বুদ্ধিমানের কীর্তি বলে ধরে নিতে পারছি না। প্রাগৈতিহাসিক গুহায় মানুষের আঁকা স্পেস্-স্যুট-পরা ছবি, গিল্‌ঘামেসের রচনা অথবা পিরামিড তৈরী করার কৃতিত্ব গ্রহান্তরের জীবের ঘাড়ে চাপিয়ে সে তথ্য প্রমাণ করা যায় না। একথা অনস্বীকার্য যে, দানিকেন-এর উপস্থাপিত সবগুলি প্রশ্নের জবাব আমাদের জানা নেই—এটা কেমন করে হল, সেটা কেমন করে হল ইত্যাদি। সে তো পি. সি. সরকারের ম্যাজিক দেখে এসেও বলতে পারি না। অনেক আপাত-অলৌকিক ব্যাপারেরই ব্যাখ্যা দিতে পারি না। তাই বলে কেমন করে মেনে নিই—লক্ষ কোটি মাইল পাড়ি দিয়ে এসে গ্রহান্তরের জীব কতকগুলো উড়ন্ত চাকিতে আমাদের ভয় দেখিয়েই অহেতুক উল্লাসে তৃপ্ত!

স্থতরাং পৃথিবীর গত পাঁচশ কোটি বছর বয়সের ভিতর তেমন কোন গ্রহান্তরের জীব আসেনি বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু আগামী যুগেও যে আসবে না, তা নিশ্চয় করে বলতে পারি না। কিন্তু তারা যদি আদৌ আসে কেন আমাদের ধ্বংস করতে চাইবে? নিজেরা বসবাস করতে? তারা কি সংখ্যায় এতই বেশী আসবে যে, আমাদের শেষ না করে উপনিবেশ স্থাপন করতে পারবে না? এ বিষয়ে আলোচনা এখানেই শেষ করা ভাল—কারণ এরপর আমি হয়তো বৈজ্ঞানিক আলোচনা ছেড়ে নিজেই গল্প ফাঁদতে শুরু করব। মোট কথা, এই দ্বিতীয় সূত্রটি মেনে নিলেই মানবসভ্যতার বিকাশের পথে কোন বাধা থাকবে না।

তৃতীয় সর্ত—মানব প্রকৃতিতে মৌল পরিবর্তন: তৃতায় সূত্রে

আমরা বলতে চেয়েছি—মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করছে ভবিষ্য-বিশ্বমানবের ইচ্ছার উপর। মানব-প্রকৃতি যে কী, স্বীকার করব, আজও তার ঠিকমত হদিস পাইনি। তবু মোটামুটি-ভাবে বলা যায়—বিশ্বমানবের চরিত্র সাধারণভাবে এক জাতের। আমরা সবাই আনন্দে হাসি, দুঃখে কাঁদি, সন্তানের মঙ্গলকামনায় বিশ্বজননী দেশকাল ভেদে সর্বত্রই ব্যাকুল, জীবনসঙ্গীর সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য বিশ্বকামিনী উন্মুখ, জীবনসঙ্গিনীর নিরাপত্তার জন্য বিশ্বমানব উদগ্রীব। প্রতিবেশীর দুঃখে আমরা বেদনাহত, যদিচ কখনও কখনও উদাসীন ; প্রতিবেশীর সাফল্যে আমরা আহ্লাদিত, যদিও স্বীকার করব, কখনও কখনও মাৎসর্য বিষের দহনেও ভুগে থাকি। সারা দুনিয়ায় মানুষের মৌল চিন্তায় ফারাক নেই। তবু এ কথাও মানতে হবে যে, কখনও কখনও বিশেষ বিশেষ মানব-চরিত্রের বিচিত্র বিকাশ আমাদের বোধের সীমা অতিক্রম করে! ঐ লোকটা কেন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে খুন করে নিজে আত্মহত্যা করল তার কোন হদিস পাই না। চেঙ্গিস খাঁ, এ্যাটিলা, মিহিরগুল বা নাদির শাহ কেন লুট করে তার অর্থ বুঝি—কিন্তু কেন যে ধ্বংসের লীলায় অহৈতুকী উল্লাসে মাতে তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাই না! ধারণা করতে পারি না—আইক্‌ম্যানের মত মানুষ কীভাবে নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ ইহুদিকে নৃশংসভাবে হত্যা করেও মনের ভারসাম্য হারায় না।

তবু ব্যতিক্রম ব্যতিক্রমই। তাই রোমান সম্রাট নীরোর মত ব্যতিক্রমকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি! আজকের এবং আগামী যুগের সচেতন শিক্ষিত সমাজ-ব্যবস্থায় নীরোর আবির্ভাব অকল্পনীয়। কিন্তু ঠিক কি তাই? ইতিহাস কি সেই শিক্ষাই দিয়েছে? বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ও চতুর্থ দশকে জার্মান জাতি ছিল উন্নতির চরম শিখরে। যথেষ্ট সমাজ সচেতন শিক্ষিত জাত। কই, তবু তো তারা হিটলারের মানসিকতাকে প্রতিহত করতে পারেনি। আইন-স্টাইন, নীলস্ বোহ্‌র, অটো হান, হেইসেনবার্গ, উইজেকারের মত

প্রতিভাকে সেদিন প্রত্যাখ্যান করেছিল অতি সুশিক্ষিত জার্মান রাষ্ট্র। সংখ্যাগরিষ্ঠের শুভেচ্ছা পদদলিত হয়েছিল বিকৃত-মানস এক রাষ্ট্রপ্রধানের চাপে। দ্বিতীয় উদাহরণও এ শতাব্দীর, বস্তুত এ দশকের! অতিমাত্রায় সমাজ-সচেতন মার্কিন জাতি ইচ্ছার বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন ভিয়েৎনামে গিয়ে হত্যার তাণ্ডবে মেতেছে এবং দলে দলে প্রাণ দিয়েছে। যে কোন দিন ব্যালট ভোট নিলে দেখা যেত শতকরা আশি নব্বইজন এ যুদ্ধ চায় না—তবু তারা মুখ বুঁজে এ অন্যায় অত্যাচার মেনে নিয়েছিল। ত্রিশের দশকে, চল্লিশের দশকে শুনেছিলাম যোসেফ স্তালিন রাশিয়ার অবিসংবাদিত জনপ্রিয় নেতা। তাঁর মৃত্যুর পরে শুনলাম সে ধারণাটা নাকি আদ্যন্ত ভ্রান্ত! যিনি বললেন, তিনি গদীচ্যুত হতে শুনলাম তিনিও নাকি রাশিয়ার শত্রু! বল মা তারা দাঁড়াই কোথা!

তাই এ আশঙ্কাটাকে উড়িয়ে দিতে পারছি না একেবারে। আগামী কোন শতাব্দীতে একইভাবে বিশ্বমানবের শুভ ইচ্ছার বিরুদ্ধে যদি কোন নতুন নীরো, নতুন হিটলার পৈশাচিক উল্লাসে সৃষ্টিকে ধ্বংস করতে চায় তখন সে যুগের মানুষ তাকে ঠেকাতে পারবে তো? মার্কিন জ্যোতির্বিদ কার্ল সাগান ও তাঁর রাশিয়ান সহকর্মী বলছেন (২০)—প্রযুক্তিবিদ্যা যে হারে উন্নত হচ্ছে ত'তে দু'এক শতাব্দী পরে মানুষের হাতে এমন অস্ত্র আসতে পারে যার সাহায্যে কৃত্রিম উপায়ে শুধু সূর্য নয়, সমস্ত সৃষ্টি ধ্বংস করে ফেলা যাবে!! পরমাণু বোমায় যেমন একটিমাত্র পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করে 'চেন রি-এ্যাকসন' সুরু করে দেওয়া যায়, ঠিক সেইভাবে একটি শক্তিশালী 'লেসার'-এর মাধ্যমে ক্রমান্বয়ে সূর্য এবং তার নিকটবর্তী পর পর সব কয়টি নক্ষত্রকে ধ্বংস করে দেওয়া অসম্ভব হবে না। এই গ্যালাক্টিক সিস্টেমের নক্ষত্র নিচয় পর পর কৃত্রিম 'নোভায়' রূপান্তরিত হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। ওঁরা এমন কি হিসাব করে বলেছেন—অমন শক্তিশালী একটি 'লেসার'-এর ক্ষমতার পরিমাণ হওয়া চাই দশ

ট্রিলিয়ান কিলোওয়াট। এমন একটি মারণাস্ত্র তৈরী করা হয়তো খাতা কলমে সম্ভব; কিন্তু তার জন্য কী পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হবে ভেবে দেখুন। তাছাড়া অমন একটি শক্তিশালী মারণাস্ত্র শুধু আত্মহননের জন্য ব্যবহৃত হবে এটাও বিশ্বাসযোগ্য নয়।

এই প্রসঙ্গে আরও মনে পড়ছে জেমস্ ওয়াট্সনের সাবধানবাণী। ডক্টর ওয়াটসন হচ্ছেন 'জেনেটিক কোড' বা 'সুপ্রজননবিদ্যা'-সূত্রের জনক। যিনি প্রমাণ করেছেন, মানব প্রকৃতির স্বরূপ নিয়ন্ত্রিত হয় পূর্বপুরুষদের রক্তের মাধ্যমে প্রাপ্ত 'জীন'-এর প্রভাবে। তিনি বলছেন, কৃত্রিম উপায়ে 'জীন'-এর জাত নিয়ন্ত্রিত করে ভবিষ্যতে মানব প্রকৃতিকে ইচ্ছা মতো পরিবর্তিত করা যাবে। অতীতে স্পার্টা-নগরীর নগরপ্রধানেরা যেমন সে রাজ্যের যুবকদের যুদ্ধবাজ করে গড়ে তুলতে তাদের জীবনযাপন প্রণালীটাই ছকে ফেলে ছিলেন, ভবিষ্যতে তেমনি কোন রাষ্ট্রপ্রধান হয়তো কৃত্রিম উপায়ে 'জীন'-নিয়ন্ত্রণ করে মানব প্রকৃতিকেই এমনভাবে বদলাতে সক্ষম হবে যাতে সে-রাজ্যের যুবকদলের দয়া-মায়া-শুভবুদ্ধির বালাই থাকবে না। তারা হবে যন্ত্রের মত মানুষ, হিংস্র পশুর মত নির্মম। আজকের দিনে আমরা যেমন 'ক্রশ-ব্রিডিং' করে ভাল জাতের গরু, কুকুর, মুরগি পয়দা করি—ওরা তেমনি কৃত্রিম-উপায়ে যুদ্ধবাজ মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে। ডক্টর ওয়াটসনের এই আশঙ্কার সম্বন্ধে অবশ্য নোবেল-লরিয়েট জীববিজ্ঞানী স্যর পীটর মীডাওয়র বলছেন "The manufacture of super-men by cross-breeding is unacceptable today, and the idea that it might be one day become acceptable is unacceptable also." (২১) [ক্রশ-ব্রিডিং-এর মাধ্যমে অতিমানব প্রজননের প্রচেষ্টা আজকের বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়, এবং ভবিষ্যতেও যে অমন একটা ব্যবস্থাপনা গ্রহণযোগ্য হবে এমন ধারণাও গ্রহণযোগ্য নয়]। আড্রিয়ান বেরী এ বিষয়ে বলছেন, "ভরসার কথা যে, মানব-প্রকৃতিকে এইভাবে

ক্রশ-ব্রিডিং পদ্ধতিতে পরিবর্তন করতে হলে, জীবনবিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, অন্তত বিশ-পুরুষ ধরে এই পরীক্ষা-কার্য চালাতে হবে। বংশ-তালিকায় বিশ-পুরুষ মানে অন্তত ছয় শতাব্দী। ফলে, এমন একটা পরীক্ষা চালিয়ে কোন যুদ্ধবাজের পক্ষে হাতেনাতে ফল পাওয়ার সম্ভাবনা আদৌ নেই।"

প্রসঙ্গান্তরে যাবার পূর্বে আর একাট দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্নটা বিচার করতে ইচ্ছে জাগছে—কারণ, একথা পশ্চিম-খণ্ডের পূর্বসূরী-পণ্ডিতেরা বিশেষ বলেননি। তাঁরা দেখছি, ধরে নিয়েছেন—ভবিষ্যৎ-মানুষ যদি এ জাতের আত্মহননে উদ্যত, হয় তবে তার মূলে থাকবে ক্ষমতাশালী কয়েকজন রাষ্ট্রপ্রধানের মনোবিকলন। এক বা একদল ক্ষমতালোভী মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি। কিন্তু সে ঘটনাটা তো বিবর্তনের নিছক একটা পর্যায় হিসাবেও আসতে পারে? তখন দোষ দেব কাকে? একটা 'এ্যানালজি' নিয়ে ব্যাপারটা বুঝবার চেষ্টা করা যাক:

আমরা দেখেছি, দেওয়ালীর সময় লাখে লাখে শ্যামাপোকা জাতীয় কীটপতঙ্গ আগুনে ঝাঁপিয়ে পুড়ে মরে। কবিরা যাই বলুন, সাধারণ মানুষের কাছে এটা একটা বিরাট অসঙ্গতি। পতঙ্গ বহু কোটি বছর বিবর্তন পাড়ি দিয়ে এসেছে অথচ এমন সহজ সত্যটা সে আজও বুঝল না? পাখী-শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে গঙ্গাফড়িং ঘাসের রঙ ধরল, প্রজাপতি ধরল ফুলের ঢং অথচ কোটি কোটি বৎসরেও গায়ে উত্তাপ লাগা সত্ত্বেও পতঙ্গ বুঝল না আগুন ওর শত্রু, —ঝাঁপিয়ে পড়লে পুড়ে মরতে হবে? আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হয় না কি যে, পতঙ্গের এই অগ্নিপ্রেম বিবর্তনবাদের বিপক্ষে যাচ্ছে? আসলে যাচ্ছে না। ভুলটা কোথায় হচ্ছে জানেন? আমরা মনে করছি—বিবর্তনবাদ প্রতিটি প্রাণীকে বুঝি ব্যক্তিগতভাবে আত্মরক্ষা করতে প্রেরণা জোগায়। তা জোগায় না। বিবর্তনবাদ প্রতিটি প্রাণীকে জাতিগতভাবে, স্পেসিস্-গতভাবে টিকে থাকতে উদ্বুদ্ধ

করে—এমন কি দরকার হলে ব্যক্তিগতভাবে আত্মহননও করে। দেওয়ালীর পূর্বেই ঐ পতঙ্গরা প্রজনন পর্যায় সমাপ্ত করে—তাই অনাগতদের স্থান ছেড়ে দিতে তারা সদলবলে জহরব্রত উৎযাপন করে। নাহলে, শ্যামাপোকার ভীড়ে, স্থানাভাবে, খাদ্যাভাবে ওরা জাতিগতভাবে বিপদগ্রস্ত হত।

মানুষও একটি জীব। বিবর্তনবাদের বাইরে সে নয়। জাতিগতভাবে টিকে থাকার জন্য যে বিবর্তনবাদ তাকে গাছে থেকে মাটিতে নামিয়েছিল, দু পায়ে হাঁটতে শিখিয়েছিল, কথা বলতে শিখিয়েছিল, সুদূর ভবিষ্যতে একই প্রয়োজনে সেই প্রকৃতিই হয়তো তাকে শেখাবে যদুকুলের মুষলটি তৈরী করতে, যদি না শুভবুদ্ধির প্রেরণায় সে তার পূর্বেই সংযত হয়। তাতে অবশ্য আশঙ্কার কিছু নেই— কারণ সে মহামারণ যজ্ঞে মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হতে পারে না—কারণ হোমো-স্যাপিয়েন্স-স্যাপিয়েন্স (মানুষ) নামক জীবটিকে জাতিগতভাবে বাঁচানোর জন্যেই তো সেই হলেও-হতে-পারে মহামৃত্যু উৎসব।

উপসংহার : সুতরাং তিনটি সম্ভাবনা-সূত্র বিচার করে আমরা এই সিদ্ধান্তেই আসতে পারি যে, অদূর ভবিষ্যতে—পাঁচ-সাত-দশ হাজার বছরে মানুষ নামধেয় জীবের সম্পূর্ণ বিনাশ ঘটবে না। বরং নূতন নূতন দিগন্তে তার বিকাশ ঘটবে। নূতন দিগন্ত বলতে? ক্লাব অব রোমের বিশেষজ্ঞরা সে প্রসঙ্গ আদৌ উত্থাপন করেন নি। ওঁদের ধারণায় মানবসভ্যতা পৃথিবী নামক গ্রহ-প্রাচীরের চার দেওয়ালের ।ভতরেই আবহমানকাল আবদ্ধ থাকবে। বিকল্প সম্ভাবনার কথা ওঁরা আদৌ ভেবে দেখেন নি। আমার তো মনে হয়েছে সেটা অনিবার্য। ষাটের দশকেই মানব-সভ্যতা শুনতে পেয়েছে নূতন আহ্বান—'বন্দরে ঐ দাঁড়িয়ে জাহাজ, বেরিয়ে পড় বন্ধুদল!'

ধাপে ধাপে আমরা পৃথিবীর বাইরে যাব। কবে কোথায় যাব

তা ঠিক মত বলতে পারি না, তবে কয়েকটি ধাপ ইতিমধ্যেই অতিক্রান্ত। পরবর্তী ধাপের আলোচনা পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে করব। আপাতত বরং শোনাই লর্ড শ্যাকল্‌টনের একটি উদ্ধৃতি। লর্ড শ্যাকল্‌টন হচ্ছেন রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি। তিনি বহু দুরূহ অভিযানের নেতৃত্ব করেছেন এবং একজন বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত। তাঁর দ্বিতীয় পরিচয়—তিনি দক্ষিণ-মেরু অভিযান-খ্যাত স্যার আর্নেস্ট শ্যাকল্‌টনের সুযোগ্য পুত্র। ১৯৫৮ সালের শেষ এ্যাপোলো মিশন নিরাপদে পৃথিবীর বুকে যখন ফিরে এল তখন সাংবাদিকেরা লর্ড শ্যাকল্‌টনের কাছে ঐ উপলক্ষে একটি বাণী চেয়েছিলেন। রয়্যাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির সভাপতি তখন প্রসঙ্গক্রমে বলেছিলেন, (২২) "অভিযানের ইতিহাস আমাদের এই শিক্ষাই দেয় যে, মানুষ যখন কোন নূতন রাজ্য আবিষ্কার করে তখন সে সেখানে বারে বারে ফিরে আসে—যতদিন না সে নূতন রাজ্যে একটা স্থায়ী আস্তানা গাড়া যায়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কয়েক দশকের ভিতরে চাঁদের ক্ষেত্রেও সেই একই ব্যাপার ঘটবে। মানুষ আবার যাবে চাঁদে—আবার আবার যাবে, তার সবচেয়ে বড় কারণ চাঁদটা ওখানে রয়েছে! তার আকর্ষণ অমোঘ, বিশেষ করে বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজনে। ১৯৫৩ সালে এভারেস্ট জয় করে মানুষ ক্ষান্ত হয় নি, বারে বারে সেখানে ছুটে গেছে।"

সুতরাং পৃথিবী ছেড়ে এবার চাঁদের দিকে রওনা হওয়া যাক।

॥ দ্বিতীয় পর্ব ॥

॥ ১৯৯৪ খ্রীস্টাব্দ ॥

অর্থাৎ ১৪০০ সাল। বিশ্বকবি যে-কথা তাঁর সুদূর কল্পনাতেও আনতে পারেননি বাস্তবে হয়তো সেটাও ঘটবে। চন্দ্রলোকের বাতানুকূল করা রুদ্ধদ্বার কক্ষে বাঙলা ভাষা জানা কোন পাঠক হয়তো কবির উদ্দেশ্যে বলবে "তোমার অনুরোধটা রাখতে পারলাম না কবি, বাতায়নে বসেছি, কিন্তু দখিন দুয়ারটা খুলতে পারছি না—বাইরে অক্সিজেনহীন আকাশ। এখানে আজ ফাল্গুন মাসে বসন্ত আসেনি, আসবেও না কোনদিন।"

এ শতাব্দীর ভিতরে চন্দ্রলোকে মানুষের উপনিবেশ গড়ে না উঠলেও সেখানে ছোট ছোট স্থায়ী আস্তানা গড়ার কাজ শেষ হবে। বেশ কিছু লোক হবে সেখানকার বাসিন্দা। ওরা তখন নিরলস সাধনায় গবেষণা করে চলেছে। উত্তমাশা অন্তরীপ পার হয়ে যেমন য়ুরোপ এসে বাসা বেঁধেছিল ভারতবর্ষে, অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে আমেরিকায়—তেমন ভাবে চন্দ্রলোকে কোন স্থায়ী উপনিবেশ গড়া সম্ভব কিনা সেটা ওরা যাচাই করে দেখছে। সে সম্ভাবনাটা যাচাই করে দেখতে হলে চাঁদকে আরও নিবিড় করে জানতে হবে।

এক—চন্দ্রলোক ঃ

পৃথিবীতে ভূপৃষ্ঠের যাবতীয় তথ্যের সংকলনকে যদি 'ভূগোল' বলি, তাহলে চন্দ্রলোক সম্বন্ধে অনুরূপ তথ্যকে 'চন্দ্র-গোল' বলব না কি? পৃথিবী থেকে চাঁদের দূরত্ব মোটামুটি চার লক্ষ কিলোমিটার। চাঁদের ব্যাস প্রায় ৩,৪৫৬ কি. মি। ভর পৃথিবীর প্রায় আশিভাগের একভাগ। তাই পৃথিবীর চেয়ে চাঁদে প্রতিটি বস্তুর ওজন প্রায় ছয় ভাগের একভাগ। পৃথিবীতে যে লোকটা দুই মিটার লাফাতে পারে

চাঁদে সে বারো মিটার উঁচুতে লাফ দিতে পারবে। নিজের অক্ষের চার দিকে অথবা পৃথিবীর চারপাশে এক পাক ঘুরে আসতে চাঁদের সময় লাগে প্রায় ত্রিশ দিন। ফলে সেখানে যে-কোন স্থানে সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান প্রায় একমাস। সোজা কথায় চাঁদে প্রতিটি রাত পনের (পার্থিব) দিন দীর্ঘ এবং তারপর আকাশে সূর্যও থাকে পনের (পার্থিব) দিন বা নাগাড় ৩৫৭ ঘণ্টা। অনেকের ভ্রান্ত ধারণা আছে চাঁদের একপিঠই বুঝি সূর্যালোক লাভ করে, চাঁদের উল্টোপিঠে চিররাত্রি। মোটেই তা নয়। চাঁদের দুদিকেই দিন রাত হয়—তবে তার উল্টো পিঠটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না—এই যা।

চাঁদে প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় অদ্ভুত। যেমন সুন্দর, তেমন ভীষণ! সেখানে আবহাওয়া নেই, ফলে মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, বিদ্যুৎ, ঝড় চাঁদে অপাংক্তেয়। সেখানে কোন দিনই বৃষ্টিপাত হয়নি—তাই নদী, নালা, সমুদ্র, হ্রদ ওখানে নেই। উদ্ভিদ তো সেখানে জন্মাতেই পারেনা। তাছাড়া পৃথিবীতে পাহাড়-পর্বত যেমন মোলায়েম, কোন যুগে বৃষ্টি না হওয়ায় চাঁদে তা নয়। শতশতাব্দীর ধারাস্নানে চন্দ্রলোক ধৌত হয়নি, মসৃণ মোলায়েম হয়নি। বৃষ্টিপাত না হলেও উল্কাপাত হয়েছে —ভয়াবহ উল্কাপাত! তাই চাঁদের গায়ে ক্রমাগত গর্ত বা বলয়— যাকে বলা হয় 'ক্রেটার'। তার এক একটা প্রকাণ্ড বড়। বাতাস যে হেতু নেই তাই শব্দও নেই—অদ্ভুত নিস্তব্ধ সমস্ত চন্দ্রলোক! আলো আছে—অত্যন্ত তীব্র, তীক্ষ্ণ; অপর পক্ষে নিকষ কালো অন্ধকার নেই। 'কে বলে অন্ধকারের রূপ নাই?'—বলবার মত নিরন্ধ্র অন্ধকার চাঁদে সচরাচর হয় না—কারণ আকাশে সূর্য না থাকলেও পৃথিবী আছে। পৃথিবী থেকে প্রতিফলিত আলোয় সব সময় একটা নীলাভ জ্যোৎস্না। আবহাওয়া যেহেতু নেই তাই উষার আলো বা গোধূলির ম্লানিমা নেই, রামধনু নেই, অরোরা বোরিয়েলিস নেই। রোদ যখন ওঠে তখন প্রচণ্ড উত্তাপ—তাপাঙ্ক উঠে যায় ১০০°

সেন্টিগ্রেডে, পৃথিবীতে যে উত্তাপে জল টগবগিয়ে ফোটে। আবার মধ্যরাত্রে তাপমাত্রা নেমে যায়—১৮০° সেন্টিগ্রেডে, পার্থিব বায়ুচাপে যাকে বলি—তরলিত বাতাসের উত্তাপ। গোটা চাঁদের ভূপৃষ্ঠ আকারে আফ্রিকা মহাদেশের মত হবে।

চিত্র—৬

চাঁদের যে পিঠটা আমরা দেখতে পাই

তবে হ্যাঁ, পাহাড় আছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাহাড়। অধিকাংশই মোচাকৃতি, সূচ্যগ্র। সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ আমাদের এভারেস্টকেও

লজ্জা দেবে—উচ্চতায় তা ১০,৭০০ মিটার। সেটা আছে দক্ষিণ মেরুর কাছাকাছি লাইব্‌নিৎস্‌ পর্বতে। চিত্র—৬-এ চন্দ্রলোকের একটি একটি ছবি দেওয়া গেল। ওখানে অমৃত সমুদ্র, মেঘ সমুদ্র, বর্ষণ সমুদ্র ইত্যাদি যেগুলি দেখানো হয়েছে তাতে জল নেই কিন্তু। জমি-সমতল অপেক্ষাকৃত নিচু বলে ঐ জাতের নাম হয়েছে। চিত্রে চারটি বড় বড় ক্রেটারের নাম লেখা হয়েছে—কোপারনিকাস, কেপলার, টাইকো ও কেভিয়াস্‌। চারজন জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নামে তাদের নাম। এগুলি প্রকাণ্ড বড়। উল্কাপাতের হাত থেকে বাঁচতে এবং প্রখর সূর্যালোক থেকে একটু আড়ালে থাকতে হয়তো ঐ জাতীয় ক্রেটারেই প্রথমে বিজ্ঞানাগার ও পরে উপনিবেশ গড়ে উঠবে।

খাদ্য নেই, পানীয় নেই, নিঃশ্বাস নেবার বাতাসটুকু পর্যন্ত নেই—অমন হতভাগা দেশে মানুষ কেরামতি দেখাতে হয়তো পা ছোঁয়াতে যেতে পারে, বাস করতে যাবে কোন দুঃখে? সোনা, রূপা, প্ল্যাটিনাম, ইউরেনিয়াম সেখানে পাওয়া গেছে বলে শুনিনি। বাঘের চামড়া, হাতীর দাঁত বা তিমির তেলেরও আকর্ষণ নেই। তাহলে? ১৯৫৩ সালে এভারেস্টের চূড়ায় পদার্পণের পরেও মানুষ সেখানে গেছে, বারে বারে গেছে, কিন্তু তারা ডেরা-ডাণ্ডা গেড়ে বাস করতে যায়নি। তাহলে কিসের লোভে মানুষ চন্দ্রলোকে উপনিবেশ স্থাপন করতে চাইবে? শ্রেফ কেরামতি দেখাতে?

(১) **চন্দ্রলোকের আকর্ষণ:** চন্দ্রলোকের 'নেই' এর তালিকাটাই এতক্ষণ শুনিয়েছি, এবার 'নেই তাই পাচ্ছ, থাকলে কোথায় পেতে?' —কালিদাসী ধাঁধাটার সমাধান শুনুন। আবহাওয়া না থাকায়, অভিকর্ষ কম হওয়ায়, আহ্নিক গতি স্লথতর হওয়ায় চন্দ্রলোকে আমরা এমন কতকগুলি সুবিধা পাই যা পৃথিবীতে পাওয়ার আশা নেই। এজন্য চন্দ্রলোকে প্রযুক্তিবিদ্যার অনেক শাখায় আমরা প্রভূত উন্নতি করতে পারব ডেরা-ডাণ্ডা গাড়তে পারলে। কী কী সুবিধা হবে এবার তাই দেখি।

(ক) **জ্যোতির্বিজ্ঞান:** চন্দ্রলোকের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে। পৃথিবীতে বসে মহাকাশ চর্চার দিন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পার্থিব শহরগুলির আলোয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন বেতার কেন্দ্রের বাধায় বিশ্বের সব কয়টি বড় বড় মানমন্দিরে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার মাউণ্ট উইলসনে অবস্থিত একটি আটচল্লিশ ইঞ্চি ব্যাস-বিশিষ্ট দূরবীন প্রাক-বিশ্বযুদ্ধ যুগে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে গর্বের বিষয় ছিল। বর্তমানে লস্ এ্যাঞ্জেলেস্ শহরের আলোর রোশনাই তার কাজে এত বাধার সৃষ্টি করছে যে, আকাশের দূরতম প্রান্ত দেখার কাজে ঐ দূরবীনের ব্যবহার প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। এমন কি বিশ্বের সর্ববৃহৎ দূরবীনটি (মাউণ্ট পালোমারে অবস্থিত, দু'শ ইঞ্চি ব্যাসের) সম্বন্ধেও জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন ১৯৫৮ সালের মধ্যেই সেটা অকেজো হয়ে যাবে—লস্ এ্যাঞ্জেলেস্ এবং সান ডিয়াগো নগরীদ্বয়ের আলোর রোশনাইয়ে (১)। বহু মানমন্দির থেকে ইতিমধ্যেই দূরবীন অপসারণ করা শুরু হয়েছে—জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আরও গভীর নির্জন পর্বত-চূড়ার সন্ধান করছেন—কিন্তু দ্রুতপ্রসারী মানব-সভ্যতা গুটি গুটি সে-সব এলাকাতেও এগিয়ে আসছে। তাই অধিকাংশ জ্যোতির্বিজ্ঞানীর মতে—এই বিজ্ঞানচর্চা যদি অব্যাহত রাখতে হয়—আর তা হবেই, কারণ ঐ পথেই মানব-সভ্যতার ভবিষ্যৎ—তাহলে মহাকাশচর্চার ক্ষেত্র পৃথিবী থেকে সরিয়ে বাইরে নিয়ে যেতে হবে। বাইরে কোথায়? হয় কোন কৃত্রিম উপগ্রহে অথবা চাঁদে।

কৃত্রিম উপগ্রহে কিন্তু আর এক জাতের অসুবিধা হবার আশঙ্কা। আর আশঙ্কাই বা বলি কেন? এত দিনে (১৯৫৮) তা পরীক্ষিত সত্য। কৃত্রিম উপগ্রহে ইতিমধ্যেই একাধিক দূরবীন বসানো হয়েছে এবং ঐ জাতের উপদ্রব ভোগ করতে হয়েছে। কৃত্রিম উপগ্রহেও আবহাওয়ার বালাই নেই, আশ-পাশের আলোকোজ্জ্বল নগরীর রোশনাই নেই—কিন্তু অপর দুটি গুরুতর অসুবিধা আছে।

প্রথম কথা, কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর কাছাকাছি থাকায় স্বয়ং পৃথিবী তার আকাশের অনেকখানি আড়াল করে রাখে। দ্বিতীয় কথা গোটা পৃথিবীর প্রতিফলিত আলোয় ব্যাঘাত অনুভূত হয়। তাছাড়াও অসুবিধা আছে—কৃত্রিম উপগ্রহের দূরবীন দু-ভাবে কার্যকরী করা যায়—হয় তারা হবে স্বয়ংক্রিয় অথবা পৃথিবী থেকে দূর-নিয়ন্ত্রণে তাদের চালাতে হয়। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি একটু সরে নড়ে গেলে সব মাটি; আবার পৃথিবী থেকে নিয়ন্ত্রণ করেও আশানুরূপ সুফল পাওয়া গেল না। ভবিষ্যতে অবশ্য একাধিক মনুষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবে—সেখানে কিন্তু দেখা দেবে আর এক জাতের অসুবিধা। মনুষ্যবাহী কৃত্রিম উপগ্রহে কিছুটা অভিকর্ষ চাই, তাতে একটা ঘূর্ণন-ছন্দ আরোপ করা দরকার। উপগ্রহটা যদি লাট্টুর মত নিজের অক্ষের চারদিকে পাক মারতে মারতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে তবেই তাতে মানুষ বাস করতে পারবে। কিন্তু অমন পাক খাওয়া উপগ্রহ থেকে মহাকাশ-চর্চা হবে কেমন করে? মহাকাশস্থিত নভোচারীরা তো অত্যন্ত দ্রুত সরে যাবে দূরবীনের চোখ থেকে! তাছাড়া পৃথিবীর অনতিদূরে থাকার জন্য পার্থিব রেডিও বা টেলিভিশান বার্তাও বাধার সৃষ্টি করবে।

চাঁদে এসব উপদ্রব একেবারে নেই! তাই অনুমান করি, জ্যোতির্বিজ্ঞান-চর্চার অনুরোধে মানুষ বাধ্য হবে চন্দ্রলোকে একটা জ্যোতির্বিজ্ঞান-মন্দির বানাতে—তাতে থাকবে কিছু লোক। আগামী শতাব্দীতে সেখানে উপনিবেশ গড়ে উঠুক বা না উঠুক, আমার বিশ্বাস, এ শতাব্দীর শেষাশেষি ঐ চন্দ্রলোকের মানমন্দিরটি তৈরী হবে যাবে এবং দেখা যাবে মোটামুটি স্থায়ীভাবে কিছু বিজ্ঞানী সেখানে আছেন। কারণ চাঁদে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার কী অপরিসীম সুবিধা এবার সেটা দেখুন:

মানমন্দিরটি যদি চাঁদের উল্টোপিঠে বসানো হয়—উল্টোপিঠ

মানে যে পিঠটা পৃথিবী থেকে দেখা যায় না—তাহলে চাঁদ নিজেই সমস্ত পার্থিব বেতার উপদ্রব থেকে মানমন্দিরকে রক্ষা করবে। কারণ পৃথিবী আর ঐ মানমন্দিরের মাঝখানে সব সময় থাকবে ৩৪৫৬ কি. মি. ব্যাসের একটা বিরাট ঢাল—চাঁদ স্বয়ং। দ্বিতীয় কথা, পৃথিবীতে দূরবীন-ক্যামেরা আট দশ ঘণ্টার বেশি 'এক্সপোজার' দিতে পারে না। কারণ ঐ সময়ের ব্যবধানেই রাত পোহায়। চাঁদে একটানা দীর্ঘ সাড়ে-তিন শত ঘণ্টা ব্যাপী রাত্রি পাওয়া যাবে। পূর্ণিমার কাছাকাছি ঐ মানমন্দিরের আকাশে পৃথিবীও থাকবে না। পৃথিবীতে যেদিন চন্দ্রগ্রহণ সে দিন তো চাঁদের উল্টো পিঠের ঐ মানমন্দিরে ঘন অমাবস্যার অন্ধকার। সে সময় ক্যামেরায় খুব ভাল ছবি পাওয়া যাবে। তৃতীয়তঃ আবহাওয়ার বাধা বলে কিছু থাকবে না। বিজ্ঞানী বেরী বলছেন, "From such a world without clouds or atmospheric turbulance we shall see stars and galaxies hundreds of thousands times fainter than the faintest now seen from the earth." [মেঘ ও আবহায়ার বাধা না থাকায় অমন একটি জগতে আমরা পৃথিবী থেকে যে সব ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্র-নীহারিকা দেখতে পাই তার চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ ক্ষীণ-জ্যোতি নভোচারীদের দেখতে পাব।]

এ তো গেল এক দিকের কথা। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে চন্দ্রলোকে জ্যোতির্বিজ্ঞান-মন্দির নির্মাণের সুবিধা। সেখানে প্রতিটি বস্তুর ওজন মাত্র ছয় ভাগের একভাগ হওয়ায় এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার ভয় না থাকায় আমরা আরও বড় জাতের দূরবীন সেখানে বানাতে ও বসাতে পারব। ধুলো বালির উপদ্রব নেই, মরচে পড়ার আশঙ্কা নেই। ওঁরা হিসাব কষে বললেন—এইসব সুবিধার জন্য পৃথিবীতে যেখানে আমরা আজও ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের চেয়ে বড় দূরবীন বসাতে পারিনি সেখানে আজকের দিনের প্রযুক্তি-বিদ্যার সাহায্যেই চাঁদে এখনই ২০০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীন বানানো সম্ভব। সুতরাং

চন্দ্রলোকে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা শুরু হবার পর ঐ শাস্ত্র অত্যন্ত দ্রুতগতিতে প্রসারলাভ করবে। অনায়াসে বলা যায় যে, গ্যালিলিওর প্রথম দূরবীন আবিষ্কার থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কয়েক শতাব্দী ধরে মহাকাশের রহস্য সন্ধানে যতদূর অগ্রসর হয়েছি—চন্দ্রলোকে মানমন্দির স্থাপনের পরের মাত্র পাঁচ বছরে তার চেয়ে বেশী তথ্য আমরা জানতে পারব।

(খ) মহাকাশ চারণ: চাঁদের দ্বিতীয় আকর্ষণ হল—মহাকাশ চারণের সুবিধা। পৃথিবীর অভিকর্ষ এড়িয়ে কোন রকেটকে মহাকাশে যেতে হলে তার প্রাথমিক গতিবেগ হওয়া দরকার সেকেণ্ডে সাত মাইল। চাঁদের অভিকর্ষ যেহেতু পৃথিবীর অভিকর্ষের মাত্র ছয় ভাগের এক ভাগ, তাই চাঁদ থেকে কোন রকেট ছাড়তে হলে তার প্রাথমিক গতিবেগ সেকেণ্ডে মাত্র দেড় মাইল হলেই চলবে। এ ছাড়াও পৃথিবীতে বায়ুমণ্ডলের বাধা থাকায় এবং চাঁদে সেটা না থাকায় চাঁদে একটি রকেট উৎক্ষেপনের জন্য শক্তির প্রয়োজন হবে শতকরা ৯৭ ভাগ কম। তার মানে, সোজা কথায় পৃথিবী থেকে ধরা যাক মহাকাশে একটি রকেট ছাড়তে যদি খরচ পড়ে একশত টাকা তাহলে তুলনায় ঐ রকেটটি চাঁদ থেকে উৎক্ষিপ্ত হলে খরচ পড়বে মাত্র তিন টাকা। সুতরাং আগামী শতাব্দী থেকে মহাকাশচারণের জন্য উৎক্ষিপ্ত রকেট চন্দ্রলোক থেকেই রওনা হবে এবং সে জন্য প্রাথমিক কাজ আমাদের আলোচ্য বৎসর, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই শুরু হবে বলে আশা করা যায়।

(গ) চাঁদে কলকারখানা: আপনারা হয়তো বলবেন—এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার জন্য চাঁদে একটা 'মাউণ্ট-পালোমার-মানমন্দির' বানাতে চান—বেশ মেনে নিলাম। মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপন সুবিধাজনক, তাই চাঁদে একটা 'কেপ-কেনেডি' বানাতে চান—বেশ তাও না হয় মেনে নিলাম। তাই বলে ফোর্ড-ক্রুপস্-টাটা-বিড়লা-ডালমিয়া কোম্পানীকে চাঁদের জমি

ইজারা দেওয়াটাও কি মেনে নেওয়া চলে ? জবাবে বলব, আমি তো বলিনি—এখনই তা করতে চাইছি। সুবিধা অসুবিধার কথাটা বিবেচনা করে দেখতে দোষ কি ?

নানান অসুবিধা আছে, মানছি—অক্সিজেন নেই, জল নেই, উত্তাপ অসহনীয়, কাছে-পিঠে গ্রাম নেই যেখান থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করা যাবে। তবু অনেকগুলো সুবিধাও তো আছে। যেমন ধরুন—'ভ্যাকুয়াম ইণ্ডাস্ট্রি'। সাধারণ ইলেকট্রিক বাল্ব, টিউবলাইট, থার্মোফ্লাস্ক থেকে শুরু করে জটিল টেলিভিশান-সেট, কম্পুটার পর্যন্ত অনেক কিছুতেই যন্ত্রটা বায়ুশূন্য করার প্রয়োজন হয়—এসবগুলিই আংশিকভাবে ভ্যাকুয়াম ইণ্ডাস্ট্রির আওতায় পড়ে। এখন প্রতি ঘন-ফুট ভ্যাকুয়াম (বায়ুশূন্য-অবস্থা) তৈরী করতে গোটা পঁচিশ টাকা খরচ পড়ে—তাও নিখুঁত ভ্যাকুয়াম পৃথিবীতে হয় না, শতকরা আশিভাগ বায়ুশূন্যতাতেই প্রযুক্তিবিদকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। চন্দ্রলোকে ভ্যাকুয়াম করার যন্ত্রপাতির প্রয়োজনই হবে না। বাইরের আকাশই বিনা খরচায় নিখুঁত ভ্যাকুয়াম। ফলে সূক্ষ্মতর যন্ত্রপাতির প্রয়োজনে চন্দ্রলোকে ঐ জাতের কল-কারখানা ভবিষ্যতে হয়তো গড়ে উঠবে। সেখানে তৈরী হবে—উন্নত ধরণের অতশী-কাচ, আয়না, বলবিয়ারিং, বৃহত্তর ত্রুটিহীন স্ফটিক (ক্রিস্টাল) (২)। সেখানে বিদ্যুতশক্তি পাওয়া যাবে সূর্যালোক থেকে—প্রায় নিখরচায়। কল-কারখানার পরিত্যক্ত জিনিসে বাতাস দূষিত হবার ভয় নেই। চান্দ্র-খনি থেকে মাল তোলাও অনেক সহজ হবে—মাধ্যাকর্ষণ কম হওয়াতে।

সুতরাং ১৯৯৪ সাল নাগাদ চাঁদে কোন কলকারখানা গড়ে না উঠলেও আমার আন্দাজ, তার পরিকল্পনার কাজ অনেকটা এগিয়ে রাখা হবে।

(ঘ) **জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান :** চন্দ্রলোকে বিজ্ঞানের এই দুটি শাখারও প্রভূত সম্ভাবনা। বিভিন্ন রোগের প্রতিষেধক 'টিকা,' এ্যান্টিবাওটিক ঔষধ, সিরাম ও ভাইরাস চন্দ্রলোকের

ল্যাবরেটারীতে যত উন্নতমানের তৈরী করা সম্ভব পৃথিবীতে তা সম্ভব নয় (৩)। তাছাড়া কয়েক জাতের রুগীকে চন্দ্রলোকের হাসপাতালে যত সহজে নিরাময় করা যাবে তত সহজে পৃথিবীতে তা করা যাবেনা। বিশেষ করে পেশী-সঙ্কোচনের রুগী, বাত, আর্থারাইটিস, এমনকি ক্যান্সার (৪)। বিশ্ববিশ্রুত মহাপণ্ডিত জে. বি. এস. হ্যাল্‌ডেন ক্যান্সার রোগে মারা যান। মৃত্যুশয্যা থেকে তিনি প্রখ্যাত লেখক আর্থর ক্লার্ককে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, "আমি এবং আমার মত লক্ষ লক্ষ রোগী আজ ভাবছে—হায়! যদি চাঁদের হাসপাতালে থাকতে পারতাম, যেখানে অভিকর্ষ ছয় ভাগের একভাগ! আর্থার ক্লার্ক তার একটি রচনায় সে কথা উল্লেখ করে সক্ষোভে লিখেছিলেন, So I get pretty mad when I hear ignorant but well-intentioned people say—'Why not spend the space budget on something useful—like cancer research' [তাই আমি ক্ষেপে যাই যখন শুনি কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সৎ-উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই বলে বসেন, 'মহাকাশ চারণের বরাদ্দ কমিয়ে কেন কোন মানবকল্যাণের পরীক্ষায় তা খরচ করা হয় না—যেমন ধর ক্যান্সারের গবেষণায়?] (৫)

২। **চন্দ্রলোকে মনুষ্যবাসের সমস্যা:**—আগেই বলেছি, আমার অনুমান—এ শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই চন্দ্রলোকে একটি ছোট-খাট আস্তানা গড়ে উঠ্‌বে। উপনিবেশ নয়—ক্যাম্প-অফিস জাতীয়। লোক-সংখ্যা ধরুন, জনা পঞ্চাশ হতে বারে। তাঁরা অধিকাংশই জ্যোতির্বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তি-বিদ্যার নানান বিষয়ে ধুরন্ধর। ওঁদের প্রাথমিক কাজ হচ্ছে চন্দ্রলোকে একটি জ্যোতির্বিজ্ঞান-মন্দির গড়ে তোলা এবং একটি 'কেপ-কেনেডি-ধরণের' উৎক্ষেপন-স্টেশন। বিজ্ঞানীরা ওখানে নাগাড়ে থাকতে পারবেন না—কয়েক সপ্তাহ-অন্তর লোক বদল করা হবে হয়তো। এবার আমরা দেখতে চাইছি—তাঁদের জীবন ধারণের জন্য কী-কী সমস্যার সম্মুখীন তাঁরা হবেন এবং

কীভাবে সে সমস্যার সমাধান সম্ভব। ওঁরা সবাই থাকবেন কোন ক্রেটারের নিচে শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষে, কৃত্রিম আবহাওয়ায়। সে-বাড়ির বাইরে যেতে হলে ওঁদের ব্যবহার করতে হবে অনুরূপ শীতাতপ-আবহাওয়া-নিয়ন্ত্রিত গাড়ি। ওঁদের একাধিক সমস্যার মধ্যে মূল সমস্যা—জল, অক্সিজেন এবং শক্তি।

(ক) জল ও অক্সিজেন সমস্যা:—চন্দ্রপৃষ্ঠে জলও নেই, আবহাওয়ায় অক্সিজেনও নেই। ১৯৬৯ সালে এ্যাপোলো—১১ চন্দ্রলোক থেকে যে পাথরের স্যাম্পেল সংগ্রহ করে এনেছিল সেটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাতে জলের চিহ্নমাত্র নেই। পাথরের টুকরোটা যে কোনযুগে জলের সংস্পর্শে এসেছিল তারও কোন চিহ্ন নেই। একজন ভূতত্ত্ববিদ প্রস্তরখণ্ডটা পরীক্ষা করে বলেছিলেন, 'চন্দ্রলোক গোবি মরুভূমির চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণ শুক্‌নো!' সেটাই স্বাভাবিক। কারণ জলের জন্য প্রয়োজন হয় দুটি গ্যাসের—হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন। তার মধ্যে হাইড্রোজেন অত্যন্ত হালকা। চাঁদের অভিকর্ষ এত কম যে, চাঁদের শৈশবে সেখানে যে হাইড্রোজেন ছিল চাঁদ তাকে ধরে রাখতে পারেনি, কোটি কোটি বছর পূর্বেই তা মহাকাশে মিলিয়ে গেছে। ফলে চাঁদে জল একদম নেই। কিন্তু অতি সাম্প্রতিককালে—গত পাঁচ বছর ধরে, বৈজ্ঞানিকদের মনে একটা সংশয় জেগেছে—বোধ করি চাঁদ সত্যই অত শুষ্ক নয়। হয়তো চন্দ্রতলে—মাটির নীচে জল আছে। কিম্বা গভীর ক্রেটারের তলদেশে, যেখানে সূর্যালোক আদৌ পৌঁছায় না। বস্তুত ১৯৭১ সালে প্রেরিত এ্যাপোলো—১৪ থেকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যেন বলতে চেয়েছে যে, সে একটা জলীয় বাষ্পের গীসারকে চিহ্নিত করেছে। সেই ইঙ্গিত পাওয়ায় চাঁদের বুকে আর একটি স্বয়ংক্রিয় Side যন্ত্র (Suprathermal Ion Detector Experiment) রেখে আসা হয় (৬)। ঐ যন্ত্রটির কাজ হচ্ছে আশে পাশে কোনও গ্যাস বা বাষ্প নির্গত হল তার জাত ও পরিমাণ নির্ণয় করা। ঐ স্বয়ংক্রিয়

যন্ত্রে ধৃত তথ্যের ফলাফল বিচার করে বৈজ্ঞানিক ফ্রিম্যান ও হিলস্ সম্প্রতি বলেছেন (ডেইলি টেলিগ্রাফ, ১৬-১০-১৯৭১ তারিখের প্রকাশিত সংবাদ) হয়তো চাঁদে জল আছে—কারণ যন্ত্রটি একটি জলীয় বাষ্পের গীসারকে ধরতে পেয়েছে, যে স্বতঃস্ফূর্ত ফোয়ারাটি দ্বাদশ ঘণ্টাকাল সজীব ও সক্রিয় ছিল। তাই চাঁদ যে 'নির্জলা' এ ধারণাটাই চিড় খেতে বসেছে।

ধরা যাক ঐ অনুমান ভ্রান্ত। অর্থাৎ চাঁদে জল নেই। তাহলেই বা কী? মানুষ চাঁদে জল বানাবে। দেখা যাক, সেটা সম্ভব কি না। জল বানাতে প্রয়োজন দু-ভাগ হাইড্রোজেন আর একভাগ অক্সিজেন। চাঁদের আবহাওয়ায় না থাক, চন্দ্রভূখণ্ডে অক্সিজেন আছে যথেষ্ট—অন্যান্য ধাতুর পরমাণুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায়। চাঁদের যে টুকরোটা এ্যাপোলো—১১ নিয়ে এসেছিল তার প্রায় শতকরা চল্লিশ ভাগ হচ্ছে সিলিকন ডায়ক্সাইড, বিশ ভাগ আয়রন অক্সাইড, এগারো ভাগ ক্যালসিয়াম অক্সাইড। প্রত্যেকটিতেই অক্সিজেন আছে। সুতরাং প্রয়োজন শুধু হাইড্রোজেন-এর। সুবিধা এই যে, সেই প্রয়োজনীয় জিনিসটা খুবই হালকা। তরলিত হাইড্রোজেন জলের তুলনায় প্রায় একশগুণ হাল্কা। ফলে সেটা চাঁদে আমদানী করা খুব কিছু ব্যয়সাধ্য হবে না। বললে বিশ্বাস করবেন না, ইতিমধ্যেই পশ্চিমের কিছু উৎসাহী ব্যবসায়ী 'বেওসা' করবার সদুদ্দেশ্যে তৎপর হয়ে উঠেছেন। 'চাঁদমে যা-কর থোড়া পানি বনাকর চাঁদি খিঁচনা।' তাঁরা NASA-র কাছে চাঁদে 'পানি বনাইবার' জন্য আর্জি করেছেন ইতিমধ্যেই। তাঁদের দুর্ভাগ্য—মার্কিন সরকার তাতে রাজী হননি। বলেছেন, আমেরিকান সরকারের পেটেন্ট বা লীজ চন্দ্রলোকে কার্যকরী হবার মত আইন নেই (৭)। ব্যবসায়ীরা তবু হাল ছাড়েননি—অতঃপর দরবার করলেন 'ইউ-এন-ও'-র কাছে। ইউনাইটেড নেশন্স্ও তাঁদের জানালেন—চাঁদ কারও পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। সেখানে ব্যবসা করতে দেওয়ার ক্ষমতা U.N.O.-রও

নাই। ইউ-এন-ও-র এক্তিয়ার শুধু পৃথিবীতেই। অতঃপর 'পানি বনাইতে' কাকে 'পান খাওয়াইতে হোবে' ব্যবসায়ীরা আজও সে সমস্যায় হালে পানি পাচ্ছেন না।

সে যাই হোক—এ থেকে আন্দাজ করা গেল যে, চাঁদে জল বানানো খুব কিছু কঠিন হবে না হয়তো। প্রক্রিয়াটা সহজবোধ্য। ল্যাবরেটারিতে 'ডিস্টিল্ড ওয়াটার' বানানোর বৃহত্তর সংস্করণ। একটি পাত্রে কিছু চাঁদের টুকরো রেখে তাকে উত্তপ্ত করতে হবে। বুনসেন বার্নারের বদলে সূর্যালোকে। কয়েকটি দর্পণের সাহায্যে সূর্যতেজকে কেন্দ্রীভূত করলেই চাঁদের টুকরো বিগলিত হয়ে অক্সিজেনকে মুক্ত করবে। ব্যস্, তখন একটা নল দিয়ে ঢুকিয়ে দিতে হবে তরলিত হাইড্রোজেন। অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে আসবে বিশুদ্ধ জল। উত্তাপ নিখরচায়, চাঁদের টুকরোও সুলভ—একমাত্র খরচপাতি কারখানা স্থাপনের প্রাথমিক উদ্যোগ, আর হাইড্রোজেন পৃথিবী থেকে বহে নিয়ে যাওয়া।

এখনই যে পদ্ধতি বর্ণনা করলাম তাতে শুধু জল নয়, নিশ্বাস নেবার মত অক্সিজেনও পাওয়া যাবে। বস্তুত হিসাব করে দেখছি, প্রায় আড়াই টন চন্দ্রলোকের লৌহ আকর থেকে এক টন আন্দাজ অক্সিজেন পাওয়া যাবে। এক টন অক্সিজেন কতটা? একজন মানুষের নিশ্বাস নেওয়ার জন্য আড়াই বছরের মেয়াদ।

তাহলে অক্সিজেন তৈরী করতে হচ্ছে দুটি কারণে—নিশ্বাস নিতে এবং জল বানাতে। যে পরিমাণ অক্সিজেন চাঁদে অক্সাইড আকারে আছে তাতে দশ হাজার লোকের একটি উপনিবেশ দশ বিশ হাজার বছরেও শেষ করতে পারবে না (৮)। তার মানে, জল বানাতে আসল সমস্যা হল পৃথিবী থেকে হাইড্রোজেন বয়ে নিয়ে যাওয়া। মার্কিন কোম্পানি যখন একচেটিয়া লীজ এখনও পায়নি তখন আসুন একটু হিসেব কষে দেখি—ব্যবসাটা কি রকম লাভজনক হতে পারে। কে বলতে পারে—হয়তো এক দিন আপনাতে-আমাতে

একটা জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি খুলে চাঁদে ব্যবসা ফেঁদেও তো বসতেও পারি ?

ধরে নেওয়া যাক, চাঁদে প্রথম প্রথম শতখানেক লোক বাস করবে। ধরুন তাদের আমরা প্রথম পর্যায়ে মাথা পিছু দশ গ্যালন জল সরবরাহ করব। কি বললেন ? দশ গ্যালন খুব কম হচ্ছে ? তা বলতে পারেন ; ভারতবর্ষে শহরাঞ্চলে আমরা মাথাপিছু অন্তত ৩০।৪০ গ্যালন জল সরবরাহ করি। কিন্তু তার মধ্যে স্নান করা, কাপড় কাচা, রাস্তা, গাড়ি ধোওয়া আছে, কলকারখানার জল আছে, 'দে গরুর গা ধুইয়ে' আছে এবং কর্পোরেশনের ট্যাপ দিয়ে হু হু করে জল পড়ে যাচ্ছে দেখে নির্বিকারে পথ চলা আছে। কিন্তু চাঁদে যাবে চাঁদের টুকরো বৈজ্ঞানিকের দল—তারা ওভাবে জল অপচয় করবে না। চব্বিশ ঘণ্টায় মানুষের পানীয় জল লাগে আধ গ্যালন—বাকি সাড়ে নয় গ্যালন দেওয়া হবে অন্যান্য খাতে। ঐ দশ গ্যালনই থাক তাহলে।

বর্তমানে চাঁদে যে এ্যাপোলো লুনার মডেল যাচ্ছে তাতে ওজন নেওয়া যায় পনের টন। কিন্তু আমরা হিসাব করছি ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ব্যবস্থার জন্য। ততদিনে নিশ্চয়ই প্রতিবারে ত্রিশ টন মাল নিয়ে নেওয়া যাবে। সুতরাং এক এক বারে যতখানি তরলিত হাইড্রোজেন নিয়ে যাওয়া যাবে তাতে তৈরী হবে ২৭০ টন জল। অর্থাৎ ৬০,০০০ গ্যালন জল। একশ জন মানুষ দৈনিক দশ গ্যালন ব্যবহার করলে ঐ জল মাস দুয়েক দিব্যি চলে যাবে। মনে হয় ব্যবসাটা জমবে ! কী বলেন ?

(খ) বিদ্যুৎ বা শক্তির সমস্যা ঃ এ ব্যবসা আরও লাভজনক, আরও সহজ। জল বা অক্সিজেন সরবরাহের ঠিকা নেওয়ার চেয়ে বিদ্যুত সরবরাহের ঠিকাদারী করা অনেক লাভজনক। একেবারে নিখরচায় বিদ্যুত। পরিকল্পনাটা এই ধাঁচের—চাঁদের বিষুবরেখা বরাবর চারপ্রান্তে, নব্বই ডিগ্রি দ্রাঘিমাংশ তফাতে প্রথমে চারটি

‘সৌরশক্তি সংগ্রহ’-যন্ত্র বসাতে হবে। নামটা গালভারি—আসলে তাতে থাকবে কিছু অধিবৃত্ত আকারের (প্যারাবোলয়েড) আয়না। ঐ দর্পণে প্রতিফলিত সূর্যালোক একটি কেন্দ্রে এসে জমবে। সেই কেন্দ্রীভূত সৌরশক্তি যেখানে পড়বে, সেখানে থাকবে কিছু তরলিত নাইট্রোজেন। দিনের বেলা চন্দ্র-ভূখণ্ডে তাপমাত্রা ওঠে ২৪০° ডিগ্রি ফারেনহীট। কেন্দ্রীভূত সূর্যালোকে আরও বেশী উত্তপ্ত হবে ঐ তরলিত নাইট্রোজেন—ফলে সেটা উত্তপ্ত গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যাবে অন্য কোনও ইন্ধন ছাড়াই। সেই উত্তপ্ত নাইট্রোজেন গ্যাস এবার একটি টারবাইনকে ঘোরাবে। ফলে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে। ঐ উত্তপ্ত নাইট্রোজেন গ্যাসকে অতঃপর কোন ঠাণ্ডা জায়গায় নিয়ে গেলেই তা আবার শীতল হয়ে যাবে। তাকে তরলিত অবস্থায় প্রথম পাত্রে নিয়ে গেলেই কর্মচক্র ক্রমাগত ঘুরতে থাকবে। বস্তুত প্রাথমিক কলকব্জা বসানোর পর প্রায় নিখরচায় বিদ্যুৎ শক্তি পাওয়া যাবে।

প্রশ্ন করতে পারেন—নাইট্রোজেন কেন ? জবাবে বলব, এ্যাপোলো সংগৃহীত চান্দ্র প্রস্তরখণ্ডে দেখেছি, নাইট্রোজেনের ভাগ যথেষ্ট। তার হিমাঙ্ক বা ফ্রিজিং পয়েন্টও অনেক নীচে (—)৩৮০° ফারেনহীট। তাই নাইট্রোজেনই ভাল। দ্বিতীয় কথা, প্রশ্ন হতে পারে—তবে কি রাতের বেলা, কিম্বা মেঘলা দিনে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ থাকবে ? জবাবে বলব—মেঘলা দিন চন্দ্রলোকে কখনও হবে না—আবহাওয়াই সেখানে নেই, মেঘ জমবে কিভাবে ? আর আগেই বলেছি, বিষুবরেখার চারপ্রান্তে চারটি যন্ত্র বসিয়ে আমরা বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি ; ঐ চারটি যন্ত্রের একটা-না-একটা সব সময়ে প্রখর সূর্যালোক পাবে। ঐ বিদ্যুৎ-প্রস্তুত-কারখানার সুবিধাটি একবার বিবেচনা করে দেখুন। চন্দ্রখণ্ড থেকে প্রাথমিক নাইট্রোজেন নিষ্কাশন ছাড়া কারখানা স্থাপনের পর আর কোনও কাঁচা মাল লাগছে না— কয়লা নয়, পেট্রোল নয়, কিছু নয়। দ্বিতীয়তঃ, চিমনির

ধোঁয়া বা সিণ্ডার-এ্যাশ্ জাতীয় সমস্যা নেই। তৃতীয়তঃ, যন্ত্রটি স্বয়ংক্রিয়—মাঝে মাঝে গিয়ে দেখ্ভাল করলেই চলবে। মজতুর সমস্যা নেই। দিনের চব্বিশ ঘণ্টাই—থুড়ি, দিনের ৭০৮ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ-উৎপাদন চলতে থাকবে। অভিকর্ষ কম এবং ঝড়-ঝঞ্ঝার ভয় না থাকায় কারখানার যন্ত্র বানাতে লোহা ইত্যাদি খুব কম লাগবে।

প্রসঙ্গান্তরে যাবার আগে তাই বলি, অধ্যায়ের শুরুতে যে কথা বলেছিলাম তা আকাশ-কুসুম নয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে চন্দ্রলোকে বসে কোনও বাঙলা ভাষাবিদ হয়তো রবীন্দ্রনাথের ঐ কবিতাটি পড়তে পড়তে সত্যই ঐ কথা ভাববে।

দুই—মঙ্গলগ্রহ ঃ

না, বিংশ-শতাব্দীর ভিতরেই যে মানুষ মঙ্গলগ্রহে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করবে, এমন আশা আমি করি না। তবে শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই মানুষ সেখানে পদধূলি দেবে। কথাটা ঠিক হল না। মঙ্গলের আবহাওয়ায় নগ্নপদ হওয়া অসম্ভব। তাছাড়া পার্থিব ধূলিকণা কোমক্রমেই মঙ্গলগ্রহে যেতে দেওয়া হবে না। ঠিক দশ বছর পরে একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র মাস-দুয়েক মঙ্গহগ্রহে বাস করে পৃথিবীতে ফিরে আসবে। তখনই মঙ্গল সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত তথ্য পাব। তখনই দিন স্থির হবে, কবে আমরা মঙ্গলে যাচ্ছি। ১৯৫৮ সালের প্রস্তাবিত 'মার্স-ভায়া-ভেনাস' মিশনের প্রসঙ্গে পরে আসছি, আপাতত আসুন মঙ্গলগ্রহের সঙ্গে আপনাদের আলাপ পরিচয়টা করিয়ে দিই ঃ

আকারে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর চেয়ে অনেক ছোট—পৃথিবীর ব্যাস ১২৬৮২ কি. মি., মঙ্গলের মাত্র ৬৭২০ কি. মি.। ভরও (ওজনও) পৃথিবীর তুলনায় মাত্র দশভাগের একভাগ। কিন্তু শুক্রগ্রহ পৃথিবীর আরও কাছে ; শুক্রের আকার এবং ওজনও প্রায় পৃথিবীর মত। তবু বিজ্ঞান আশা করে—শুক্রে পদার্পণের আগেই আমরা

মঙ্গলে পৌঁছাব। কারণ শুক্রগ্রহে পদার্পণের বাধা মঙ্গলগ্রহের চেয়ে অনেক, অনেক বেশী। পরবর্তী পর্বে আমরা এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

মঙ্গলগ্রহের আহ্নিকগতি পৃথিবীর মতই। অর্থাৎ প্রায় সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টায়। একটু আগে বলেছি, চাঁদে সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের মধ্যে সময়ের ব্যাপ্তি ৭০৮ ঘণ্টা। মঙ্গলে সেটা সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টা। প্রায় সওয়া-বারো ঘণ্টা রাত্রি ও সওয়া-বারো ঘণ্টা আলোকোজ্জ্বল দিন। আলোকোজ্জ্বল বলতে অবশ্য পৃথিবীর মত আলো ঝলমল নয়—যেহেতু মঙ্গলগ্রহ সূর্য থেকে আরও দূরে আছে, তাই মধ্যদিনেও সূর্যালোক অপেক্ষাকৃত ম্লান। পৃথিবীর অক্ষ যেমন ২৩½ ডিগ্রি হেলে আছে, যার ফলে এখানে গ্রীষ্ম-শীত হয়, তেমনি মঙ্গলেরও অক্ষটি হেলে আছে ২৪ ডিগ্রি। তাই পৃথিবীর মত মঙ্গলে উত্তর গোলার্ধে যখন গ্রীষ্ম, দক্ষিণ-গোলার্ধে তখন শীতকাল। আকারে ছোট হলেও এসব দিক থেকে পৃথিবীর সঙ্গে তার বেশ মিল আছে। তবে মঙ্গল যেহেতু সূর্য প্রদক্ষিণ করে ৬৮৭ পার্থিব (বা মোটামুটি বলা যায় মঙ্গলেরও) দিনে তাই এক-এক গোলার্ধে শীত বা গ্রীষ্মের ব্যাপ্তি অনেক বেশী। খালি চোখে মঙ্গলকে দেখতে অনেকটা লালচে লাগে—জ্যেষ্ঠা, আর্দ্রা প্রভৃতি 'লাল-দানব' জাতের নক্ষত্রের মতো লাল। দূরবীন দিয়ে দেখলে মেরুর কাছাকাছি কিছুটা সাদাটে অংশ নজরে পড়ে—যা আকারে বাড়ে কমে। ওটাকে কেউ বলেন জমাট মেরু-বরফ, কেউ বলেন কঠিন অবস্থায় ঘনীভূত কার্বন-ডায়ক্সাইড।

বিংশশতাব্দীর প্রথম দিকে মার্কিন বৈজ্ঞানিক পার্সিভাল লোয়েল (৯) ঘোষণা করেন যে, তিনি মঙ্গলগ্রহের গায়ে কিছু রেখা লক্ষ্য করেছেন, যা জ্যামিতিক সরল-রেখার ভঙ্গিতে উত্তর-মেরু অঞ্চল থেকে বিষুব-অঞ্চলের দিকে এসেছে। তিনি বললেন, ওগুলি আসলে 'খাল'—মঙ্গলগ্রহে অতি বুদ্ধিমান কোন জীব আছে, যারা

মেরু-অঞ্চল থেকে ঐভাবে খাল কেটে উষর বিষুব-অঞ্চলে জল নিয়ে এসেছে। পৃথিবীতে সুয়েজ বা পানামার মত কয়েক মাইল দীর্ঘ খাল খনন করতে মানব-সভ্যতা হিমসিম খেয়েছে ; সে-ক্ষেত্রে মঙ্গলবাসী জীব যদি হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ খাল খনন করে থাকে, তবে তারা যে আমাদের চেয়ে প্রযুক্তিবিদ্যায় বেশী ওস্তাদ তা মেনে নিতেই হয়। কেউ কেউ আপত্তি করে বললেন, খাল কখনও অত চওড়া হয় ? দূরবীনে দেখা ঐ রেখাগুলি যদি খাল হয় তবে তা কয়েক মাইল চওড়া হবেই। অত চওড়া খাল কাটা অসম্ভব। তার চেয়ে বড় কথা—এত চওড়া খাল ওরা কাটবে কেন ? উত্তর-মেরুর ঐ সাদা দাগটা যদি বরফই হয় তবে তাতে জলের পরিমাণ এত কম যে, এত চওড়া খাল কাটা নিরর্থক।

জবাবে লোয়েল বললেন, আহাহা, তোমরা ভুল করছ। যে দাগটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেটা তো শুধু খাল নয়, খালের দু-পাশে জল-পেয়ে-উর্বর শস্যক্ষেত্র। উষর রুক্ষ প্রভৃতির মধ্যে ঐ চওড়া উর্বর সবুজ শস্যক্ষেত্রটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি। তা যদি না হবে তবে ঐ সরল-রেখাগুলির অর্থ কী ? পাহাড় বা মাটির ফাটল তো আর সরল রেখায় হবে না ?

এ শতাব্দীর গোড়ার দিকের কয়েক দশকে তাই মনে করা হত—মঙ্গলগ্রহে অতি বুদ্ধিমান জীব আছে—যাদের সভ্যতা মনুষ্যসভ্যতার চেয়েও বেশি অগ্রসর। এইচ. জি. ওয়েলস্‌-এর বিখ্যাত উপন্যাস 'ওয়র অফ দি ওয়ার্ল্ডস্‌' এই ধারণা নিয়েই লেখা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যখন মঙ্গলগ্রহে রকেট পাঠাতে শুরু করল—তাদের নাম 'মেরিনার', তখন মঙ্গলের কাছ থেকে তোলা বেতার ফটো পাওয়া গেল। তাতে জীবের অস্তিত্ব প্রমাণ হল না বটে, তবে মঙ্গল সম্বন্ধে অনেকটা বিস্তারিত খবর পাওয়া গেল। জানা গেল, মঙ্গলের উপরিভাগ সমতল নয়, উব্‌ড়ো-খাব্‌ড়া—অনেকটা চাঁদের মত। সেখানে আবহাওয়ার ক্ষীণ চিহ্ন আছে—তার চাপ যদিও অতি সামান্য,

পৃথিবীতে যে আবহাওয়ার চাপ পাওয়া যায় ভূপৃষ্ঠ থেকে বিশ মাইল উপরে। মেরিনারের তোলা ফটো পাশাপাশি সাজিয়ে মঙ্গলগ্রহের একটি ম্যাপও খাড়া করা গেল (চিত্র—৭)। ম্যাপটি 'মার্কাটর প্রজেকশান' পদ্ধতিতে আঁকা (১০)। লোয়েল-পন্থীরা তখনও নিরুৎসাহ হন নি। বললেন, ম্যাপে কালো কালো অংশগুলো হচ্ছে শুকিয়ে যাওয়া সমুদ্রগর্ভ এবং সাদা অংশটা মাটি বা জমি। এমন কি ওঁরা বললেন, পৃথিবীতে ওয়েণ্ডেল উইলকির স্বপ্ন 'ওয়ান ওয়ার্ল্ড' সফল না হলেও মঙ্গলগ্রহবাসীরা সে লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছে। তারা এত বুদ্ধিমান যে, নিজেদের ভিতর আর মারামারি করে না, গোটা মঙ্গলগ্রহ একটি রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত। এমনকি ওঁরা সনাক্ত করে বললেন—নিখিল-মঙ্গলের রাজধানী হচ্ছে 'সোলিস ল্যাকাস'-এ। চিত্র—৭-এ সেটাকে সনাক্ত করতে পারেন—দ্রাঘিমা ৯০° এবং অক্ষরেখা মাইনাস ৩০°তে।

কিন্তু ওঁদের সব ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হল, যখন 'মেরিনার—৯' প্রেরিত সংবাদ এসে পৌছালো বর্তমান দশকে—১৯৫৮ সালে। ঐ সালটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ; কারণ '৫৮ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে মঙ্গল আর পৃথিবী খুব কাছাকাছি আসে—এত কাছাকাছি তারা ১৯২৪ সালের পর আর আসেনি। মেরিনার—৯ মঙ্গলের খুব কাছাকাছি গিয়ে (৮৫০ মাইল পর্যন্ত) তার ফটো তোলে। দৈনিক দু' বার করে সে মঙ্গলের কৃত্রিম চাঁদরূপে মঙ্গলগ্রহকে দু'বছর ধরে প্রদক্ষিণ করতে থাকে এবং প্রায় ৭৩০০টি বেতার ছবি পাঠায়! (১১) মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে এবার আমরা আরও বিস্তারিত তথ্য পেলাম। জানলাম, মঙ্গল চাঁদের মত মৃত নয়—সেখানে আগ্নেয়গিরি আছে। চাঁদে জলের চিহ্নমাত্র খুঁজে পাওয়া যায়নি, কিন্তু মঙ্গলে খুব সম্ভব এক যুগে বৃষ্টিপাত হয়েছে। মঙ্গল আকারে ছোট হলে কি হয়, সেখানকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ 'নিক্স অলিম্পিকা' আমাদের এভারেস্টের তিনগুণ উঁচু। সেখানে এত বিশাল খাড়া খাদ আছে যার তুলনায়

আমাদের এ্যারিজোনার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়নের গভীরতা তুচ্ছ—চার ভাগের এক ভাগ! ফটো থেকে প্রমাণিত হল, এতদিন যাকে খাল বলে মনে করা হত, তা প্রাকৃতিক দাগই—সরলরেখা সেগুলি নয়। আমাদের চোখের ভুল। কিন্তু তার চেহারা দেখে মনে হয় সেগুলি পাথরের ফাটল নয়—এক কালের শুকিয়ে যাওয়া নদীই (চিত্র—৮)।

মেরিনার—৯ প্রেরিত তথ্যের সংবাদ এ-দেশী পত্র-পত্রিকায়, সংবাদ পত্রের সাময়িকীতে যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন লক্ষ্য করেছিলাম, অনেকে লিখেছেন—'এতদিনে চূড়ান্তভাবে প্রমাণ হল মঙ্গলে কোন প্রাণী নেই!' কথাটা ভ্রান্ত। বিজ্ঞান তা বলেনি আদৌ। অতি বুদ্ধিমান জীবের অস্তিত্ব অপ্রমাণ হয়েছে বটে কিন্তু মঙ্গলে যে কোন জাতের জীব নেই একথা বিজ্ঞান এখনও মেনে নেয়নি। মঙ্গলের যা প্রাকৃতিক অবস্থা তাতে বিশেষ জাতের জীবাণু (মাইক্রো অর্গানিজম্) সেখানে থাকলেও থাকতে পারে। প্রমাণ হয়েছে, মঙ্গলের আবহাওয়ায় অক্সিজেন নেই—আছে কার্বন-ডায়ক্সাইড, এমন কি সামান্য পরিমাণে (পৃথিবীর আবহাওয়ার তুলনায় হাজার ভাগের এক ভাগ) জলীয় বাষ্প। অক্সিজেন যখন নেই, তখন 'ওজন' গ্যাসও (Ozone) নেই। ফলে সূর্য-বিচ্ছুরিত বেগনীপারের রশ্মিতে (আলট্রা-ভায়োলেট রেডিয়েশনে) মঙ্গলে জীবনের বিকাশ হওয়া কঠিন। সেখানকার গড় উত্তাপ মাইনাস ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট। কিন্তু জীববিজ্ঞানীরা বলছেন—পৃথিবীতেই এমন জীবাণু আছে যারা ঐ প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করতে পারে। বিনা অক্সিজেনে বাঁচে, দক্ষিণ মেরুর শীতে (মাইনাস ১১৬ ডিগ্রি ফাঃ) টিকে থাকে।

বিজ্ঞানীরা তাই একটি অদ্ভুত পরীক্ষা করে দেখলেন—মঙ্গল-গ্রহের অনুরূপ কৃত্রিম পরিবেশ ল্যাবরেটারীতে সৃষ্টি করে দেখতে চাইলেন, সেখানে পার্থিব জীবাণু বেঁচে থাকতে পারে কি না: কৃত্রিম কক্ষটির নাম 'মার্স-জার' বা 'মঙ্গলকক্ষ'। সেই কক্ষের মেজেতে

রাখা হল নির্জলা (এ্যানহাইড্রাস্) লিমোনাইট চুন—যার আধিক্য মঙ্গলের উপরিভাগে লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে অক্সিজেন নেই—আবহাওয়া, উত্তাপ প্রভৃতি ঠিক মঙ্গলগ্রহের মত। এমন কি সূর্য-বিচ্ছুরিত অতিবেগুনী আলো (আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি) যে পরিমাণে মঙ্গলে পড়ে তাও কৃত্রিমভাবে বিচ্ছুরিত হল সেই কাঁচের জারে। তারপর সেই কৃত্রিম মঙ্গলগ্রহের বাতাবরণে কিছু জীবাণুকে প্রবিষ্ট করিয়ে দেখা হল, তারা কতক্ষণ বেঁচে থাকে। আশ্চর্য! দেখা গেল, অধিকাংশ জীবাণুই মারা গেল বটে; কিন্তু কিছু অংশ সেই বিষম বাতাবরণ সহ্য করে টিকে থাকল। পার্থিব জীবাণু এই অনভ্যস্ত পরিবেশে যদি টিকে থাকতে পারে, তাহলে ঐ পরিবেশে কোন জীবাণু যদি কোটি কোটি বছর ধরে বিবর্তিত হয়ে থাকে তাহলে তারা সেখানে স্বচ্ছন্দে থাকবে ও বংশ বৃদ্ধি করবে।

তাই উৎসাহিত হয়ে বিজ্ঞানীরা এ বছর (১৯৫৬) মার্চ মাসে একটি স্বয়ংক্রিয় আকাশযান মঙ্গলের উদ্দেশ্যে পাঠিয়েছেন। তার নাম 'ভাইকিং'। আকাশযান থেকে একটি তেপায়া যন্ত্র মঙ্গলে অবতরণ করবে এবং মাটি খুবলে নিয়ে পরীক্ষা করবে। যন্ত্রটি বিজ্ঞানের এক বিস্ময়। মাত্র এক ঘন ফুট জায়গায় রাখা আছে তিন লক্ষ ট্রানজিস্টার, ২০০০ ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি! (১২) ওরই গর্ভে আছে রাসায়নিক বীক্ষণাগার (কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি) যা মঙ্গলের তুলে নেওয়া মাটিকে পরীক্ষা করবে এবং ফলাফল বেতারের মাধ্যমে পৃথিবীতে পাঠাবে। কোন রকম জীবাণুর সন্ধান পেলেই তা ঐ যন্ত্রে জানা যাবে। আমার এ গ্রন্থ ছাপাখানা থেকে বার হয়ে আসার পূর্বেই হয়তো সে তথ্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে।

এবার 'মার্স-ভায়া-ভেনাস' মিশনের কথা বলি। জ্যোতি-র্বিজ্ঞানীরা এছাড়া আরও একটি বড় জাতের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, যার নাম 'শুক্র পেরিয়ে মঙ্গল'। আকাশযানটি রওনা হবে ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসে। প্রথমে যাবে শুক্রের দিকে। প্রায় মাস

ছয়েক পরে শুক্রগ্রহের খুব কাছ থেকে কিছু বেতার ফটো পাঠাবে পৃথিবীতে। শুক্রে সে নামবে না। নামায় বাধা আছে। সে কথায় পরে আসছি। আপাততঃ বলি শুক্রকে প্রদক্ষিণ করে ঐ আকাশ-যানটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে মুখ ঘুরিয়ে রওনা দেবে মঙ্গলগ্রহের দিকে। মঙ্গলের মাটিতে সে নামবে। মাস দুয়েক থাকবে সেখানে। তারপর রওনা দেবে পৃথিবীর দিকে। ঘরের ছেলে ঘরে ফিরবে দেড় বছর পরে, ৭ই অক্টোবর ১৯৫৬ তারিখে। চিত্র—৯-এ তার ভ্রমণসূচীটা দেখাবার চেষ্টা করেছি। (১৩)
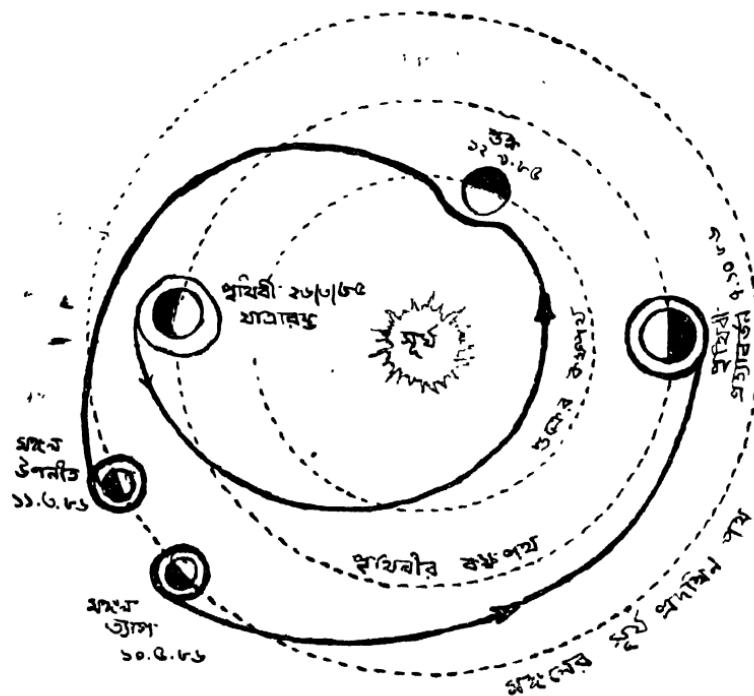
চিত্র—৯
'মার্স-ভায়া-ভেনাস' প্রকল্প

আমাদের এ শতাব্দী শেষ হতে তখনও বাকি থাকবে আরও চৌদ্দ বছর। চৌদ্দ বছর ক' দিনে হয়, তা জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা জানেন, তাই তাঁরা আশা করছেন—এ শতাব্দীতেই মানুষ মঙ্গলগ্রহে উপস্থিত হবে।

তারা গিয়ে কী দেখবে? বুদ্ধিমান মঙ্গলবাসীকে দেখতে না পেলেও তারা কি অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর জীবাশ্ম খুঁজে পাবে?

তিন—পৃথিবী ঃ

যুক্তি-তর্ক ঃ বাঙলা ১৩০২ সালে ২রা ফাল্গুন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় যে কালের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই কালকে এবার নিছক গদ্যে ধরতে হবে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন। ভুল দু'দিকেই হতে পারে—কল্পনার অভাব অথবা কল্পনার আধিক্য। লক্ষ্য করে দেখছি কি না, পূর্বসূরীরা দু'জাতের ভুলই করেছেন, তবে প্রথম জাতের ভুলটাই হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে; অর্থাৎ কল্পনায় যতটা অগ্রগতির চিত্র তাঁরা এঁকেছেন, বাস্তব-ক্ষেত্রে দুনিয়া তার চেয়েও বেশিদূর এগিয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ দর্শনের এই ব্যর্থতার কারণ হিসাবে দেখছি আবার দু'জাতের হেতু ঃ স্নায়বিক দুর্বলতা এবং কল্পনার অপ্রতুলতা। প্রথম ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার সামনে এমন সব তথ্য ছিল, যা থেকে তাঁদের বোঝা উচিত ছিল—আগামী যুগে দুনিয়া কিভাবে রূপায়িত হবে; কিন্তু তাঁরা সাহস করে তা বিশ্বাস করতে পারেন নি। এটাকে বলছি, স্নায়বিক দুর্বলতা বা নার্ভাস্‌নেস। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার কল্পনার যথেষ্ট প্রসার হয় নি। যে-সব বিজ্ঞান-ভিত্তিক ঔপন্যাসিক ভবিষ্যতের চিত্র সার্থকরূপে আঁকতে পেরেছেন, তাঁদের মধ্যে দু'জনের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ছে—জুল ভের্ন (১৮২৮-১৯০৫) এবং মার্কিন আবিষ্কারক হুগো জার্নসব্যাক (জন্ম ১৮৮৪)। তৃতীয় নাম ঃ এইচ. জি. ওয়েলস্‌। কিন্তু অধিকাংশ লেখকই কল্পনায় ততদূর যেতে পারেন নি, বাস্তব দুনিয়া ভবিষ্যতে যতদূর গিয়েছিল। 'Famine 1955' ব্যর্থ হয়েছে; 'ইউটোপিয়া ১৯৫৬' সার্থক হয়নি।

হবু আবিষ্কারক যখনই তাঁদের কল্পনার কথা বলেছেন, তাঁর

আশপাশের জ্ঞানীগুণী বন্ধুরা বলেছেন—এটা নিছক পাগলামি। এর ভূরি ভূরি উদাহরণ আছে। দু'-একটি কৌতুককর উদাহরণ দিই। ১৮৭৮ সালে জগদ্বিখ্যাত মার্কিন আবিষ্কারক এডিসন যখন ঘোষণা করলেন যে, তিনি তাঁর ল্যাবরেটারীতে 'ইলেক্ট্রিক বাল্ব' জ্বেলেছেন তখন ইংলণ্ডে গ্যাস কোম্পানীর মালিকেরা বিচলিত হলেন। গ্যাস কোম্পানীর শেয়ারের বাজার-দর হু হু করে পড়ে যেতে শুরু করল। তখন বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট একদল বিশেষজ্ঞকে আমেরিকায় পাঠালেন, সরেজমিনে তদন্ত করে আসতে। অভিজ্ঞ ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিকদল সরেজমিনে তদন্ত করে এসে রিপোর্ট দিলেন—"যা দেখে এলাম, বুঝে এলাম, তাতে নিঃসন্দেহে বলতে পারি—ও জাতের বাতির বাস্তব প্রয়োগ কোন কালেই হবে না। গ্যাসের বাতির তুলনায় তার রোশনাই নিতান্তই কম। সমুদ্রপারের বন্ধুরা যতই প্রচার চালান—গ্যাসের উজ্জ্বল আলোকে হটিয়ে ঐ মিট্ মিটে বিজলি-বাতি কোন দিনই বাজার দখল করতে পারবে না।"

ঐ ধুরন্ধর বিশেষজ্ঞের আশ্বাসে গ্যাস কোম্পানীর শেয়ারের দর কতটা উঠেছিল তা জানি না, তবে কয়েক দশকের মধ্যে গ্যাসের উজ্জ্বল আলো যে লালবাতিতে রূপান্তরিত হয়েছিল তা বাস্তব সত্য!

পরমাণুর অন্তরের আলেখ্য যাঁরা প্রথম এঁকেছিলেন সেই বিশ্ব-বিশ্রুত বৈজ্ঞানিক দল, লর্ড রাদারফোর্ড, নীল্‌স্ বোহ্‌র কিম্বা আইনস্টাইন পর্যন্ত বিশ্বাস করতেন না যে, মানুষ কোনদিন পারমাণবিক শক্তির অধিকারী হবে। উল্লিখিত উদাহরণে বৈজ্ঞানিকদের ব্যর্থতার কারণ—তাঁদের পাণ্ডিত্যের অভাব নয়, এমন কি কল্পনা শক্তির অভাবও নয়; ঐ স্নায়বিক দৌর্বল্য। ওঁরা সব জেনে বুঝেও প্রযুক্তি-বিদ্যার উপর ভরসা করতে পারছিলেন না।

বস্তুত অনাগত বিজ্ঞান-বিষয়ক আবিষ্কার দু'জাতের হতে পারে। প্রথম জাতের আবিষ্কার হচ্ছে, যার থিয়োরেটিক্যাল ক্ষেত্র প্রস্তুত—

শুধু প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে ঠিকমত রাস্তাটা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলিকে ভবিষ্যৎ-বক্তা যদি অনুমান করতে না পারেন তবে তাঁকে নিশ্চয়ই দোষ দেব। দ্বিতীয় জাতের আবিষ্কারের পথে আছে এমন কোন অলঙ্ঘ্য গাণিতিক বা পদার্থবিদ্যা-সূত্রের মৌলিক বাধা— যা কয়েক শতক বা কয়েক দশক আগে কল্পনা করা অসম্ভব, এমনকি ধুরন্ধর প্রতিভাবানের পক্ষেও। একটা উদাহরণ দিই, বুঝতে সুবিধা হবে:

ধরুন, দু-হাজার বছরের ইতিহাস থেকে আমরা চারজন ধুরন্ধর প্রতিভাবান পুরুষকে আমাদের বসু-বিজ্ঞান মন্দিরের 'লেকচার-হলে' নিয়ে এসে এ যুগের চারটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের যন্ত্রপাতির কার্যপ্রণালী বোঝাতে চেষ্টা করলাম। যন্ত্র চারটি হচ্ছে—ডিজেল এঞ্জিন, মটোর গাড়ি, স্টীম টারবাইন এবং এয়ারোপ্লেন। ধরুন, আমাদের চারজন ছাত্র-দর্শক হচ্ছেন—বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, গ্যালিলিও, লিওনার্দো দা ভিঞ্চি এবং আর্কিমিডিস। আমার তো মনে হয়, ঘণ্টা কয়েক নাড়াচাড়া করে ঐ চারটি যন্ত্রের কার্যকারণ প্রণালী ওঁরা মোটামুটি বুঝে ফেলবেন। এমন কি, লিওনার্দো হয় তো বলে বসবেন—আমার স্কেচ বইটা দেখি হে? এমন দু'-একটা নক্সা যেন আমি ছকে ছিলাম মনে হচ্ছে। অনেক দিনের কথা তো, ঠিক স্মরণ হচ্ছে না!

কিন্তু ওঁদের চারজনের কাছে এবার যদি অন্যজাতের চারটি বিজ্ঞানের বিস্ময়কে হাজির করা হয়—এক্স-রে যন্ত্র, টেলিভিশান, ইলেক্‌ট্রনিক কম্পুটার এমন কি সস্তা ট্রানজিস্টার রেডিও—ওঁরা তার কোন কুলকিনারাই করতে পারবেন না। তার কারণ ওঁদের চিন্তাধারা এবং এই চারিটি যন্ত্রের মাঝখানে গণিত ও পদার্থবিদ্যার এমন কতকগুলি মৌলসূত্র আছে যা সে যুগের মানসিকতায়, সে যুগের শিক্ষায় ওঁরা কিছুতেই রাতারাতি বুঝে উঠতে পারবেন না। অত পুরানো দিনের কথা ছেড়ে দিন—ডিনামাইটের আবিষ্কারক

নোবেল সাহেবকে ডেকে এনে আজ যদি বলা যায়, "এই দেখুন দু-টুকরো মৌলপদার্থ, এর নাম ইউরেনিয়াম ২৩৫। এ দুটিকে যদি কিছু দূরে দূরে রাখেন কিছুই ঘটবে না; কিন্তু এদের যদি হঠাৎ কাছাকাছি নিয়ে আসেন, তাহলে এরা আপনার তৈরী হাজার টন ডিনামাইটের চেয়েও বেশি জোরে বিস্ফোরিত হবে!"—তাহলে নোবেল সাহেব ক্ষেপে যাবেন। বলবেন, "এটা কী হচ্ছে? বিজ্ঞান, না ম্যাজিক?"

দোষ নোবেলের শিক্ষার নয়, কল্পনার অপ্রতুলতা নয়। তাঁর যুগে রেডিয়াম-ধর্মী মৌল পদার্থের আবিষ্কার হয়নি, সেটা তাঁর ধারণার অতীত।

এত কথা বিস্তারিত আলোচনা করলাম শুধু একথা বলতে যে, আজ এই ১৯৫৭ সালে লিখতে বসে ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের চিত্র আঁকবার সময় আমরা আংশিকভাবে ভুল করতে বাধ্য। ইতিমধ্যে গণিত, রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, বা বিজ্ঞানের অন্য কোন শাখায় যদি কোনও অপ্রত্যাশিত মৌল আবিষ্কার হয়—যেমন হয়েছিল রেডিয়াম আবিষ্কারে, কোয়ান্টাম থিওরিতে, আপেক্ষিকতাবাদে, সম্প্রতি হতে চলেছে সুপারস্পেস, ট্যাকায়ন, এ্যান্টিম্যাটার বা ক্রোনি সম্বন্ধে তাহলে আমরা নাচার! সে-ছবি আমরা আঁকতে পারব না; আর সেজন্য অনাগতকাল আমাদের দুয়ো দিতেও পারবে না নিশ্চয়। কারণ এই ১৯৫৭-এ দাঁড়িয়ে তা আমাদের ধারণার বাইরে। নিচে দুটি তালিকা সন্নিবেশিত করে দিলাম। বাম দিকের আবিষ্কারগুলি এসেছে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে। পূর্বযুগের ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা তাদের উল্লেখ করতে পারেননি, তা সম্ভবও ছিল না। অপর পক্ষে ডান দিকের তালিকায় আছে প্রত্যাশিত আবিষ্কার। যেগুলি বাস্তবায়িত হবার পূর্বযুগ থেকেই ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা বৈজ্ঞানিকেরা তার সম্ভাবনা অনুমান করতে পেরেছিলেন। লক্ষণীয় বামদিকের তালিকায় প্রতিটি আবিষ্কার সুসম্পন্ন; ঐ তালিকায় যা সুসম্পন্ন নয়, তা আমিই

বা কল্পনা করে লিখব কেমন করে? অপরপক্ষে ডানদিকের তালিকার কিছু অংশ বাস্তবায়িত এবং কিছু আছে, যা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি, আমরা প্রতীক্ষা করে আছি :

অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার	প্রত্যাশিত আবিষ্কার
এক্সরে; নিউক্লিয়ার এনার্জি; ফটোগ্রাফি; রেডিও; ট্রানজিস্টার; টি-ভি; ইলেকট্রনিক্স; আপেক্ষিকতাবাদ; কার্বন টেস্ট (১৪); নক্ষত্রের গঠন বৈচিত্র্যের বিশ্লেষণ; এ্যাটমিক ক্লক; লেসার; ইলেকট্রনিক মস্তিষ্ক।	বাষ্পীয় শকট; মটোর গাড়ি; এয়ারো প্লেন; সাবমেরিন; টেলিফোন; স্পেস-শিপ; কৃত্রিম প্রাণ; অদৃশ্য হতে পারা; বাতাসে ভাসতে পারার ক্ষমতা, অতীতকে প্রত্যক্ষ করা; ভবিষ্যৎকে নির্ভুলভাবে জানা; প্লাষ্টিক খাদ্য; বহিঃ পৃথিবীর জীবের সঙ্গে যোগাযোগ; সৃষ্টিরহস্যের চূড়ান্ত ব্যাখ্যা।

কোন কোন ক্ষেত্রে মনে হয়েছে—এ যুগের কয়েকজন বিজ্ঞান ভিত্তিক লেখক (আমার মতে) বেশী আশাবাদী। যেন ধরুন, এ-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-ভিত্তিক লেখক আর্থার ক্লার্ক। ‘রাঁদেভূ উইথ্ রাম’ কাহিনীতে তিনি দ্বাবিংশ শতাব্দীতে ইউরেনাস-এর উপগ্রহ ট্রাইটনে মানুষের উপনিবেশ দেখিয়েছেন, বুধে মানুষের লোক সংখ্যা কল্পনা করেছেন লক্ষাধিক! মেনে নিতে আমিই স্নায়বিক দৌর্বল্যে ভুগেছি। ‘১৯৫৭ স্পেস অডিসি’ উপন্যাসে তিনি একটি আকাশযানকে পৃথিবী থেকে শনিগ্রহের দিকে রওনা করেছেন জনা-পাঁচেক যাত্রীসমেত। ঘটনা ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের। বইটা ১৯৫৭ সালে লেখা, তখনও নীল আর্মস্ট্রং চন্দ্রলোকে পদার্পণ করেননি। ১৯৫৭ সালে ঐ গ্রন্থ অবলম্বন করে আমি যখন ‘নক্ষত্রলোকের দেবতাত্মা’ রচনা করি তখনও আমি সাহস করে আমার নায়ক-নায়িকাকে শনিগ্রহে পাঠাতে পারিনি। লক্ষ্যস্থল নির্ধারণ করেছিলাম—বৃহস্পতি গ্রহ; অর্থাৎ দূরত্বটা প্রায় ১০০ কোটি

কি. মি. কমিয়ে ধরেছিলাম। কিন্তু কে বলতে পারে, ক্লার্কই বেশি আশাবাদী, নাকি আমিই ভীতু—ভুগছি ঐ স্নায়বিক দৌর্বল্যে!

সেটাও অসম্ভব নয়। ধরুন, আলডুস হাক্সলের কথা। ১৯৩১ সালে তিনি লিখলেন: 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'। ছয়শত বৎসর পরে পৃথিবীর অবস্থা। গ্রন্থটির বয়স আজ মাত্র পঁয়তাল্লিশ। কিন্তু এখনই বেশ বোঝা যাচ্ছে---হাক্সলের কল্পনাকে ছাপিয়ে প্রযুক্তিবিদ্যা ইতিমধ্যেই অনেক এগিয়ে গেছে। ঐ গ্রন্থের নূতন সংস্করণে ভূমিকা লিখবার সময় হাক্সলে নিজেই লিখলেন (১৪) "One vast and obvious failure of foresight is immediately apparent. 'Brave New World' contains no reference to nuclear fission." [ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির একটা প্রকাণ্ড ও জ্বলন্ত ব্যর্থতা সহজেই নজরে পড়ে। 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ডে' পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ হবার কোনও ইঙ্গিত নেই]। অবশ্য হাক্সলে কৈফিয়ৎ হিসাবে যে কথা বলেছেন সেটাও সর্বান্তঃকরণে মেনে নিচ্ছি: "The theme of 'Brave New World' is not the advancement of science as such; it is the advancement of science as it affects human individuals." [বৈজ্ঞানিক উন্নতিই 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড'-গ্রন্থের প্রধান উপজীব্য নয়; বিজ্ঞানের উন্নতিতে ব্যক্তি-মানস কী-ভাবে প্রভাবিত হচ্ছে তাই ওখানে মূল কথা]। তবু আমরা বলতে বাধ্য—দিক্‌পাল চিন্তাবিদের কাছে আমরা আরও বাস্তবানুগ চিত্র আশা করেছিলাম। শুধু পারমাণবিক শক্তির অনুপস্থিতিটুকুই নয়; আরও অনেক তথ্য আমরা গ্রহণ করতে পারিনি। যেমন আমরা অবাক হয়ে যাই, যখন দেখি লেখক ষড়বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর জনসংখ্যার উল্লেখ করছেন মাত্র দুইশত কোটি (পৃঃ ৩৯, পেঙ্গুইন এডিশান'৫৭); কিম্বা জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য মেয়েরা পিল খাচ্ছে না, ব্যায়াম করছে অথবা বেল্ট পরছে (পৃঃ ৫০)। প্রতিবারে উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা লিফ্‌ট-এ উঠবার সময় লিফ্‌ট

ম্যানের সাক্ষাৎ পাচ্ছে (অটোমেটিক লিফ্‌ট নেই) এবং লণ্ডন থেকে মার্কিন মুলুকে যেতে আকাশযানের সময় লাগছে ছয় ঘণ্টা (পৃঃ ৮৫)। সুতরাং একথা মানতেই হবে যে, 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' মানবিকতার ভবিষ্যৎ মূল্যায়নের নিরিখে এ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল হওয়া সত্ত্বেও সেটা ভবিষ্যতের বহিরঙ্গটাকে ঠিকমত ধরতে পারেনি।

পূর্বসূরীদের ভবিষ্যৎ-গণনার বিষয়ে দোষ ত্রুটি ধরে 'যুক্তি-তর্কে' পাণ্ডিত্য প্রকাশ তো করা গেল, এবার উত্তরকাল যাতে আমাকে নস্যাৎ করতে পারে তার সুযোগ দিতে 'গল্প'ই শোনাই।

পৃথিবী—গল্প :

মধ্যরাত্রি অতিক্রান্ত। রেড রোড নির্জন। প্যাডল করতে করতে চন্দ্রজয় একবার পূর্ব আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখল। না, ভোরের লক্ষণ এখনও ফুটে ওঠেনি। অন্ধকারে নিঃসঙ্গ প্রহরীর মত দাঁড়িয়ে আছে শহীদ মিনার—অক্টারলোনিকে সে এতদিনে বেমালুম ভুলে গেছে। চন্দ্রজয় শহীদ মিনারের উপর সম্প্রতি লাগানো প্রকাণ্ড ইলেক্‌ট্রনিক ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখল। রাত একটা বেজে কুড়ি। ভোরের আলো ফুটতে এখনও ঘণ্টা চারেক। তারপর উঠবে নূতন যুগের সূর্য। না, শুধু বছরের প্রথম সূর্যোদয়ই নয়, শতাব্দীর প্রথম সূর্যোদয়। মুহূর্তটি ইতিহাসের এক চিহ্নিত খণ্ডকাল। শুধু মানুষের ইতিহাসে নয়, চন্দ্রজয়ের ব্যক্তিগত জীবনেও।

আজ তার প্রথম বিবাহ বার্ষিকী।

রেড-রোডে জনপ্রাণী নেই। এটা চৌরঙ্গী নয়, সেখানে রাস্তার দু'ধারে সারি সারি গাড়ি-বারান্দা—তার নিচে মানুষ, আর মানুষ। মেহনতী মানুষ! ঠেশাঠেশি করে রাত কাটাচ্ছে। কুকুর কুণ্ডলী। এটা খানদানী রাস্তা। পীচ মোড়া সড়ক—মাঝখানে এক জোড়া

মনোরেল। সাইকেল চালাতে চালাতে চন্দ্রজয়ের মনে পড়ল ছেলেবেলার কথা। তখন এখানে মনোরেল ছিল না। ছিল মটোর-গাড়ির মিছিল—এ্যাম্বাসাডার, ফিয়াট, স্টাণ্ডার্ড, মারুতী—মাঝে মাঝে বিদেশী মডেলও। অফিস টাইমে এ রাস্তা পার হওয়াই ছিল বিড়ম্বনা। এখন সারা দিনে যে ক'খানা গাড়ি যায় তা গুণতে দু'হাতের দশটা আঙুলই যথেষ্ট। তাও প্রাইভেট গাড়ি বা ট্যাক্সি নয়—হয় এ্যাম্বুলেন্স, নয় পুলিশের গাড়ি কিংবা তা-বড় তা-বড় কোন বাণিজ্যচুম্বক অথবা সরকারী হর্তাকর্তার গাড়ি। সে গাড়িতে রবারের চাকা নেই—গরবে তাদের মাটিতে পা পড়ে না। তারা রেড রোড না ছুঁয়েই হু হু করে ছোটে—তারা হোভার ক্রাফ্‌ট্। সেকালে চৌরঙ্গী দিয়েও চলত গাড়ির মিছিল—এমনকি এই মধ্য-রাত্রেও। সে রাস্তায় তখন ঠেলাগাড়ি বা রিক্‌সা যেতে দেওয়া হত না। তারপর পেট্রোল-চালিত গাড়ি ডোডোপাখী, কোয়াগ্গা অথবা নীল-তিমির দলে নাম লেখালো। এখন তাদের দেখতে পাবে শুধু ছবির বইয়ে, কিম্বা যাদুঘরে। এল নূতন যুগ—ডিজেল-গাড়ির মরশুম। পেট্রোল দুষ্প্রাপ্য, তাই কালো-টাকায়-বেলুন উপরতলার মানুষ গরম কেকের মত ডিজেল গাড়ি কিনতে শুরু করল। ডিজেল-এ ট্যাক্স কম, ডিজেল সস্তা। সে খেলা ছিল স্বল্পস্থায়ী—আশির দশকের শেষাশেষি ডিজেল গাড়িও ডোডোপাখীর পাশে গিয়ে দাঁড়ালো। কথাটা কেউ খেয়াল করে দেখেনি—ডিজেল সম্পর্কে পেট্রোলের মাস্‌তুতো ভাই। অনুজের গত্যন্তর ছিল না অগ্রজের পদাঙ্ক অনুসরণ না করে। এখন এই উনিশ শ' ছিয়ানব্বই-এ শহরের মানুষ পথের দাবী মেটায় মাটির তলায়—'টিউব রেল'-এ। উপর তলায় আজও টিকে আছে ট্রামগাড়ি। যদিও তারা একচাকার—মনোরেল। সৌরশক্তি সংগ্রহের ব্যবস্থাটা কার্যকরী হওয়ায় লোড শেডিংটা বন্ধ হয়েছে। আর আছে দ্বিচক্রযান। হাজার হাজার নয়, লক্ষ লক্ষ। চন্দ্রজয়ের মতো

মধ্যবিত্তের কেরানীকুল আজ তাই দু-চাকার মুশাফির। বদলে গেছে, আশ্চর্য রকম ভাবে বদলে গেছে শহর কলকাতা—সুতানুটি, গোবিন্দপুরের উত্তর সাধক।

হঠাৎ নজর পড়ল রাস্তার ধারে। তাই তো! ওরা তো বদলায়নি! ঐ কৃষ্ণচূড়া, গোলমোহর আর রাধাচূড়ার পথপ্রহরী। চৈতালী হাওয়ায় দুলছে ফুলে-ভরা গাছগুলো। একশ বছর আগেকার বসন্তের রক্তরাগ তো একতিলও ম্লান হয়নি। সেদিনও কর্মক্লান্ত ঘরে-ফেরা মানুষ সঞ্চয় করত পথপ্রান্তের অশোকমঞ্জরী, কাঁপা-হাতে হয়তো পরিয়ে দিত প্রদীপজ্বলা সন্ধ্যায় কারও আনন্দে-রাঙা কর্ণমূলে। অশোক-মঞ্জরী অবশ্য আজও ফোটে, কিন্তু প্রদীপ আর জ্বলে না। মধ্যরাত্র অতিক্রান্ত না হলে ওর ঘরে ফেরাও হয় না। সে জন্য অবশ্য দায়ী ওর চাকরিটা। চন্দ্রজয় সংবাদপত্রের সহ-অনুবাদক। কোন কাগজের? প্রশ্নটা বাহুল্য। এখন আর পাঁচ-দশটা দৈনিক পত্র বের হয় না কলকাতায়। সুনিয়ন্ত্রিত একটিমাত্রই পত্রিকা প্রকাশিত হয়—তিন চারটি ভাষায়। সংবাদ, চিঠিপত্র, সম্পাদকীয় সবই হুবহু এক—ভাষাটা শুধু আলাদা। চন্দ্রজয়ের মত বহু অনুবাদক এখন চাকরি পেয়েছে। তারা শুধু অনুবাদই করে যায়। ওর ছুটি হয় এমন মাঝরাতেই। কাল পয়লা বৈশাখ, ছুটি নেই অবশ্য। চেয়েছিল, পায়নি। অথচ কাল ওর বিবাহ বার্ষিকী। কাল কেন? আজই তো! বাঙলা মতে না হলেও ইংরাজী মতে। গত বছর এই তারিখেই সে বিয়ে করেছিল নমিতাকে।

নমিতা। এতক্ষণে নিশ্চয় ঘুমিয়ে কাদা। ঘুমিয়েছে কি? হয়তো জেগে বসে আছে। নমিতা জানে, আজ রাত দুটোয় বাড়ি ফিরেই চন্দ্রজয় ওকে ডেকে পাঠাবে। সেই রকম পরিকল্পনাই করা আছে। বাকি রাতটুকু ওরা ঘুমাবে না। মধুকক্ষে অবশ্য আধ-ঘণ্টার বেশি থাকতে দেবে না, কিন্তু খোলা আকাশের তো এখনও

আকাল পড়েনি। ঘর না থাকলেও পথ আছে। চন্দ্রজয় ওর সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে-ঝোলানো প্লাস্টিকের ব্যাগটার দিকে একবার নজর করল। প্যাকেটটা ঠিকই আছে। প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীর উপহার। অনেক দিন ধরে পয়সা জমিয়ে আজ কিনেছে। একখণ্ড 'সঞ্চয়িতা', আর দু' প্যাকেট ক্যাডবেরি চকোলেট। কে জানে, হয়তো শেষোক্ত উপহারটাই ওর বেশি পছন্দ হবে। কতদিন ওরা ও-সবের স্বাদ পায়নি। ভুলেই গেছে প্রায়।

এক বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে। ওর বিবাহ-রাত্রির কথা। নিতান্ত নিরাড়ম্বর আয়োজন। রেজেস্ট্রি অফিসে গিয়ে সই দিয়ে আসা। তা হোক, তবু সেটাই তো ওদের নূতন পরিচয়ের শুভ-সূচনা। নমিতাকে অবশ্য বিয়ের অনেক আগে থেকেই চিনত। শুধু ও নয়, ওর পরিবারের সকলেই। একই পাড়াতে যে থাকত ওরা। নমিতা যখন বেণী দুলিয়ে স্কুলে পড়তে যেত তখন থেকেই চিনত। সেই বয়সেই বিয়ের কথাটা উঠেছিল। তখন আপত্তিরও কোন কারণ কেউ খুঁজে পায়নি। তারপর ওরা বড় হওয়ার পর আপত্তি উঠেছিল। চন্দ্রজয়ের বাবাই আপত্তি তুলেছিলেন। সেজন্য তাঁকে ঠিক দোষও দিতে পারত না চন্দ্রজয়। কথা তো ভুল নয়। দেশের কী হাল! চন্দ্রকান্তবাবু তখন পেনসন নিয়েছেন, ওর উপার্জনেই চলত সংসার। পরিবারে চারটি প্রাণী—তাদেরই গ্রাসাচ্ছাদন হওয়া কঠিন। সংসারে আর ভাগিদার বাড়ানো কি ঠিক? মা প্রতিবাদ করতেন—তাই বলে ছেলের বিয়ে দেবে না? চারটে প্রাণীর যদি জোটে তবে পাঁচজনেরও জুটবে। চন্দ্রকান্তবাবু হেসে বলতেন, 'এক্সপোনেন্সিয়াল'-হারে বৃদ্ধি কাকে বলে জান? বছর ঘুরলেই হবে ছয়, তারপর সাত, আট, নয়···

নমিতার সঙ্গে এখানে ওখানে দেখা হত। লুকিয়ে প্রেম করতে হত না, ওটাকে দূষনীয় বলে কেউ মনেও করত না। নমিতা বিয়ের কথা তুলত, ও সত্যি কথাটা স্বীকার করত না। বলত, সে তো

রাজীই আছে—ওর বাপ যে রাজী নন। নমিতা কিন্তু বুদ্ধিমতী, ঠিক বুঝে নিয়েছিল কেন ভয় পায় চন্দ্রজয়। আসলে চন্দ্রজয়ের ভয়টাও ছিল ওখানেই—সংসারের মানুষ না বেড়ে যায়।

তারপর একদিন। বাবা রাজী হয়ে গেলেন। চন্দ্রজয়ও তখন আর কোন ছুতো খুঁজে পেল না। তখনও আসল কথাটা সে জানত না। সেটা জানতে পেরেছিল অনেক পরে। নমিতার কাছেই। বিয়ের মাস দুই পরে। আশ্চর্য। বিয়ের আগে অতবড় কথাটা কেন জানতে দেয়নি নমিতা ? সে রাতটার কথা আজও মনে আছে চন্দ্রজয়ের।

ওর হাতটা ঠেলে নববধূ বলে উঠেছিল—ওসবে দরকার নেই।

—দরকার নেই ! মানে ? তুমি কি আমাকে ডোবাবে নাকি ?

—না। ডোবাবো না। ও ভয় নেই।

—কেন ? পিল খেতে শুরু করছ নাকি ?

অন্ধকার ঘরে চন্দ্রজয় বুঝে উঠতে পারেনি—কেন জবাব দিতে দেরী হল নমিতার। সেটা বুঝল, ওর মুখখানা বুকে টেনে নিতে গিয়ে। নমিতা কাঁদছে। নিঃশব্দে।

—একি। কাঁদছ কেন ?

ওর বুকে মুখ লুকিয়ে নমিতা বলেছিল, আমি···আমি কোনদিন মা হতে পারব না।

সোজা হয়ে উঠে বসেছিল চন্দ্রজয় : মানে ? কী বলতে চাইছ ?

—গত বছর আমার এ্যাপেণ্ডিসাইটিস্ অপারেশন হয়েছিল মনে আছে ? তখনই—

হ্যাঁ, মনে আছে। চন্দ্রজয় অফিস ফেরত রোজ হাসপাতালে দেখা করতে যেত। নাইট ডিউটি নিত না। তখনও ওদের বিয়েটা পাকা হয়নি। না হোক। বিকালে দেখা করার সময়ে ওর নিত্য আগমনে আপত্তি ছিল না কারও। সবাই জানত—ওরা দু'জন পরস্পরকে ভালবাসে, প্রেম-পর্ব চলছে।

—তখনই আমার জরায়ুতে কী একটা দোষ দেখা দেয়। ডক্টর ব্যানার্জি এ্যাপেণ্ডিক্সের সঙ্গে ওটাকেও···

অনুভূতিটা আজও মনে আছে। ব্যথা যতটা পেয়েছিল তার চেয়ে বেশি পেয়েছিল দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি। বঞ্চনার চেয়ে প্রাপ্তি-টাই যেন বেশি। হাত বাড়িয়ে বেড-সুইচটা জ্বেলে দিয়েছিল নমিতা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে দেখেছিল। ওর মনের মধ্যে কী হচ্ছে সে জানতে চায়।

—তুমি রাগ করেছ ?—জানতে চায় নমিতা।

সে কথার জবাব এড়িয়ে চন্দ্রজয় বলেছিল—এতবড় কথাটা এতদিন বলনি কেন ? কী ভেবেছিলে তুমি ? জানলে আমি বিয়েতে গররাজী হব ?

—না। ঠিক উল্টোটা। আমি জানতে চেয়েছিলাম, ওটা না জানলেও তুমি বিয়েতে রাজী হও কি না।

ঠিক অর্থ গ্রহণ হয় না চন্দ্রজয়ের। বলে, মানে ?

এবার নমিতাও ঘুরিয়ে বলে, তোমার বাবা-মা কিন্তু জানতেন।

—তুমি কেমন করে জানলে ?

—আমার বাবা তোমার বাবাকে সব কথা খুলে বলেছিলেন।

রাগ করবে, না খুশি হবে বুঝে উঠতে পারে নি চন্দ্রজয়। হঠাৎ কেন একদিন ওর বাবা সম্মতি দিয়ে বসেছিলেন, সেটা বোঝা গেল। পাঁচ কোনদিন ছয় হবে না, এই গ্যারান্টি পেয়ে। বুড়োটা যা ঘড়েল, হয়তো হাসপাতালে গিয়ে পাকা খবরটা সংগ্রহ না-করে হবু-বৈবাহিককে পাকা কথাটা দেয় নি। নাতির নাকের সামনে সদর-দরজটা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত পুত্রবধূকে খিড়কির দরজা দিয়ে ঢুকতে দেয় নি। কিন্তু শুধু চন্দ্রকান্তকে দোষ দিয়েই বা কি হবে—নমিতার সঙ্গে জীবনটাকে জড়িয়ে নিতে সে নিজেও তো এতদিন ভরসা পায় নি। নমিতাও তা জানত।

ঘন্টি বাজাতে বাজাতে ওকে অতিক্রম করে দক্ষিণমুখো একটা

'হুভার-ক্রাফ্‌ট দমকল' বেরিয়ে গেল। আবার কোথাও আগুন লেগেছে হয়তো। দমকলের গায়ে বড় বড় হরফে লেখা 'দেশ এগিছে চলেছে'। শহরে জলের যা অবস্থা—প্রতিবেশীর বাড়িতে আগুন লাগলে কেউ এক ঘটি জল ঢেলে উপকার করবে না। অথচ চন্দ্রজয় জানে, গত দশ বছরে পানীয় জলের সরবরাহ যথেষ্ট বেড়েছে—দেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে, তখন তা তো হবেই। মানুষ বেড়েছে তার চেয়ে বেশি দ্রুত হারে।

রাস্তার ধারে, বাঁদিকে, খাঁচার মধ্যে একটা প্রাগৈতিহাসিক প্যাটন-ট্যাঙ্ক। 'প্রাগৈতিহাসিক' শব্দটা অবশ্য আলঙ্কারিক অত্যুক্তি—ওটা বছর ত্রিশেক আগে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল। তখন অমন সেকেলে যুদ্ধাস্ত্রই ব্যবহৃত হত রণক্ষেত্রে। এই রাস্তা ধরে পুব-মুখো এগিয়ে গেলে—চন্দ্রজয় জানে, দেখতে পাওয়া যাবে জাতির জনকের একটি দণ্ডায়মান মূর্তি। আশ্চর্য! দেশ এতটা এগিয়ে গেল, মানুষ পৌঁছে গেল মঙ্গলগ্রহে অথচ জাতির-জনক আজও 'নট-নড়ন-চড়ন, ঠক্‌সই'! অর্ধনগ্ন ভদ্রলোকটি অর্ধশতাব্দী কালের ভিতরেও ঐ কাঁটাগাছের ঝোপটা ডিঙিয়ে যেতে পারলেন না!

এতক্ষণে বাড়ির কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে—'হোম, সুইট হোম'! সাত নম্বর 'মিডলক্লাস ডর্মিটারি'তে ওরা থাকে। যার বাঙলা নাম 'মধ্যবিত্তের যৌথাগার!' বেলেঘাটার একতলা বাড়িটা ভেঙে যখন সুপারমার্কেট তৈরী হল—ওর বিয়ের ঠিক পরেই—তখন এই ডর্মিটরিতে ওরা ঠাঁই পেয়েছিল। শহরে দু-এক-তলা পুরানো বাড়ি এখন হাতে গোণা যায়। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে সরকার কলকাতায় স্কাইস্ক্র্যাপার তুলেছেন। এককালে এ জায়গাটার নাম ছিল প্যারেড-গ্রাউণ্ড। কারা নাকি কুচকাওয়াজ করত ওখানে। সে কোন প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা। তবে ছেলেবেলায় ঐ-মাঠে সে বক্তৃতার আয়োজন হতে দেখেছে—রাজধানী থেকে কোন বড়

কর্তা বা তাদের পুত্র-কন্যারা এলে ঐ মাঠে বক্তৃতা দিতেন। লক্ষ লক্ষ মানুষ জমায়েত হয়ে শুনত। জমিটা তখন ছিল মিলিটারীর এক্তিয়ারে। ডিহি-কলকাতায় ঠাসাঠাসি বাড়ি উঠেছে কিন্তু দু-তিন শ' বছর ধরে ঐ ফাঁকা মাঠে হাত পড়েনি। জনতার চাপ অস্বাভাবিক ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এখন বাধ্য হয়ে এখানেই গড়ে তোলা হয়েছে মধ্যবিত্তের যৌথাগার। এক মৌচাকে যদি লক্ষ মৌমাছি থাকতে পারে তবে এক বাড়িতে লক্ষ মানুষই বা থাকতে পারবে না কেন? মৌমাছিই তো এ যুগের আদর্শ। 'মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি নাচি?' মৌমাছির দাঁড়াবার সময় নেই। তাই তো ও-বাড়ির মৌ-ভাণ্ডারের নাম—মধুকক্ষ।

প্রকাণ্ড বাড়ি। এক একটা ত্রিশতলা উঁচু। আকৃতি হুবহু এক। মৌচাকের প্রতিটি খোপ যেমন বৈশিষ্ট্যহীন—রেগুলার হেক্সাগন, এখানে তেমনি প্রতিটি বাড়ি ইংরাজী Y-অক্ষরের মত। দুটি প্রসারিত বাহু বাড়িয়ে যেন মানব-সভ্যতাকে আলিঙ্গন করতে চাইছে। Y-অক্ষরের সামনের দিকের দুটি বাহুর শেষপ্রান্তে পাঁচ মিটার ব্যাসের দুটি প্রকাণ্ড সাঙ্কেতিক চিহ্ন। নিয়ন-আলোয় ঝলমল করছে। একটিতে বৃত্তের নিচে যোগচিহ্ন; দ্বিতীয়টিতে বৃত্তের মাথায় তীর চিহ্ন। প্রথমটি প্রমীলারাজ্য, দ্বিতীয়টি পুরুষদের। মাঝখানের অংশটায় সব যৌথ ব্যবস্থাপনা—তার শেষ প্রান্তে আর বৃত্ত নেই, প্রকাণ্ড একটি সমবাহু ত্রিভুজ, রক্তবর্ণের, যার শীর্ষবিন্দু মেদিনীর দিকে। সেখানে আছে ক্যান্টিন, বাজার, স্নানাগার, শৌচাগার, 'ক্রেশ' এবং মৌচাকের মধু ভাণ্ডার—ঐ 'মধুকক্ষ'। রাত ন'টার পর এ পাড়ার মানুষ ও পাড়ায় যেতে পারে না, ও-পাড়ার মানুষ আসতে পারে না এ পাড়ায়। প্রয়োজনে অনুমতি নিয়ে ঐ মাঝের অংশে তখন দেখা সাক্ষাত চলতে পারে।

চন্দ্রজয় সাইকেল-স্ট্যাণ্ডের চিহ্নিত খোপে সাইকেলটা রেখে তালাবন্ধ করল। প্লাস্টিক টিকিটটা পাঞ্চ করিয়ে স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌ট-

এর সামনে এসে দাঁড়ায়। বাইশ তলার পাঁচ-নম্বর ডর্মিটারিতে ওর 'সুইট-হোম'! আলোকিত করিডরটা পার হয়ে ও এসে দাঁড়ালো ওর দরজায়। ঢুকল হল-কামরায়। প্রকাণ্ড বড় সেটা। মাঝখান দিয়ে সরু-সরু গলি-পথ। গলি-পথের এক-এক দিকে তিন থাক বিছানা। থ্রি-টায়ার রেল-কামরার মতো। ওদের সংসার তিন-থাকের—১৬১৭ থেকে ১৬১৯। গৃহিণীহীন এই তিন-থাক বিছানাই ওদের গৃহমুচ্যতে। চন্দ্রকান্তবাবু বৃদ্ধ—ষাটের কোঠায়, তাই একতলায় থাকেন। দ্বিতলের শয্যাটি ওর ছোটভাই টুবলুর; তিনতলার বিছানাটা ওর 'মাস্টারস্ বেডরুম'। জুতো-জোড়া খুলে হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দেওয়ালে-গাঁথা এ্যালুমিনিয়ামের ধাপ বেয়ে ও উপরে উঠে উঠে যায়। চন্দ্রকান্ত অঘোরে ঘুমাচ্ছেন। মশা নেই, মশককুল নির্বংশ —দেশ এগিয়ে চলেছে। তাই মশারীও নেই। ফ্যান আছে, তবু প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরম। চন্দ্রকান্ত খালি গায়ে লুঙ্গি পরে শুয়েছেন, টুবলুর পরণে শুধু একটি আণ্ডারওয়্যার। নিঃশব্দে নিজের খাটে পৌঁছে চন্দ্রজয় দেওয়ালে-গাঁথা লকারটা চাবি দিয়ে খুলে ফেলে। খাটে বসে বসেই প্যাণ্ট-সার্ট-মোজা খুলে পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে নিল। জুতো-জোড়াও লকারে তুলে রেখে চপ্পল-জোড়া পরে নিল। একবার চোখ বুলিয়ে দেখে নিল চারি ধার। সারি সারি মানুষ ঘুমাচ্ছে। মানুষ, মানুষ আর মানুষ। মধ্যবিত্ত মানুষ। ছয় থেকে সত্তর-আশি। সব পুরুষ। ছয়ের কম হলে তারা থাকে মায়ের কাছে অথবা বেওয়ারিশ হলে 'ক্রেশ্'-এ। এক-এক সারিতে, লম্বার দিকে একশ'টি শয্যা, এমন ছয়টি সারি আছে এই হল-কামরায়। তাহলে কত মানুষ হল? আঠার শ'! বাব্বাঃ! ভ্যাপ্সা গরম তো হবেই।

যতই নিঃশব্দ-চরণে নামবার চেষ্টা করুক না কেন এবার ঘুম ভেঙে গেল চন্দ্রকান্তের। বস্তুতঃ তিনি ঘুমান নি আদৌ। মিটকি মেরে পড়েছিলেন। চন্দ্রজয় নামতেই বললেন, এত রাতে আবার কোথায় যাচ্ছিস! শুয়ে পড়গে যা!

আপাদমস্তক জ্বলে যায় চন্দ্রজয়ের। বুড়ো মানুষ ঘুমাচ্ছ, ঘুমাও না বাপু! এত টিক্‌টিক্ করা কেন? মুখে বললে, যা ভ্যাপ্‌সা গরম, বারান্দায় গিয়ে বসি একটু।

—ও বারান্দা! আমি ভাবছিলুম······

চলতে শুরু করেছিল চন্দ্রজয়। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। বলে, কী ভেবেছিলে তুমি?

সে কথার জবাব না দিয়ে চন্দ্রকান্ত বললেন, তোর হাতে ওটা কিসের প্যাকেট রে? খাবার?

একটা কঠিন জবাব মুখে এসেছিল চন্দ্রজয়ের। বুড়ো হয়ে মরতে চলেছে তবু খাবার লোভ গেল না। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। দাঁতে দাঁত চেপে হন্‌হনিয়ে বেরিয়ে গেল এ নরককুণ্ড ছেড়ে।

চন্দ্রকান্ত উঠে বসলেন। লকার হাৎড়িয়ে বিড়ি আর লাইটারটা বার করলেন। হল-কামরার বড় ঘড়িটার দিকে একবার চোখ তুলে দেখলেন—রাত দুটো বাজতে দশ। বাবু এই শেষ রাতে বউ-এর জন্যে খাবারের প্যাকেট নিয়ে অভিসারে চলেছেন! কী ছিল প্যাকেটটায়? অনেক রকম খাবারের নাম মনে এল—যা এখনও দোকানে কিনতে পাওয়া যায়। যার স্বাদ আর গন্ধ বিস্মৃতির উজান ঠেলে এখনও ওঁকে চনমন করে তোলে। মনে পড়ল ওঁর নিজের যৌবনের কথা। কত সালে যেন ওঁর বিয়ে হয়েছিল? সালটা মনে নেই—সেই যেবার তাশখণ্ডে শাস্ত্রীজী মারা গেলেন; তা বছর ত্রিশেক হবে। উনি নিজেও প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন অন্নপূর্ণাকে। দেখা হত পথে, পার্কে, রেস্তোরাঁয়। তখনও কফি-হাউসে কফি পাওয়া যেত। যন্ত্রের গলা টিপে নয়, তক্‌মা-আঁটা বেয়ারারায় সার্ভ করত। স্যাঙ্গুভ্যালীতে পাওয়া যেত মোগলাই পরোটা। সে-সব বস্তুর নামই তো শোননি তোমরা—আজকালকার ছেলেমেয়েরা। এখন তোমরা কিউ দিয়ে ক্যালরি-ট্যাবলেট কেন। মোগলাই পরোটা কাকে বলে জানবে

কেমন করে। শোন বলি। সাদা-ময়দার নাম শুনেছ? তাই দিয়ে তাল বানিয়ে, লেচি পাকিয়ে হাতে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বানাতো। ঐ যেখানে আজ বউবাজার টিউব-রেলের সাবওয়ে স্টেশান হয়েছে, ওখানেই ছিল সেই সাঙ্গুভ্যালীর দোকান, যেখানে ক্লাস পালিয়ে চন্দ্রকান্ত নিয়ে যেতেন অন্নপূর্ণাকে। কাচের পার্টিশানের ওপাশে বসে দেখা যেত কারিগর কী-ভাবে হাতের কায়দায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পরোটা বানাচ্ছে। ক্ষিদে বেড়ে যেত তাতে। ওতে থাকত মাংসের কুচি, ডিমের গোলা···! মনে পড়ে গেল অনেক অনেক দিন আগেকার কথা। তখনও চন্দ্রজয় জন্মায় নি। বিয়ের কিছু দিন পরেই—না, কিছুদিন পরে কেন, ঠিক এক বছর পরে। ওঁর প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী সেটা। উনি আর অন্নপূর্ণা গিয়েছিলেন ঐ সাঙ্গুভ্যালীতে। বাড়িতে মিথ্যে করে বলেছিলেন—বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ আছে! বড়খোকার প্যাকেটে আজ কী ছিল? মোগলাই পরোটা নয় তো? সে জিনিস আজও বিক্রি হয় কলকাতায়?

বিড়িটা শেষ হয়ে গেছে। ফেলে দিলেন। বিড়ির ধোঁয়ায় মনটাও এতক্ষণে একটু নরম হয়েছে। ও বেচারিরই বা দোষ কি? মাঝ রাতে ও তো আর বেশ্যা পাড়ায় যাচ্ছে না। যাচ্ছে নিজের বিয়ে করা বউয়ের কাছে। বেলেঘাটার বাড়ি হলে অন্নপূর্ণা নিশ্চয় চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠতেন—তুমি ঘুমাও তো! বিয়ে দিয়েছ ছেলের, জোয়ান-বেটা, জোয়ান বেটা-বউ—বছর ঘোরে নি!

বছর ঘোরে নি! তাই তো। আজই না বছর ঘুরে এল। মনে পড়ে গেল ওঁর—আজই খোকার প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী! আহা খাক! দুজনে যদি ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া মোগলাই পরোটাই খেতে চায় তো খাক, উনি লোভ করবেন না। কী পেল ওরা? কী পাচ্ছে? আর চন্দ্রকান্ত বসে বসে ওদের অন্নে ভাগ বসাচ্ছেন! এভাবে বেঁচে থাকার কী অর্থ?

না, কোন অর্থ হয় না। অনেক দিন ধরেই কথাটা ভাবছেন।

সাহস সঞ্চয় করে উঠ্‌তে পারছেন না। সুবোধবাবু পারলেন, মহেন্দ্র-বাবু পারলেন, তিন-নম্বর সারির সেই নাম-না-জানা বিহারী ভদ্রলোকও পারলেন। শেষ-বেশ বিদায় নিলেন কালিচরণবাবু। গতমাসে। অধ্যাপক কালিচরণ দত্ত ছিলেন ওঁর অন্তরঙ্গ বন্ধু। এই ডর্মিটারীতেই আলাপ। অঙ্কের অধ্যাপক। পাশের খাটেই থাকতেন। পণ্ডিত ব্যক্তি। শিক্ষা-দীক্ষায় দু-বন্ধুর মিল নেই। অঙ্কের অধ্যাপক নাস্তিক, তা হোক, লোক ভালো। তিনিও গতমাসে মনস্থির করে চলে গেলেন 'চিরশান্তি ভবনে।' তখন থেকেই মনস্থির করেছেন। এবার ওঁকেও যেতে হবে। শুধু সাহস করে কথাটা বলতে পারছেন না অন্নপূর্ণাকে। কেঁদে কেটে অনর্থ করবে। নাঃ! গেলে, না বলেই যেতে হবে। যেমন করে গেলেন ঐ সুবোধবাবু, মহেন্দ্রবাবু এবং শেষ-বেশ কালিচরণ।

কালিচরণ অবশ্য একেবারে না বলে যান নি। সংকল্পটা জানিয়ে গিয়েছিলেন একমাত্র বন্ধুকে। ওঁকেই। প্রথমটায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন চন্দ্রকান্তঃ কী বলছেন মশাই? আপনার কিসের দুঃখ? আপনি কেন আত্মহত্যা করবেন?

—আত্মহত্যা তো করছি না, চিরশান্তি ভবনে যেতে চাইছি।

—ও তো একই কথা!

—না, এক কথা নয়। গলায় দড়ি দেওয়া, আর্সেনিক খাওয়া বা গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়াটা বে-আইনি ; চিরশান্তি ভবনের ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আইনসঙ্গত!

—বেশ। না হয় তাই হল। তবু সেখানে কেন যেতে চাইছেন?

ম্লান হেসেছিলেন কালিচরণঃ বেঁচে থেকেই বা কী লাভ চন্দ্রকান্তবাবু? এভাবে বেঁচে থেকে? দুনিয়াদারী তো অনেকদিন হল। দুনিয়ার ভার একটু হাল্‌কাই না হয় করে দিলাম। বসে বসে ওদের সর্বনাশ করে কি হবে?

'ওদের' বলতে ওঁর মেয়ে এবং নাতি। কালিচরণ বিপত্নীক।

একটি ছেলে—পৃথিবীতে নেই! না, মারা যায়নি, আছে 'লুনার বেস'-এ। লুনোলজিস্ট। চাঁদে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তার আর সহ্য হয় না। বাড়ি আসে না। একটি মেয়ে, বিবাহ দিতে পারেন নি; মানে বিয়ে করে নি। দুটি সন্তানকে মানুষ করতে মেয়েটি হিমসিম্ খেয়ে যাচ্ছে। তারই উপার্জনে চলে সংসার। মেয়ে থাকে পাশের উইং-এ। তাই অনেক চিন্তা করে কালিচরণ এই সিদ্ধান্তে এসেছেন।

চন্দ্রকান্ত বলেছিলেন, নামটা অনেকদিনই শুনেছি। ভাসাভাসা ধারণাও আছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি? ঐ 'চিরশান্তি ভবন'?

—ব্যাপার কিছু নয়। প্রথমযুগে ওটা স্থাপিত হয়েছিল অন্য উদ্দেশ্যে। ক্যান্সার-ইন্সটুটের কল্যাণে। তারপর মেডিক্যাল-সায়েন্স এ থিয়োরিটা ব্যাপকভাবে মেনে নিল। ক্যান্সার প্রভৃতি রোগে ডাক্তারে যখন আশা ত্যাগ করতেন তখন রুগীকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হত। বণ্ডে সই করে রুগী ইচ্ছামৃত্যু বরণ করত। খাতা-কলমে আইনটা আজও তাই আছে—তবে ইদানিং যে ব্যাধিতে ওখানে প্রার্থীর ভীড় হচ্ছে সে ব্যাধিটার নাম 'দারিদ্র্য' ও 'অনাহার'। খাতায় কী লেখা হয় জানি না। জন-সংখ্যা বৃদ্ধির চাপ এত প্রচণ্ড যে, কর্তৃপক্ষ বোধকরি আপত্তির কারণ দেখেন না। আফটার অল্ লোকটা তো 'স্বেচ্ছায়' বণ্ডে সই করেছে!

—কিন্তু ওরা কী ভাবে ইয়েটা করে?

—'ইয়েটা' কেন চন্দ্রকান্তবাবু? সঙ্কোচ কিসের? কথাটা 'নরহত্যা'! আপনি ভুলে যাচ্ছেন এটা হত্যা নয় ইচ্ছামৃত্যু। আর ভুলে যাচ্ছেন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির চাপটা কী প্রচণ্ড হয়েছে! ভেবে দেখুন না, 'ভ্রূণহত্যা' জিনিসটা তো বিশ বছর আগেই আইনসঙ্গত হয়েছিল, ভ্রূণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামৃত্যু না হওয়া সত্ত্বেও। অজাত শিশুকে এই পৃথিবীর রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ আমন্ত্রণ জানাচ্ছিল—তবু তাকে আমরা আসতে দিইনি। যতদূর মনে পড়ছে এদেশে

বোধহয় ১৯৫৫ সালে আইনটা বিধিবদ্ধ হয়েছিল। বিশ বছর আগে যদি বর্তমানের খাতিরে ভবিষ্যৎকে আমরা হত্যা করে থাকতে পারি—তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে; তাহলে আজ এই চরম অবস্থায় বর্তমানের স্বার্থে অতীতকে হত্যা করতে পারব না?—বিশেষ সে যদি স্বেচ্ছায় সরে যেতে চায়?

চন্দ্রকান্ত বলেন, না, আমি মানে 'প্রসেস্‌টা' জানতে চাইছিলাম। মানে কী ভাবে—

—শুনেছি ঘুমের মধ্যে অজান্তে মৃত্যু আসে। প্রাণ কী তা আমরা জানি না, সজীব প্রাণী জড় পদার্থে রূপান্তরিত হওয়ার মুহূর্তে যদি অনিবার্য যন্ত্রণার উদ্রেক করে···যাকে বলি 'মৃত্যুযন্ত্রণা', তবে নিশ্চয় তা হয়; কিন্তু যন্ত্রের কাঁটায় তা পরিমাপ করা যায় না। তাই ওঁরা বলেন, ঘুমের মধ্যেই শান্ত মৃত্যু ঘনিয়ে আসে।

তারপর চন্দ্রকান্তবাবুর দিকে তাকিয়ে অধ্যাপক মশাই বুঝেছিলেন, ছাত্র এ জাতীয় জবাব চায় না। তখন যোগ করেছিলেন—শেষ তীর্থযাত্রীকে ওরা স্নান করিয়ে দেয়। ক্ষুধার্ত থাকলে খেতেও দেয়—তার পছন্দ মত খাবার; (ফাঁসীর আসামীর মত, কিম্বা বলির আগে নবমীর পাঁঠাকে কিছু কচি কাঁঠালপাতা খাওয়ানোর মত) তারপর তাকে একটি মাল্‌টি-স্ক্রিন ছোট্ট অডিটোরিয়ামে ইজিচেয়ারে শুইয়ে দেয়। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা, পিছনে ব্যাক-গ্রাউণ্ড মিউজিক—যে যেমন শুনতে চায়; বিলাতী অর্কেস্ট্রা থেকে রামধূন পর্যন্ত সবরকম টেপই আছে। আর সামনে তিন-মাত্রার পর্দায় স্টেরিও-ছবিতে নানান দৃশ্য ফুটে উঠে—মৃত্যুপথ যাত্রীর মনে হয়—সে যেন ঐ রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে অন্যতম কুশীলব।

—কী জাতীয় ছবি?

—যে যেমন চায়—কেউ দেখে জেরুসালেমে বড়দিনের উৎসব, কেউ দেখে মক্কাসরিফে জুম্মার নমাজ, কেউ বা বিশ্বনাথের শয়নারতি।

ইতস্তত করে চন্দ্রকান্ত বলেছিলেন, আপনি কী দেখতে চাইবেন?

—আমি? আমি নিতান্ত নাস্তিক। শুনেছি, ১৯৮৫-র সেই ঐতিহাসিক 'মার্স-ভায়া-ভেনাস' অভিযানের একটা ডকুমেণ্টারী আছে। সেটাই দেখতে চাইব।

—বলেন কি মশাই?

—কেন নয়? স্পেস্ পড়ে চড়ে মহাকাশকে দেখার সৌভাগ্য তো আমার হল না। তা দুধের স্বাদ ঘোলেই মেটাই। আমার কাছে ঐ তারায়-ভরা আকাশটাই জেরুসালেম-মক্কাসরিক-কাশীধাম!

কালিচরণের একমাত্র পুত্র আকাশ পাড়ি দিয়েছে। ছেলে বাপের খোঁজ খবর নেয় না। সেই অভিমানেই কি তিনি পুত্রের উপর টেক্কা দিতে চাইছেন? চাঁদ ছাড়িয়ে দূরে, আরও দূরে যেতে চাইছেন?—ভাবলেন চন্দ্রকান্ত। মুখে বললেন, আর গান? গান কি শুনতে চাইবেন?

—বিটোফেন-এর 'ফিউনারাল মার্চ'!

আজব মানুষ! চন্দ্রকান্ত প্রসঙ্গ বদলে বলেছিলেন, কিন্তু মাধুরী মা কি—

—না! কিছুতেই না! মাধু-মাকে কিছু জানিয়ে যাওয়া যাবেনা···চন্দ্রকান্তের হাত দুটি চেপে ধরেছিলেন বৃদ্ধ অধ্যাপক। না, এই মুহূর্তটিতে তিনি বিজ্ঞানের নাস্তিক অধ্যাপক নন, সাবেক পিতৃহৃদয়ের প্রতিনিধি। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলেছিলেন, সে পাগলি জানতে পারলে কেঁদে-কেঁটে অনর্থ বাধাবে। কিছুতেই আমাকে যেতে দেবে না। মাধু-মা নয়, এমন কি বুবু-টুটুও নয়। কাউকে কিছু আগেভাগে জানানো চলবে না।

বুবু-টুটু ঐ বৃদ্ধের ভর্তৃহীনা কন্যার পিতৃপরিচয়হীন দুটি নাবালক। চন্দ্রকান্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, কাউকেই যখন জানাচ্ছেন না, তখন আমাকেই বা আগেভাগে এমন দগ্ধে গেলেন কেন মশাই?

—আপনাকে একটা কাজের দায়িত্ব নিতে হবে। আপনি একটু ওদের দেখাশোনা করবেন—ঐ বুবু-টুটুকে। ওদের মা তো সময়ই

পায় না। আমিই ছিলাম ওদের খেলার সাথী। আপনাকে পেলে ওরা হয়তো আমার অভাব কিছুটা ভুলবে। আপনার তো নাতি-নাতনি কোনদিনই হবে না।

অন্তরঙ্গ বন্ধুকে চন্দ্রকান্ত নিজের সংসারের কথা সব বলেছিলেন। সব শুনে অধ্যাপক-মশাই যে প্রতিপ্রশ্নটা করেছিলেন, সেটা আজও কাঁটা হয়ে বিঁধে আছে ওঁর মনে। কালিচরণ প্রশ্ন করেছিলেন, "আর য়ু শিওর? নমিতা স্বেচ্ছায় টিউবক্‌টমি অপারেশন করায় নি? আপনার সংসারে ঢুকতে?"

—আর একটা অনুরোধ! বুবু-টুটু বড় হলে ওদের ঐ শকুনির উপাখ্যানটা শুনিয়ে দেবেন মহাভারত থেকে।

চন্দ্রকান্ত সলজ্জে বলেছিলেন, শকুনির কোন উপাখ্যান? মহাভারতটা আবার আমার ভালমত পড়া নেই।

কালিচরণ সংসারাশ্রমে অধ্যাপনা করতেন। ছাত্রের এ স্বীকৃতিকে বিরক্ত হলেন না। শকুনির উপাখ্যানটা শুনিয়ে দিলেন বন্ধুকে।

শকুনির পিতৃদেব স্ববলরাজ সপরিবারে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন কৌরব কারাগারে। কুরু-নৃপতির আদেশে বন্দী-শালার রক্ষক দশটি প্রাণীর জন্য দৈনিক একমুষ্টি তণ্ডুল রেখে যেত। শকুনিরা আটভাই, তার উপর বৃদ্ধ বাবা-মা। একমুষ্টি চালে কী হবে? প্রত্যেকের মৃত্যুই অবধারিত। শকুনির পিতৃদেব সবাইকে ডেকে বললেন, তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ—কুরুরাজ ইচ্ছা করলেই আমাদের সম্পূর্ণ অনাহারে রেখে মারতে পারত। কিন্তু তা কেন করল না, বলতে পার?

কেউই কোন জবাব দিতে পারল না। বৃদ্ধ তখন বললেন, এ একটা পৈশাচিক পরিকল্পনা! ও জানে, ঐ একমুষ্টি তণ্ডুলেও আমরা সবাই মরব। কিন্তু কী ভাবে? আমি সন্তানের মুখ থেকে অন্ন কেড়ে খেতে গিয়ে মরব—আর তোমরা অনাহারক্লিষ্ট ভাইয়েরা

পরস্পরের উচ্ছিষ্ট নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে করতে মরবে। এই পৈশাচিক ব্যবস্থা তোমরা মেনে নেবে ?

শকুনি বলেছিল, পিতঃ! আপনি সব সময়ে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। বলুন, কী ভাবে আমরা এ দুর্দৈবকে অতিক্রম করতে পারি।

—বলছি! আমরা সবাই এ দুর্দৈবকে অতিক্রম করতে পারব না। তবু আমরা সংকল্পবদ্ধ হলে প্রতিশোধটা নিতে পারি। আমরা নয়জন স্বেচ্ছামৃত্যু বরণ করব অনাহারে। সেটা কঠিন নয়, তার চেয়ে কঠিন কাজ হবে দশম জনের। নিকটতম আত্মীয়ের অনাহার-জনিত মৃত্যু স্বচক্ষে দেখেও তাকে ঐ একমুষ্টি ভিক্ষান্ন আহার করে বেঁচে থাকতে হবে। প্রত্যেকটি মৃত্যুপথ-যাত্রীকে তাকে শেষ আশ্বাস দিতে হবে—এর প্রতিশোধ সে নেবে। কুরুরাজের বংশকে সে নির্বংশ করবে—ঐ একই নারকীয় পরিকল্পনায়। তারা যেন ভাইয়ে-ভাইয়ে কামড়া-কামড়ি করে নির্বংশ হয়! বল, কে সেই দশম জন হতে স্বীকৃত ? কে বেঁচে থাকতে রাজী আছ ?

একে একে সবাই অধোবদন হল। শেষে শকুনি বললে—আপনি আশীর্বাদ করুন, মহাভাগ! আপনাদের রক্তের ঋণ যেন আমি পরিশোধ করতে পারি।

বৃদ্ধ তাঁর পাঁজর-সর্বস্ব বুকে ওকে টেনে নিয়ে বলেছিলেন, তুমিই পারবে শকুনি! শোন, আমার অনাহার-মৃত্যুর পরে আমাকে সংকার কর না। আমার বুকের পাঁজর ছিঁড়ে নিয়ে পাশা বানিও। বৈরী-নির্যাতনের যে বাসনা নিয়ে আমি মরছি, তা আমার বুকের পাঁজরে লুকিয়ে থাকবে। পাশা তোমার ডাক শুনবে! কুরুকুল ধ্বংস করবে!

বলতে বলতে হু-হু করে কেঁদে ফেলেছিলেন বৃদ্ধ। না, শকুনির বৃদ্ধ পিতা দুঃসহের কথা বলছি না। মাধুরীর পিতৃদেব। চন্দ্রকান্তের হাত দুটি ধরে বলেছিলেন, বুবু-টুটুকে বলবেন, ওদের বুড়ো দাদুর পাঁজরও ওদের ডাক শুনবার জন্য প্রতীক্ষা করবে! যারা আমাদের

এই কারাগারে ফেলে রেখেছে—অনাহারের বদলে একমুঠি করে ক্যালরি-ট্যাবলেট দিচ্ছে সেই কুরুরাজদের যেন ওরা ক্ষমা না করে!

চন্দ্রকান্ত বিহ্বল হয়ে বলেছিলেন, কিন্তু কুরুরাজটা এখানে কে?

ম্লান হেসেছিলেন অঙ্কশাস্ত্রের অধ্যাপক। বলেছিলেন, অঙ্কটা শক্ত চন্দ্রকান্তবাবু; আপনি-আমি অঙ্কটা কষতে পারিনি। আমরা বোকা ছিলাম। ওরা নতুন যুগের মানুষ। ওরা ঠিক তাদের খুঁজে বার করবে। কড়া-ক্রান্তিতে তখন ওরা শোধ নেবে। আমাদের রক্তের ঋণ। আমার। আপনার!

আমার, আপনার! কালিচরণ কি যাবার আগে বুঝতে পেরেছিলেন যে, চন্দ্রকান্ত ওঁরই পদাঙ্ক অনুশরণ করবেন?

উপহারের প্যাকেট-হাতে চন্দ্রজয় এসে পৌঁছালো 'মধুকক্ষের' সামনে।

প্রতিটি তলাতেই আছে এ ব্যবস্থা। ঐ Y-অক্ষরের কেন্দ্রীয় অংশে। স্থানাভাবে স্ত্রী-পুরুষদের পৃথক করে রাখতে হয়েছে; তবু জৈবিক নিয়মে তাদের কাছাকাছি আসতে দিতে হয়। ফুটপাথে যারা রাত কাটায়, তাদের ব্যাপারে না হয় চোখ বুঁজে থাকা যায়—এরা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর, বুদ্ধিজীবী। কুকুর-বেড়াল নয়।

প্রথমেই বেশ বড় একটি অপেক্ষাগার। আলো-আঁধারি। নীল আলোয় পথটা আবছা দেখা যায়। ঘরের এখানে-ওখানে জোড়ায় জোড়ায় মানুষ! দূরতম প্রান্তে একটি টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। সেখানে বসে আছে ওয়ার্ডেন। তারা দু-জাতের—পুরুষ ও মহিলা। চন্দ্রজয়ের এমন বরাত—যেদিনই আসে, দেখে মহিলা পরিচালিকা। আজও তাই। দুরু দুরু বুকে ও এগিয়ে গেল মহিলাটির দিকে। গলাটা সাফা করে বললে, একটা ফর্ম দেবেন?

মহিলাটি—মেয়েই বলা উচিত, কতই বা বয়স হবে ওর? নমুর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় হতে পারে। একটা স্লিভ-লেস্ বুশসার্ট

আর বেলবট্‌ম্ ফুল-প্যাণ্ট পরে বসে বসে পড়ছিল একটা পেপার-ব্যাক। বই থেকে চোখ না তুলেই বললে, 'পি' না 'সি' ?

'পি'-অর্থে প্রাইভেট—এবং 'সি' অর্থে কম্যুনিটি। প্রথমটি জনান্তিক কক্ষে, দ্বিতীয়টি সর্বসমক্ষে আব্‌ছা-আলোয়—হল ঘরে। চন্দ্রজয় বললে, 'পি'।

মেয়েটি কবুতর-খোপ থেকে আবেদনের ফর্মটা বার করতে করতে বললে, আজ ভীড় আছে কিন্তু। 'পি' লাইন পেতে দেরী হবে। 'সি' হলে তাড়াতাড়ি হত।

চন্দ্রজয়ের ইচ্ছা করছিল মেয়েটির এনামেল-করা গণ্ডদেশে সপাটে একটি চড় কষাতে। পরিবর্তে অতি মোলায়েম গলায় বললে, কতটা দেরী হবে একটু আন্দাজ দিতে পারেন ?

—কি ? 'সি' না 'পি' ?

মেয়েটা কি সুযোগ বুঝে ওর পা-টানছে ? দাঁতে দাঁত চেপে চন্দ্রজয় বললে, 'পি'।

—অর্ডিনারী, আর্জেণ্ট না লাইটনিং ?

এ-কথার জবাব দিল না চন্দ্রজয়। নিঃশব্দে উপহারের প্যাকেটটা খুলে এক প্যাকেট ক্যাডবেরি চকলেট নামিয়ে রাখল মেয়েটির টেবিলে। এতক্ষণে মেয়েটি চোখ তুলে চাইল। ওর ভ্যানিটি ব্যাগটা একবার খুলল ও তৎক্ষণাৎ বন্ধ হল। হাসল। যেন কতই অন্তরঙ্গ, প্রশ্ন করল, কতদিন বিয়ে হয়েছে ?

উপায় নেই। ওরই হাতে চাবি কাঠি। দেঁতো হাসি হেসে বললে, এক বছর। ইন ফ্যাক্‌ট, আজই আমাদের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকী! বুঝতেই পারছেন!

মেয়েটি কটাক্ষ করে মোহিনী হাসি হাসল আবার। বললে, সরি! বুঝতে পারছি না। আমার বিয়েই হয়নি। এনি হাউ! লাইটনিঙে বড্ড খরচ—ও আপনার পোষাবে না। আপনি অর্ডিনারি চার্জই দিন, আমি আর্জেণ্ট বুক করে দিচ্ছি। বেশী দেরী হবে না।

আপনার আগে আর বারো 'পেয়ার' আছে!

বারো-জোড়া দম্পতি! তার মানে তো ছয় ঘণ্টার ধাক্কা! ওর দিকে তাকিয়ে মেয়েটা এবার স্পষ্ট চোখ টিপল। বললে, কী ভাবছ? আধঘণ্টা হিসাবে ছয় ঘণ্টা? না, তা নয়, ঘর আছে পাঁচটা। ভাগ্যবতীর নামটি কি বলবে?

মাগী অনায়াসে 'তুমি'তে নেমে এসেছে! কী চায় ও? চকলেট তো ভ্যানিটি-ব্যাগ জাত করেই ফেলেছে! চন্দ্রজয় এবার গম্ভীর হল। বললে, সে তো আবেদন পত্রেই লেখা আছে!

—তা আছে! মনে মনে জপ করছ, না হয় মুখেই একবার বললে!

তারপর দরখাস্তের উপর চোখ বুলিয়ে বললে, ডর্মিটারি তিন, সীট ১৬১২। নামটা কী? বসুচার? নমিতা বসুচার! বসুরায়, বসুমল্লিক উপাধী হয়, 'বসুচার' উপাধি তো কখনও শুনিনি?

চন্দ্রজয় বললে, 'বসুচার' নয়—নমিতা বসু নং ৪। ওদের ডর্মিটারীতে পাঁচজন নমিতা বসু আছে। এর আগে একবার অন্য এক ভদ্রমহিলা এসে হাজির হয়েছিলেন।

খিলখিলিয়ে হেসে উঠ্‌ল প্রগল্‌ভা মেয়েটি। লিপ্‌স্টিক বার করে হাত-আয়নায় ঠোঁট মেরামত করতে করতে বললে, তারপর?

—তারপর কি?

—মানে গল্পটা শেষ হল কই? সে রাত্রে ভ্রমটা তোমরা সংশোধন করালে, নাকি—'পড়ে-পাওয়া-চৌদ্দ-আনা' দুজনেই মেনে নিলে?

এবার আর চড় নয়, চন্দ্রজয়ের ইচ্ছা করছিল দেওয়ালে ওর বব্‌করা মাথাটা ঠুকে দেয়।

ইতিমধ্যে আর একজন দরখাস্তকারী এসে হাজির হওয়ায় মেয়েটি সংযত হল। টেলিফোন তুলে নিয়ে তিন নম্বর ডর্মিটারিতে খবরটা জানালো। চন্দ্রজয় ফি-জমা দিয়ে এসে বসল প্রতীক্ষাগারে। ঘরটা বেশ বড়। একটু দূরে দূরে দ্বৈত আসন পাতা। জোড়ায়

জোড়ায় অপেক্ষা করছে নানান বয়সের, নানান জাতের দম্পতি। ওরা যেন ট্রাঙ্ক-কল বুক করে প্রতীক্ষারত, কিম্বা ডাক্তারের চেম্বারের সামনে ওয়েটিং-হলের রুগী। মাঝে মাঝে ডাক আসছে। এক-এক জোড়া ভিতরে চলে যাচ্ছে। পর্দার ও প্রান্তে। চন্দ্রজয় জানে, ওখানে পাশাপাশি শয়নকক্ষ। দ্বৈতশয্যার ছোট-ছোট খুপরি। ওখানে ওদের মেয়াদ আধঘণ্টা। পঁচিশ মিনিট পরেই একটা সুরেলা আওয়াজ হবে। তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে তৈরী হয়ে উঠ্‌তে না পারলে চরম বিড়ম্বনা। যান্ত্রিক দরজা আপনিই খুলে যাবে এবং সেই উন্মুক্ত দ্বারপথে দেখা যাবে কিউ-এর পরবর্তী দম্পতিকে!

পাঁচ মিনিটের মধ্যেই নমিতা এসে হাজির। ওকে দেখলেই বোঝা যায় ঘুম থেকে উঠে আসেনি আদৌ। জেগেই বসেছিল এতক্ষণ। প্রসাধন নিখুঁত। নমিতা সেই শিফনটা পরেছে। চন্দ্রজয় ওটা পছন্দ করে কিনে দিয়েছিল বেলেঘাটার সুপারমার্কেট থেকে। এসেই ঝুপ করে বসে পড়ল ওর কোল ঘেঁসে। চন্দ্রজয় বললে, এতরাত পর্যন্ত জেগে বসেছিলে কেন? একঘুম দিয়ে নিলেই পারতে?

—ঘুমাচ্ছিলামই তো!

—বটে! অথচ টিপটা পর্যন্ত ধেবড়ে যায়নি! শিফনের শাড়ি পরে ঘুমাচ্ছিলে?

নমিতা সে-কথার জবাব না-দিয়ে বললে, লাইন পেতে কত দেরী হবে গো? কী বললে বাড়িউলি মাগী?

অন্যসময় হলে চন্দ্রজয় হয়তো আপত্তি করত—নমুর এই অশালীন ভাষায়। প্রকারান্তরে নমু যে নিজেকেই অপমান করছে। ঐ ওয়ার্ডেন যদি হয় পতিতালয়ের প্রহরিণী, তবে তারা কী? চন্দ্রজয় বললে, বলছে তো দেরী হবে না। ওকে এক প্যাকেট চকোলেট খাইয়েছি! ক্যাডবেরি!

—চকোলেট! এক প্যাকেট বলকি!

—মৌফৎসে নয়। অর্ডিনারি চার্জ নিয়ে আর্জেন্ট বুক করে দিয়েছে।

—তাই বলে এক প্যাকেট ক্যাডবেরি চকলেট! আমার জন্যে এনেছিলে বুঝি! উঃ! কতদিন খাইনি! স্বাদই ভুলে গেছি!

চন্দ্রজয় প্যাকেটটা খুলে ফেলে। বলে, দু-প্যাকেট কিনে ছিলাম।

চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নমিতার। বলে, সবটা দিচ্ছ কেন? আর্ধেকটা তুমি নাও—

ওর হাতটা চেপে ধরে চন্দ্রজয়: এই! ও-ভাবে ভেঙ না!

ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে নমিতা। সে-ভাবে চকলেট ভেঙে ওরা আগেও খেয়েছে। বিয়ের আগে। তখনও ও জিনিস বাজারে পাওয়া অসম্ভব ছিল না। নমিতা দাঁত দিয়ে চকলেটের একপ্রান্ত ধরে রাখত···

বললে, কী বকছ পাগলের মত! এখানে একঘর লোক রয়েছে না?

—লোক! তারা কি আমাদের দেখছে? তাকিয়ে দেখ!

নমিতা আলো-আঁধারি হল-কামরার উপর একবার চোখটা বুলিয়ে নিল। আশ্চর্য! ওরা যেন ধরে নিয়েছে, ওরা অর্গলবন্ধ নির্জন ঘরের নবদম্পতি! যে-যার মত বিভোর। অন্ধকারে মুখ চেনা যায় না, তবে পুরুষ ও নারীকে পৃথকভাবে সনাক্ত করার মত আলো আছে ঘরে। ব্লাউসের মধ্যে ঘেমে ওঠে নমিতা। অস্ফুটে বলে—কেমন করে পারে গো ওরা?

চন্দ্রজয় হাসল: শালীনতার সংজ্ঞাটাও পরিবর্তনশীল। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা!

—কিন্তু তাই বলে এমন প্রকাশ্যে! মানুষ কি কুকুর-বেড়াল?

—কেন নয়? এ-ওর মুখের গ্রাস কেড়ে খেয়ে বেঁচে আছি। তুমি-আমি-আমরা সবাই। স্নেহ, প্রেম, মায়া-মমতা—এ-সব শব্দগুলো

অভিধানের বাইরে আজ দেখতে পাচ্ছ? আমরা তো পশুই হয়ে গেছি! পশু নয়, শকুনি! ভাগাড়ের শকুনি সব!

নমিতা বোধকরি ঠিক মেনে নিতে পারে না। বলে, মানুষের বাঁচবার ইচ্ছাটা আদিম। স্বার্থপরতা কোন যুগে ছিল না বল? 'আত্মানম্ সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি' শ্লোকটা যখন রচিত হয়েছিল তখন মানুষ দুবেলা ভাত খেত, ক্যালরি ট্যাবলেট খেত না। সে-কথা নয়, আমি ভাবছিলাম—'প্রেম', নরনারীর সম্পর্কের মাধুর্যটা বোধ হয় এমন কদর্য হয়ে দেখা দেয়নি কোন কালে!

চন্দ্রজয় প্রতিবাদ করে। বলে, কে বলল? তুমি রেমার্কের 'অল কোয়ায়েট' পড়েছ? সে তো সত্তর-আশি বছর আগেকার পৃথিবী। তাতে একটি দৃশ্য আছে—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আহত সৈনিকেরা এসেছে যুদ্ধ-ক্ষেত্রের বাইরের হাসপাতালে। সেখানে তাদের আত্মীয়-বন্ধুরাও দেখা করতে আসছে। নায়ক ক্যাট্‌কিন্‌স্কির এক বন্ধুর পত্নী এল দেখা করতে। ওর বন্ধুর পায়ে চোট লেগেছিল। দীর্ঘ দু-বছর পরে ওর তরুণ বন্ধু দেখা পেল তার যুবতী স্ত্রীর। অথচ বেচারি শুয়ে আছে জেনারেল-ওয়ার্ডে। অবস্থাটা সবাই বুঝল। তাদের মধ্যে একজন গিয়ে বসল খোলা দরজার সামনে পাহারা দিতে। আর সব আহত রুগী প্রতিশ্রুতি দিল দশ-মিনিট পিছন ফিরে শুয়ে থাকবে! বুঝলে?

একটা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নমিতার। বললে, বুঝলাম। কিন্তু আজ তাহলে আমরা কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি গো?

চন্দ্রজয় বললে, সেইটাই মস্ত বড় সমস্যা! ক্যাট্‌কিন্‌স্কি জানত—কে তার শত্রু। আমরা তাদের না পারছি নাগাল, না পাচ্ছি চিনতে!

অন্নপূর্ণারও ঘুম ভেঙে গিয়েছিল। টের পেয়েছিলেন, সাড়া-শব্দ দেননি। বৌমা লজ্জা পাবে। ঝি-কে বোধহয় টিপে রেখেছিল

বৌমা। হয়তো আগাম কিছু বকশিস্‌ও দিয়ে থাকবে। রাত দুটোর সময় সে নিঃশব্দে এসে বৌমাকে ডেকে দিয়েছিল। না, ডাকতে হয়নি। নমিতা জেগেই ছিল। ঝিটাকে এগিয়ে আসতে দেখেই হাত নেড়ে ইঙ্গিত করেছিল। নিঃশব্দে নেমে এসেছিল তিনতলার বিছানা ছেড়ে। অন্নপূর্ণা একতলায় শোন। মাঝের বার্থে থাকে মোতির-মা। নমিতা নিষ্ক্রান্ত হলে অন্নপূর্ণাও উঠলেন। অনেকক্ষণ ধরে তেষ্টা পেয়েছিল তাঁর, তবু উঠে বসেননি···পাছে বৌমা লজ্জা পায়। এবার উঠে জল গড়িয়ে খেলেন। বাথরুমে গিয়ে মুখে-মাথায় জল দিয়ে এলেন। বাবাঃ! কী গুমোট গরম! ফিরে এসে নিজের খাটে বসতেই দ্বিতল থেকে মোতির মা বললে, বৌমা এত রাতে কোথায় গেল গো সেজেগুজে?

ধমকে ওঠেন অন্নপূর্ণা: ঘুমাচ্ছ, ঘুমাও না। অত টিকটিক করা কেন?

মোতির-মা বলে, শাক দিয়ে আর মাছ ঢাকতে হবেনা গো। সবই বুঝি!

অন্নপূর্ণা জবাব দেন না। কথা বললেই কথা বেড়ে যাবে। আশ্চর্য! মোতির-মার জিহ্বায় এত বিষ আসে কোথা থেকে? সে তো জানে, নমিতা কোন পরপুরুষের কাছে যাচ্ছে না! বোধ করি মোতির-মায়ের রাগটা মহাকালের উপর! কেন তার যৌবন নেই! বিগতযৌবনার স্বাভাবিক ক্ষোভ। স্বাভাবিক? কই তাঁর তো এমন মনে হয় না! তাঁর বরং দুঃখ হয় ওদের কথা ভেবে। বেচারীরা কী পেল? কী পাচ্ছে? আজকের দিনটার কথা তিনি একতিলও ভোলেন নি। আজ এক বছর পূর্ণ হল। উনি জানতেন, আজ রাত্রে বৌমার ডাক আসবে। গত বুধবারের পর আর ডাক আসেনি। তার মানে আজ নিয়ে পাঁচদিন! পারবে কেন? কিন্তু খরচটাও তো কম নয়! রোজ রাতে যারা বৌকে কাছে পায় তারা এ ডর্মিটারিতে থাকে না। তারা উপরতলার মানুষ। তবু আজকের রাতটা যে

বিশেষ। বেলেঘাটায় থাকলে আজ হয়তো খোকা তার দু-একটি বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে আনত। আর কিছু না হ'ক বিস্কুট তো এখনও বাজারে পাওয়া যায়। হয় তো চা বিস্কুটেরই আয়োজন হত। তা হ'ক, তবু গান হত, গল্প হত, হৈ-হৈ করে ছুটির দিনটা ওরা কাটিয়ে দিত অভাবের সংসারে।

সন্ধ্যা রাত্রেই মনে হয়েছিল বৌমা ঘুর ঘুর করছে, বারে বারে দেখছে উনি শুয়ে পড়েছেন কি না! ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই ঘুমের ভান করে পড়ে থেকে মুখের উপর আড়াল-করা হাতের ফাঁক দিয়ে চুরি করে দেখেছিলেন—অভিসারিকার প্রসাধন পর্ব। সেই আকাশি-রঙের শিফনটাই লকার থেকে বার করে পরেছিল বৌমা। উনি ভেবেছিলেন, মুর্শিদাবাদীটা পরবে।

নিজের প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীটার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে কতদিন আগেকার কথা যেন? দাঁড়াও, হিসাব করে বলছি। খোকা হয়েছিল ওঁর বিয়ের দু-বছর পরে···সেই যেবার মানুষ প্রথম চাঁদে গেল। তাই তো ওর নাম রাখা হল চন্দ্রজয়। সেটা ১৯৫৫ নয়? তাহলে ১৯৫৫ সালের কথা। তার মানে গিয়ে দাঁড়ালো ছাব্বিস বছর আগেকার কথা। ও···মানে, উনি, উপহার দিয়েছিলেন এক জোড়া জরোয়া দুল। খোকা আজ কি উপহার দেবে? সোনার গহনা আর কোথা থেকে পাবে? সোনা তো প্রকাশ্যে কেনা-বেচাই হয়না। শাড়ি-টাড়ি দেবে নিশ্চয় একটা কিছু। কাল সকালেই টের পাবেন। বৌমা ফিরে এলে।

বেচারি বৌমা। বিয়ের আগেই নারী-জীবনের সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু কেন? ওঁরা যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন সেটা কি-জানি-কেন বিশ্বাস হয় না। বেহাই মশাই এসে বলেছিলেন দুর্ঘটনার কথাটা। তখনও অবশ্য তিনি বেয়াই হন নি। বলেছিলেন, হঠাৎ এ্যাপেণ্ডিসাইটিসের ব্যথা ওঠে। রাতারাতি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হল। তারপর ডাক্তারে পরীক্ষা করে

বললেন, শুধু এ্যাপেণ্ডিক্স অপারেশন করালেই চলবে না। ওর জরায়ুতেও নাকি কী একটা গণ্ডগোল দেখা গেছে। তখনই অপারেশন না করালে জীবন-সংশয়। কথাটা মেনে নিয়েছিলেন অন্নপূর্ণা; কিন্তু অন্তর থেকে বিশ্বাস হয়নি তাঁর। কিন্তু আর কী হতে পারে? ...না, না, তা অসম্ভব! নমিতা তখন কিছু ছেলেমানুষ ছিল না। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ওঁরা...সে অসম্ভব! হাজার হ'ক ওঁরা বাপ মা। টিউবক্‌টমি করালে অবশ্য নগদ প্রাপ্তিযোগ আছে; কিন্তু সে অপারেশন কে করায়? যার অন্তত দুটি সন্তান আছে! অবিবাহিতার সে অপারেশন হতেই পারে না। পারে না? কে জানে! সব চেয়ে বিসদৃশ ব্যাপার হল, যখন ঐ দুঃসংবাদটা শোনার পরেই উনি এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। অন্নপূর্ণাকে একবার জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করলেন না। তাতেই জিনিসটা 'ছ্যাখ্‌তাই' খারাপ হয়ে গেল। যেন এই জন্যেই এতদিন বিয়েটা আটকাচ্ছিল। তবে ওদের বংশটাই যেন ঐ ধারার।

তাঁর বিয়েতেও তো একই রকম ব্যাপার হয়েছিল। ওঁরাও প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। দু-পক্ষের অভিভাবকই খবরটা জানতেন, প্রকাশ্যে স্বীকার করতেন না। ওঁরা পাল্‌টি ঘর। তাই অন্নপূর্ণার বাবা একদিন আনুষ্ঠানিক ভাবেই গিয়ে প্রস্তাব তুলেছিলেন চন্দ্রকান্তের বাবার কাছে। ওঁর শ্বশুর আর কিছু না চিনলেও টাকা চিনতেন। বলেছিলেন, মেয়ে দেখার দরকার নেই, আপনার মেয়ে আমাদের দেখা; কিন্তু ঘর থেকে খরচ দিয়ে তো আমি ছেলের বিয়ে দেব না। নগদ দশ হাজার চাই!

বোঝ ব্যাপার! বউভাতে তো দশ-হাজার টাকা খরচ হবে না। তখনও পণপ্রথা চালু ছিল। লোকে প্রকাশ্যে পণ দাবী করত, দিতও। অন্নপূর্ণার বাবা ছিলেন ছাঁ-পোষা কেরানী। একখানা-একখানা করে মেয়ের জন্য গহনা গড়িয়ে রেখেছিলেন; কিন্তু নগদ কোথায় পাবেন তিনি? শেষে যখন বিয়ে ভেঙে যাবার জোগাড় হল, তখন একদিন অন্নপূর্ণা মরিয়া হয়ে মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে বলেছিলেন, তুমি

আর দ্বিধা কর না মা, সব গহনা বেচে দাও! বুড়ো রাক্ষসটার নগদ দাবী মিটিয়ে দাও! আমি আর সইতে পারছি না।

ওঁর মা ওঁর মুখ চেপে ধরেছিলেন : ছি-ছি-ছি! অমন কথা বলতে নেই রে!

গহনা মেয়েদের প্রাণ! মা একখানা একখানা করে ওঁর জন্য যে গহনা গড়িয়েছিলেন তা উনি দেখেছেন, নাড়া-চাড়া করেছেন—প্রচণ্ড মমতা ছিল সেগুলির উপর। কিন্তু জীবনের বৃহত্তর দাবীর কাছে এক কথায় তিনি তা বিসর্জন দিতে রাজী হয়েছিলেন!

নমিতারও কি তাই হয়েছিল? সেও একদিন মরিয়া হয়ে তার মায়ের কোলে মুখ লুকিয়ে···

না, না, না। এ হতেই পারে না।

দুর্গা! দুর্গা! রাত চারটে হল। এবার ঘুমাবার চেষ্টা করা যাক!

রাত চারটে বাজল।

—ওগো, একবার জেনে এস না—আর কতক্ষণ দেরী হবে?

ইতিমধ্যে বার তিনেক কাউণ্টারে গিয়ে খবর নিয়ে এসেছে চন্দ্রজয়। না, লাইন খালি পাওয়া যায়নি। 'কিউ'-এ ওদের স্থান ছিল দ্বাদশ। কমতে কমতে ছয়-তে নেমেছে। তাও প্রায় আধঘণ্টা আগে। এতক্ষণে ওদের ডাক আসা উচিত। মরিয়া হয়ে চন্দ্রজয় আবার এগিয়ে যায় সেই বব্‌চুলোর কাছে। বলে, শুনছেন?

পেপার-ব্যাকে-নিবদ্ধ-দৃষ্টি বলেন, শুন্‌ছি।

একটু দেখে বলবেন, আমাদের পজিশান এখন কত?

রেজিষ্টার না থেকেই মেয়েটি বললে, নাইন্থ।

বোমার মত ফেটে পড়ে চন্দ্রজয় : মানে! আধঘণ্টা আগে ছিল সিক্স্থ! এতক্ষণে বেড়ে গিয়ে হল নাইন্থ! মামদোবাজি নাকি?

মেয়েটি বইটা নামিয়ে রাখে। বলে, চেঁচামেচি করবেন না।

প্লীজ! ভুলে যাবেন না, এটা মধুকক্ষের প্রতীক্ষাগার। অন্যান্য দম্পতির মুড নষ্ট হয়ে যাবে!

—চুলোয় যাক তারা। আমি কি করে পেছিয়ে গেলাম, সেটা বলবেন?

—সহজ হিসাব। ইতিমধ্যে তিনটি 'লাইটনিং' কল জমা পড়েছে। আপনার প্রায়োরিটি ছিল 'আর্জেন্ট'। তাই নয়?

একটা নিষ্ফল আক্রোশে চন্দ্রজয়ের হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ হয়ে ওঠে। ঠিক তখনই ওকে কনুইয়ের গোঁত্তা মেরে এগিয়ে এলেন এক ঝাঁকড়া চুলো দাড়ি-ওয়ালা: এক্সকিউজ মি!

বোঝা গেল আগন্তুক বব্‌ চুলোর পরিচিত; মেয়েটি একগাল হেসে বললে, হাই বব্‌! তুমি এসে গেছ? এত দেরী করে! আবার কোন টেম্পরারি ওয়াইফ নিয়ে আসনি তো?

বোঝা গেল ছেলেটি প্রচুর মদ্যপান করে এসেছে। রক্তাক্ত চোখ জোড়া তুলে বললে, No my darling! I have a loaf of bread, no book of verse and thou beside this wilderness—জনবহুল নির্জন ঘরটা সে নাটকীয়ভাবে দেখিয়ে দিল। টেবিলের উপর ঠক করে নামিয়ে রাখল একটা বোতল আর খাবারের একটা প্যাকেট!

মেয়েটি ওর আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে বললে, য়ু—নটি ডেভিল! যাও ওখানে গিয়ে বস চুপটি করে!

মাতালটা টলতে টলতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। চন্দ্রজয় বললে, শুনছেন?

—হ্যাঁ শুনেছি! বললাম তো আপনার পজিশন এখন টেন্‌থ!

—টেন্‌থ! এক্ষনি যে বললেন—

—তখনও এই 'লাইটনিং কলটা জমা পড়েনি।

চন্দ্রজয় তোৎলা হয়ে যায়, আমি···আপনার নামে কমপ্লেন করব।

মেয়েটি তৎক্ষণাৎ একটা রেজিষ্টার বাড়িয়ে দিয়ে বলে, নিন ধরুন!

—ওটা কি?

—কমপ্লেন বুক! তবে খাতায় নামটা সই করার আগে—আমার পরামর্শ—ববের পিতৃপরিচয়টা সংগ্রহ করে নেবেন! নমিতা বসুচার তাঁর প্রথম বিবাহ-বার্ষিকীতে বিধবা হবেন, এটা আজ বছরকার দিনে আমার ঠিক ভাল লাগছে না।

চন্দ্রজয় কী বলবে ভেবে পায় না। কিন্তু অনুভব করে তার পাঞ্জাবির হাতা ধরে কে যেন টানছে। নমিতা। একটু আগে সে উঠে এসেছে। অস্ফুটে বলে, ও লোকটিকে আমি চিনি। এস এ দিকে!

সরে এসে চন্দ্রজয় বললে, লোকটা কে?

নামতা ম্লান হেসে বললে, ওর অনেক পরিচয়; কিন্তু যাই বল, আজ ও তোমার একটা মস্ত উপকার করল।

—উপকার! মানে?

–যে প্রশ্নটার জবাব খুঁজে পাচ্ছিলে না, ও সেটা বুঝিয়ে দিয়ে গেল। সেই যে লড়াইটা কার বিরুদ্ধে কার! কে হারছে আর কে জিতছে। এইমাত্র এক বোতল মদের কাছে এক প্যাকেট চকলেট হেরে গেল!

চলতে চলতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে চন্দ্রজয়।

নমিতা বলে, সেই যে তখন আমরা ভাবছিলাম না, ক্যাট্-কিনক্ষির মত আমরাও একটা লড়াই করছি; কিন্তু কে আমাদের শত্রুপক্ষ তা চিনতে পারছিলাম না। ওরা বুঝিয়ে দিল—আমরা আসল শত্রুকে খুঁজে না পেয়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটি করছি। তুমি আমি, আমরা সবাই। ভাগাড়ের শকুনি হয়ে গেছি সব।

চন্দ্রজয় একটা চেয়ারে বসে পড়ে। দু-হাতে মুখটা ঢাকে।

সে কী ভাবছে বোঝা যায় না। নমিতা বললে, কী হল? ঘুম পাচ্ছে?

—না। ভাবছি এখন কী করা যায়?

—আমার পরামর্শ শুনবে?

—বল?

—বুকিংটা ক্যান্সেল করে রিফাণ্ড নিয়ে এস। চল, এখান থেকে বেরিয়ে পড়ি। রাত শেষ হয়ে আসছে। তুমি না বলেছিলে, আজ সকালে 'সঞ্চয়িতা' থেকে '১৪০০ সাল' কবিতাটা আবৃত্তি করে শোনাবে আমাকে? সূর্যোদয় মুহূর্তে?

চন্দ্রজয় উঠে দাঁড়ায়। বলে, চল। তবে ওসব আবৃত্তি-ফাবৃত্তির এখন মুড নেই আমার। কিন্তু এ নরককুণ্ডও আর বরদাস্ত হচ্ছে না। চল, খোলা হাওয়ায় গিয়ে বসি।

রিফাণ্ড নিয়ে ওরা বেরিয়ে এল। বাইশ তলা থেকে ধূলার ধরণীতে। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল প্রাক্তন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কাছাকাছি। এখন ওর নাম 'নবভারত-ভবন'। পুব দিক ফর্সা হয়ে আসছে। পথে লোকজনের চলাচল শুরু হয়েছে ইতিমধ্যে। গঙ্গা ওখান-থেকে দেখা যায় না, তবে গঙ্গার উপরকার দ্বিতীয় সেতুটা স্পষ্ট দেখা যায়। মানুষজন, মনোরেল চলছে তার উপর দিয়ে। আর সাইকেল।

ওরই মধ্যে একটু ফাঁকা দেখে ঘাসের উপর বসল দুজনে পুবদিকে মুখ করে। নমিতা ওকে আড় চোখে দেখে নিয়ে বলল, মিথ্যে কেন মন খারাপ করছ? একটা গান শুনবে? রবীন্দ্র সঙ্গীত?

চন্দ্রজয় ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, কী গাইবে? 'হে নূতন'? নাকি 'নূতন যুগের ভোরে'?

নমিতা মুখ টিপে বললে, না, গাইতে যদি দাও, তবে গাইব 'কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজী!'

এবার হেসে ফেলে চন্দ্রজয়। এই জন্যই ওকে এত ভাল

লাগে! মুড ফিরে আসছে তার। বললে, ভ্যানিটি ব্যাগটা খোল দেখি। ক্যাডবেরি চকলেটা বার কর। উঃ! কতদিন ওসবের স্বাদ পাইনি।

নমিতা ভ্যানিটি ব্যাগটা সরিয়ে নেয়। বলে, এই প্লীস! ওটা থেকে ভাগ চেও না।

কেমন যেন আবার মিইয়ে যায় চন্দ্রজয়। ভৈরোঁটা জমে উঠছিল, হঠাৎ যেন তাল কাটল। হোক আজকের যুগে অসামান্য,—তবু সামান্য একটা ক্যাডবেরি চকলেটের প্যাকেটই তো! নমিতা সেটা ভাগ করে নিতে গররাজী!

—কী! অমনি বাবুর রাগ হয়ে গেল?

দূর! আধখানা চকলেটের জন্য এমন মুহূর্তটা নষ্ট হতে দেবে? তবু একটু খোঁচা দিতেও ছাড়ে না। বললে, ভাবছি—গাইতে হলে এখন আমাকেই গাইতে হয়—'কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজা!'

পুব-আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। নমিতা খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, ও মা গো! আধখানা চকলেটের উপর তোমার এত লোভ?

না। কটূ কথা ও বলবে না। না হলে মুখে এসেছিল জবাবটা: ও কথাটা কিন্তু আমার বলার।

নমিতা বললে, না, শোন। কবিতার বইটা তো আমিই পেলাম—ঠিক করেছি চকলেটটা টুবলুকে দেব। বেচারি বোধহয় জ্ঞান হবার পর থেকে শুধু ক্যালরি ট্যাবলেটই খেয়ে এসেছে। ক্যাডবেরি চকলেটের স্বাদই ও জানে না! এটা ওর নববর্ষের উপহার।

সূর্য উঠছে।

চন্দ্রজয়ের ইচ্ছে হল—সূর্যকে ডেকে বলে—কী দেখছ হে? নূতন যুগ-ফুগ নয়, সেই সাবেক পৃথিবীতেই ফিরে এসেছ তুমি! মানুষকে

আজও তোমরা ভাগাড়ের শকুনিতে পরিণত করতে পারনি। আজও আমরা সেই পোকায়-কাটা মহাভারতের শকুনির আত্মীয়! মুখের গ্রাস পরকে তুলে দিচ্ছি! শতাব্দীর রক্তের ঋণের কড়া-ক্রান্তি শোধ যে আমাদের আদায় করতেই হবে।

নমিতা ওর সদ্যলব্ধ উপহারের একটা পাতা খুলে বাড়িয়ে ধরে। বলে: নাও। পড়ে শোনাও দেখি। মুখখানা অমন 'আউল'-মার্কা করে রাখতে হবে না।

॥ তৃতীয় পর্ব ॥

অর্থাৎ এই গ্রন্থ রচনার কালে যাকে বলা যায়—'আজি হতে শতবর্ষ পরে।'

একশ নয়, প্রায় দেড়শ বছর পরের একটি অনবদ্য চিত্র পাচ্ছি আর্থার ক্লার্কের লেখা একটি সায়েন্স ফিক্‌শানে। আর্থার সি. ক্লার্ক এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান-ভিত্তিক কথা-সাহিত্যের স্রষ্টা। ইতিমধ্যে তিনি প্রায় পঞ্চাশটি গ্রন্থ লিখেছেন—গল্প এবং বিজ্ঞান বিষয়ে। ১৯৫৫ সালে তিনি UNESCO-র বিচারে কলিঙ্গ পুরস্কার পেয়েছেন। ফলে তাঁর অনুমানকে নির্ভর করে—তাঁরই দূরবীনে চোখ লাগিয়ে ভবিষ্যতের দুনিয়াটাকে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

আর্থার ক্লার্কের যে কাহিনীটির কথা বলছি, তার উল্লেখ আগেই করেছি: 'রঁাদেভূ উইথ রাম'। ঘটনা শুরু হচ্ছে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। দ্বাবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে যে চিত্র পাচ্ছি তা এই:

মানব-সভ্যতা সৌরমণ্ডলের অনেকটা অংশে ছড়িয়ে পড়েছে। বুধ, চন্দ্র, মঙ্গল এমনকি অন্যান্য গ্রহ প্রদক্ষিণকারী উপগ্রহেও মানুষ বাস করছে। ওঁর কল্পনায় তখন U.N.O.-র রূপান্তর ঘটেছে UPO-তে (The United Planets' Organisation) অর্থাৎ একটি আন্তগ্রাহিক প্রতিষ্ঠান। তার সাতটি সভ্য। সূর্য থেকে দূরত্বের হিসাবে সেই সাতজন সভ্য হল—বুধ, পৃথিবী, চাঁদ, মঙ্গল, গ্যানিমিড, (বৃহস্পতির উপগ্রহ, আমাদের চাঁদ বা বুধের চেয়ে বড়, পৃথিবীর চেয়ে ছোট—ব্যাস ৪৯৮৯ কি. মি.) টাইটান (শনিগ্রহের উপগ্রহ, ব্যাস ৪৮২৩ কি. মি.) এবং ট্রাইটন (নেপচুনের উপগ্রহ, ব্যাস ৩৭০২ কি. মি.)। লেখক তাঁর কাহিনীতে কল্পনা করেছেন

যে, সৌরমণ্ডলের বাইরে-থেকে-আসা এক অজ্ঞাত নভোচারীর আবির্ভাবে এই আন্তর্গ্রাহিক প্রতিষ্ঠানের এক জরুরী সভা বসেছে। সভায় প্রতিটি গ্রহের বা উপগ্রহের প্রতিনিধি যে উপস্থিত হতে পেরেছেন তা নয়, কিন্তু কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে থেকেও সভার আলোচনায় সক্রিয় অংশ নিতে তাঁদের কোন অসুবিধা হয়নি। কারণ চন্দ্রলোকে আহুত এই সভায় অনুপস্থিত সভ্যদের টেলিভিশান প্রতিমূর্তি উপস্থিত ছিল—তাঁরা সব কিছু শুনেছেন ও আলোচনায় যোগও দিয়েছেন—কোন কোন সভ্যের বক্তব্য হয়তো কয়েক মিনিট পরে এসে পৌচেছে—ঐ বেতার তরঙ্গ যেতে যেটুকু সময় লাগে আর কি। তা হোক, কিন্তু সভ্য তালিকাটা নজর করে একটা খটকা লাগছে নাকি? আজ থেকে দেড়শ বছর পরে নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটনে মানুষের বাস কল্পনীয়? সেই উপগ্রহ আছে সূর্য থেকে সাড়ে চারশ কোটি কিলোমিটার দূরে (পৃথিবী আছে ১৫ কোটি কি. মি. দূরে)। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে মঙ্গলের যা দূরত্ব ট্রাইটনের দূরত্ব তার চুয়ান্ন গুণ বেশী। আজ থেকে মাত্র দেড়শ বছর পরে অতদূর কোনও উপগ্রহে মানুষ পৌছাতে পারবে? উপনিবেশ স্থাপন করতে পারবে?

তার চেয়েও বড় বিস্ময়—সভ্য তালিকায় পৃথিবী থেকে সব চেয়ে নিকটবর্তী গ্রহের নাম নেই—শুক্রগ্রহ। পৃথিবী থেকে মঙ্গলের যা দূরত্ব শুক্রের দূরত্ব তার চেয়েও অনেক কম। মঙ্গলগ্রহ যখন পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে আসে তখন দূরত্ব যদি হয় সাড়ে পাঁচ কোটি কি. মি. তাহলে শুক্র যখন এ পাড়ায় আসে তখন তার দূরত্ব মাত্র চার কোটি কি. মি.। সে-ক্ষেত্রে পাঠকের মনে একটি সঙ্গত প্রশ্ন জাগে—আজ থেকে দেড়শ বছর পরে ট্রাইটন আমাদের নাগালের মধ্যে এল, অথচ শুক্রগ্রহ এল না কেন? লেখক বলছেন, সূর্যের সবচেয়ে নিকটবর্তী গ্রহ—বুধগ্রহে ২১৩০ খ্রীষ্টাব্দে মানুষের সংখ্যা এক লক্ষ সাড়ে বারো হাজার, (১) অথচ বুধের চেয়ে কাছের স্টেশান শুক্রগ্রহে

মানুষ পদার্পণ করতে পারেনি। দ্বাবিংশ শতাব্দীতে বুধের অধিবাসী-দের সম্বন্ধে লেখক বলেছেন, "অধিকাংশের মতে বুধগ্রহকে নিখুঁত নরক বললেও খুব কিছু ভুল হয় না। কিন্তু বুধবাসীরা তাদের গ্রহের নারকীয় প্রকৃতির বিষয়ে গর্ব অনুভব করে। সেখানে বৎসরের চেয়ে দিনের ব্যাপ্তি বেশি, দিনে দু'বার করে সূর্যোদয় হয়, দু'বার করে সূর্যাস্ত! নদী আছে—জলের নয়, তরলিত ধাতব নদী! বুধের তুলনায় চন্দ্রলোক বা মঙ্গলের প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতা নিতান্ত তুচ্ছ। যতদিন না মানুষ শুক্রগ্রহে পদার্পণ করতে পারছে (আদৌ যদি কোনদিন করতে পারে) ততদিন বুধবাসীরা গর্ব করে বলতে পারবে—তারাই সবচেয়ে কঠিন প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতাকে দমন করেছে" (২)।

এত বড় কথাটা যখন উঠল, তখন আসুন—শুক্রগ্রহটাকে ভাল করে চিনে নেওয়া যাক :

এক—শুক্রগ্রহ : আপাত-দৃষ্টিতে শুক্রগ্রহতেই মানুষের দ্বিতীয় ঘাঁটি হওয়ার কথা। আকারে, সূর্য থেকে দূরত্বে, পৃথিবী থেকে দূরত্বে—প্রভৃতি সব বিচারেই শুক্রগ্রহ মনে হয় সবচেয়ে বরণীয়। দূরের গ্রহ উপগ্রহ—যেখানে সূর্যতাপ খুব কম, তাদের কথা ছেড়ে দিলে বাকি চারটি নভোচারীর বিষয়ে তুলনামূলক একটি তালিকা বিচার করে দেখা চলতে পারে।

গ্রহ/উপগ্রহ	সূর্য থেকে গড় দূরত্ব (কোটি কি. মি.)	ভর (পৃথিবী=১)	উপরিভাগের উত্তাপ (ফারেনহাইট)
বুধ গ্রহ	৫.৮	০.০৫	৭০০ ডিগ্রি (সর্বোচ্চ)
শুক্র গ্রহ	১০.৮	০.৮১	৮৯০ ডিগ্রি (গড়)
পৃথিবী গ্রহ	১৫.০	১.০০	৫৮ ,, ,,
চন্দ্র উপগ্রহ	১৫.০	০.০১	২০০ থেকে (–) ২৮০ ডিগ্রি
মঙ্গল গ্রহ	২২.৮	০.১১	(–) ৪০ ডিগ্রি (গড়)

তালিকা থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করছি—পৃথিবী ও শুক্র গ্রহের আয়তন প্রায় সমান। ভর বা সহজ-ভাষায় ওজনও। ভর এবং সূর্য থেকে দূরত্বের উপরেই আবহাওয়া মোটামুটি নির্ভর করে। মঙ্গল সূর্য থেকে এত দূরে এবং সেটি এত ছোট যে, অক্সিজেনকে আবহাওয়ায় ধরে রাখতে পারেনি, অপরপক্ষে চাঁদের ক্ষেত্রে দেখছি, সূর্য-থেকে দূরত্বটা বেশ লাগ-সই, কিন্তু তার ভর এতই কম যে, সেও অক্সিজেনকে ধরে রাখতে পারেনি। শুক্রের ক্ষেত্রে কথাটা কিন্তু খাটছে না। বিজ্ঞান বলছে, শুক্রগ্রহ যদি আর মাত্র আড়াই কোটি কিলোমিটার দূর দিয়ে সূর্য প্রদক্ষিণ করত তাহলে সেখানে হয়তো প্রায় পৃথিবীর মতই আবহাওয়া হত এবং জীবন বিকশিত হওয়া অসম্ভব হত না। একথা কিন্তু চাঁদ, মঙ্গল বা বুধের প্রসঙ্গে বলা চলে না। তারা সূর্য থেকে যত সুবিধাজনক দূবত্বেই থাকুক না কেন—অত্যন্ত স্বল্প ভরের (ওজনের) জন্য তারা আবহাওয়ায় অক্সিজেনকে ধরে রাখতে পারত না। তাহ'লে, এত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও শুক্রগ্রহকে কোনদিন মনুষ্য বাসোপযোগী বলে কল্পনা করা যাচ্ছে না কেন? যাচ্ছে না, এতাবৎকাল ধরে সংগ্রহীত তথ্যের জন্য।

শুক্রগ্রহ সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য তথ্য প্রথম পাওয়া গেল 'মেরিনার-২' প্রকল্প থেকে, ১৯৫৫ সালে। শুক্রগ্রহের প্রায় চৌত্রিশ হাজার কিলোমিটার দূর থেকে সে যেসব সংবাদ পাঠালো তা আশঙ্কাতীত। জানা গেল, শুক্রের দিবারাত্র হয় ২৪৩ পার্থিব দিনে, যদিও সে সূর্য প্রদক্ষিণ করে প্রায় ১২৫ পার্থিব দিনে। জানা গেল, শুক্র অত্যন্ত উত্তপ্ত, তাপমাত্রা প্রায় ৯০০ ডিগ্রি ফারেনহীট, অর্থাৎ আমাদের যজ্ঞিবাড়ির উনানের সবচেয়ে উত্তপ্ত অংশের দ্বিগুণ গরম। আবহাওয়া আছে, তার চাপ প্রচণ্ড—পৃথিবীর তুলনায় শতগুণ বেশী। ভাষান্তরে বলা যায় পৃথিবীতে সমুদ্রগর্ভে ২৫০ ফুট গভীরে যে চাপ ওখানকার ডাঙ্গায় সেই বায়ুচাপ। বায়ুমণ্ডলের সিংহভাগ, শতকরা নব্বই শতাংশ হচ্ছে কার্বন ডায়ক্সাইড। এই কার্বন ডায়ক্সাইডের বাতাবরণে

শুক্রগ্রহ এমনভাবে আচ্ছাদিত যে, তাকে ভেদ করে আজও পর্যন্ত কোন রকেটকে ওর ভূ-তলে (শুক্রতলে) পাঠাতে পারা যায় নি। বস্তুত সূর্য থেকে নৈকট্যের জন্য ততটা নয়, যতটা এই কার্বন ডায়ক্সাইড বাতাবরণের জন্য শুক্রগ্রহ অমন অগ্নিকুণ্ড হয়ে আছে। সূর্য রশ্মি ঐ ঘন বায়ুমণ্ডল ভেদ করে শুক্রপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়, তাকে উত্তপ্ত করে, কিন্তু ফিরবার পথে ঐ উত্তাপ বিকিরিত হবার পথে বাধা পায় কার্বন ডায়ক্সাইডে পূর্ণ আবহাওয়ায়। ঐ অত্যন্ত ঘনীভূত বাতাবরণের জন্য আরও একটি অদ্ভুত ব্যাপার খাতা-কলমে হওয়ার কথা। যদি কোন ক্রমে কোন মানুষ শুক্রগ্রহে উপস্থিত হয় এবং তার চারদিকে তাকিয়ে দেখতে সক্ষম হয় তাহলে তার মনে হবে সে যেন একটা বিরাট বাটির ভিতর বসে আছে। তার চারপাশের দিগন্ত রেখা স্বর্গপানে উঠে যাবে। তার কারণটা হচ্ছে এই—আমরা জানি, আলোক-রশ্মি ঘন থেকে পাতলা মাধ্যমে যাওয়ার পথে বেঁকে যায়। অতসী কাচে, জলের ভিতর ডোবানো কাঠিতে এটা আমরা লক্ষ্য করেছি। মরীচিকাও হয় ঐ একই কারণে। শুক্রগ্রহে মানুষের চোখে তাই গ্রহের উল্টোপিঠের অংশগুলোই ঐভাবে প্রতিসরিত (refracted) হয়ে ধরা দেবে। চিত্র

চিত্র নং—১০

১০-এ ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করেছি। 'ক' বিন্দুতে দাঁড়ানো দর্শকের চোখে শুক্র-গোলার্ধের বিপরীত দিক থেকে বিচ্ছুরিত

আলোক-রশ্মিও এসে পৌঁছাবে বায়ুমণ্ডলে প্রতিসরিত হয়ে।

বস্তুত পক্ষে ঐ দুর্ভেদ্য কার্বন-ডায়ক্সাইড বাতাবরণের জন্যই আশঙ্কা করা হচ্ছে—মানুষ কোনদিনই শুক্রে পদার্পণ করতে পারবে না।

শুক্রজয়ের সম্ভাবনা: Futurology বা ভবিষৎ-বিজ্ঞান যে কী প্রচণ্ড দ্রুতহারে বিবর্তিত হচ্ছে এবার সেটা লক্ষ্য করে দেখুন। আমরা ইতিপূর্বে আর্থার ক্লার্কের মতামত (১৯৫৫) জেনেছি—শুক্রগ্রহে ১৯৫৫ সালেও মনুষ্য-পদার্পণ ঘটবে না। ১৯৫৫ সালে প্রখ্যাত বিজ্ঞানী প্যাট্রিক মূর বললেন, "মহাকাশজয়-যুগের আগে মঙ্গলের চেয়ে শুক্রজয়ের সম্ভাবনাটাকেই অধিক বলে মনে করা হত, কিন্তু ক্রমে সে সম্ভাবনা নিরাশায় পর্যবসিত হল।···শুক্রের আপোষ-বিহীন প্রকৃতির পরিচয় পাওয়ার পর থেকে তার প্রতি আমাদের আকর্ষণটা কমে গেছে। এখন আমাদের মহাকাশ লক্ষ্যের তালিকায় মঙ্গলই বেশি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। মঙ্গলের প্রকৃতিও এমন কিছু আকর্ষণীয় নয়, তবু শুক্রের মত অসহনীয়ও নয়" (৩)।

মাত্র দু-তিন বছরের ভিতরেই কিন্তু ধারণাটা বদলে যেতে শুরু করেছে। অতি সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক বলছেন, শুক্র-গ্রহকে সহনীয় ক'রে তোলা হয় তো অসম্ভব কিছু নয়। এই চিন্তাধারার জনক হিসাবে নাম করতে হয় কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কার্ল সাগান-এর। আজকের পৃথিবীতে জীবিত জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মধ্যে তিনি অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থানাধিকারী। শুধু জ্যোতির্বিজ্ঞানী নন, তিনি জীববিজ্ঞানীও। ১৯৫৫ সালে তাঁর একটি গ্রন্থের (৪) শেষ দুটি পৃষ্ঠায় তিনি যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, সেটাই পরিণতি লাভ করেছে অতি সাম্প্রতিক কালে। চিন্তাধারাটা বুঝতে হলে পৃথিবীতে জীব কী করে এল তা দেখতে হবে। পৃথিবীতে জীব কী-করে, কেন এল বিজ্ঞান তা জানে না—তবে কোন পথে এল তা আন্দাজ করতে পারে।

আজ থেকে তিনশ' কোটি বছর আগে পৃথিবীর আবহাওয়া জীবের পক্ষে আদৌ অনুকূল ছিল না। আবহাওয়ায় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ এমন সুসমঞ্জস ছিল না যাতে প্রাণী নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারে। বরং আবহাওয়ায় ছিল প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডায়ক্সাইড, কিছু এ্যামোনিয়া এবং মিথেন। অর্থাৎ আজ শুক্রের আবহাওয়ার যে অবস্থা। কি করে জানি না, পৃথিবীতে তার পরবর্তী পর্যায়েই সমুদ্রগর্ভে জন্ম নিল আদিমতম প্রাণ, যার বৈজ্ঞানিক নাম Cyanophyta, সাধারণবোধ্য নাম 'নীল-এ্যাল্‌গি'। এককোষ বিশিষ্ট প্রাণী—না-উদ্ভিদ, না-প্রাণী। মাঝামাঝি। অনুবীক্ষণ যন্ত্রেই শুধু তাদের দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু তারা ঠিক ব্যাক্‌টেরিয়া নয়। ব্যাক্‌টেরিয়া, যাকে বাঙলায় বলি জীবাণু, (ব্লু-এ্যাল্‌গির মত মাইক্রো-অর্গানিজম্‌কেও অবশ্য সাধারণভাবে জীবাণুই বলি) সেগুলিকে উদ্ভিদের দলে ফেলা হয়। ব্লু-এ্যাল্‌গির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—এরা অত্যন্ত দ্রুতগতি বংশবৃদ্ধি করে আর জীবন-ধারণের জন্য এদের অক্সিজেন প্রয়োজন হয় না, দরকার হয় সব জাতের উদ্ভিদের মত কার্বন ডায়ক্সাইড-এর। ঐ গ্যাস থেকে তারা কার্বনকে গ্রহণ করে, তাকে গ্লুকোস বা অন্যান্য কার্বো-হাইড্রেটে রূপান্তরিত করে বাঁচে, অপরপক্ষে কার্বন ডায়ক্সাইড থেকে মুক্ত অক্সিজেনকে বাতাসে ছেড়ে দেয়।

আনুমানিক তিনশ' কোটি বছর আগে সমুদ্রবক্ষে কী-করে প্রথম ঐ ব্লু-এ্যাল্‌গি এল তা জানি না; কিন্তু তারা ঐ প্রক্রিয়া শুরু করল—কার্বন-ডায়ক্সাইড থেকে কার্বনকে আহরণ করে অক্সিজেনকে মুক্ত করা। সমুদ্রের একেবারে গভীরে নয়, উপরিভাগে, যেখানে সূর্যালোক এসে পড়ছে, যেখানে আকাশের বাতাস আর সমুদ্রের জল হাত মেলায়। মুক্ত অক্সিজেন সমুদ্রের উপরিভাগের বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে থাকে—এ্যামোনিয়া আর মিথেন গ্যাসকে বিতাড়িত করতে থাকে। এই মুক্ত অক্সিজেনই জন্ম দিতে সাহায্য করল ব্লু-

এ্যাল্‌গি-উদ্ভূত প্রথম এক-কোষ বিশিষ্ট প্রাণীকে—'প্রটোজুন'কে, যারা আর উদ্ভিদ নয়, প্রাণী। ক্রমে বাতাসে অক্সিজেনের পরিমাণ যত বাড়তে থাকে, ততই নূতন নূতন প্রাণী বিবর্তিত হতে থাকে। তারা বাতাস থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে ও প্রশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডায়ক্সাইড ত্যাগ করে। এই ভাবে প্রাণী ও উদ্ভিদ পরস্পরকে সাহায্য করে পৃথিবীতে জীবনের বিবর্তন ঘটালো—যে বিবর্তনের আদিতে আছে ঐ না-প্রাণী না-উদ্ভিদ ব্লু-এ্যাল্‌গি। আগেই বলেছি, এই ব্লু-এ্যাল্‌গি অত্যন্ত কষ্ট স'হষ্ণু—এরা মেরু অঞ্চলে শত-শত ফুট বরফের নিচে বেঁচে থাকে, যেখানে উত্তাপ মাইনাস ১০০ ডিগ্রি ফারেনহীট। আবার ৪০০ ডিগ্রি উত্তাপের উষ্ণ প্রস্রবনের মধ্যেও তাদের সজীব থাকতে দেখা গেছে।

সাগান এবং তাঁর সহকর্মীরা ভাবলেন, শুক্রজয়ের প্রথম পর্ব হিসাবে একদল ব্লু-এ্যাল্‌গিকে অগ্রদূত করে পাঠালে কেমন হয়? পরিকল্পনাটা এই রকম—প্রথমে গোটা বিশ-পঞ্চাশ স্বয়ংক্রিয় আকাশযান পাঠাতে হবে শুক্র-গ্রহের দিকে। প্রতিটি আকাশযানের নাকের ডগায় থাকবে টর্পেডোর মত দেখতে একটি করে রকেট, যাতে ঠাসা থাকবে ঐ ব্লু-এ্যাল্‌গি। শুক্র-গ্রহের বিভিন্ন প্রান্তে একযোগে ঐ রকেটগুলি ছাড়া হবে, যেগুলি কার্বন-ডায়ক্সাইড বাতাবরণে পৌছে ফেটে যাবে এবং ব্লু-এ্যাল্‌গিকে ছাড়িয়ে দেবে কার্বন-ডায়ক্সাইড মেঘ স্তূপে। তারা ঐ উত্তাপে, ঐ চাপে বাতাসে ভাসমান অবস্থায় জীবন ধারণে সমর্থ। তৎক্ষণাৎ তারা কার্বন-ডায়ক্সাইড ভাঙতে ও বংশবৃদ্ধি করতে শুরু করবে। তিনশ' কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রকৃতির খেয়ালে যা হয়েছে, শুক্রে তাই হবে মানুষের ব্যবস্থাপনায়। তফাৎ এই যে, পৃথিবীতে প্রথম পর্যায়ে ব্লু-এ্যাল্‌গির সংখ্যা ছিল মুষ্টিমেয়, তাই সেই আদিম বাতাবরণকে জীবের পক্ষে সহনীয় করে তুলতে তাদের কোটি কোটি বছর সময় লেগেছিল। এক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়েই ব্লু-এ্যাল্‌গির সংখ্যা এত বেশি হবে যে,

শুক্রের ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা হবে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। আপনি হয়তো ভাবছেন—কত দ্রুতগতি ? পৃথিবীতে যে পরিবর্তন হয়েছে এক কোটি বছরে শুক্রে যদি তার চেয়ে লক্ষগুণ দ্রুতগতি হয় তবু তো একশ' বছর লেগে যাবে ! না, তা যাবে না। সাগান আশা করছেন, মাত্র দশ বিশ বছরের মধ্যেই শুক্রগ্রহে অক্সিজেনের ভাগ এমন হবে যে, মানুষ স্পেস-স্যুট ছাড়াই সেখানে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে পারবে ! একেবারে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে তো ? ব্যাপারটা বুঝতে হলে জানতে হবে 'ক্রিটিক্যাল-কণ্ডিশান (সন্ধিক্ষণ-কালীন অবস্থা) কাকে বলে। শক্ত নয়, আসুন সেটা বুঝে দেখি।

প্রথম পর্বে আলোচিত সেই পুকুরের মালিকটিকে নিশ্চয় ভোলেননি, যার পুকুরটি একমাসে কচুরিপানায় ঢেকে গিয়েছিল। পুষ্করিণীর মালিকের কাছে মাসের প্রথম সাত-দশ দিন ব্যাপারটা নজরেই পড়েনি ; কিন্তু মাসের শেষ সপ্তাহে কচুরিপানার দ্বিগুণ বৃদ্ধিটা 'ক্রিটিক্যাল' হয়ে পড়েছিল—শেষদিন তো চরম অবস্থা ! অনুরূপ ভাবে নবাব শিরহামের দাবার ছকেও অবস্থাটা চরমে উঠেছিল শেষ সারিতে পৌঁছে। সাগানের হিসাবে—এ্যানালজি দিয়ে বলতে পারি—প্রথম পর্যায়েই আমরা এতটা ব্লু-এ্যাল্‌গি নিক্ষেপ করছি যে, উজীর শিসা যেন আর নবাবের খেলাটা শুরুই হচ্ছে ঐ ষাট-বাষট্টি নম্বর চৌখুপি থেকে !

অঙ্ক কষে কার্ল সাগান বললেন, এক বছরের ভিতরেই শুক্রগ্রহের ঐ দুর্ভেদ্য বাতাবরণ এতটা পাতলা হয়ে যাবে যে, পৃথিবী থেকে শুক্রগ্রহের ভূ-পৃষ্ঠ বা শুক্রপৃষ্ঠ দূরবীনে দেখতে পাওয়া যাবে। বছর দুই-তিনের ভিতরে সেখানে বৃষ্টি হবে এবং এক দশকের ভিতরেই শুক্র কষ্টসহিষ্ণু জীবের পক্ষে বাসোপযোগী হয়ে যাবে। বৃষ্টিটা কেন, কি করে হবে ?

কার্বন ডায়ক্সাইড ভেঙে যাবার পর সূর্যের অবলোহিত রশ্মি (ইনফ্রা-রেড রেডিয়েশান) যা এতদিন আটকা পড়েছিল, তা মুক্তি

পাবে ও মহাকাশে ছড়িয়ে পড়বে। ফলে বাতাবরণের নিচের অংশের উত্তাপ কমতে থাকবে। বাতাসে উত্তাপ কমলেই সেখানকার জলীয় বাষ্প ছোট ছোট জলকণায় ঘনীভূত হবে—ঠিক যেভাবে পৃথিবীতে বৃষ্টি হয়। হিসাব করে দেখা গেছে, সমগ্র শুক্রগ্রহে একশ' ইঞ্চি বৃষ্টি হতে পারার মত জলীয় বাষ্প আছে ওর আবহাওয়ায় (৫)। ফলে ঘনীভূত সেই জলকণা মাধ্যাকর্ষণের টানে শুক্রগ্রহের দিকে ছুটে আসবে।

প্রথম পর্যায়েই কিন্তু টাপুর-টুপুর বৃষ্টি পড়বে না। কেমন করে পড়বে? ওখানকার মাটি যে—আগেই বলেছি, যজ্ঞিবাড়ির উনানের ডবল গরম, ৯০০ ডিগ্রি ফারেনহীট। মাটিতে পৌঁছানোর অনেক-অনেক আগেই তা আবার বাষ্প হয়ে উপে যাবে। তা যাক, কিন্তু ঐ সঙ্গে কিছুটা উত্তাপও সে নিয়ে যাবে। তাছাড়া উপরে গিয়ে আবার তা বৃষ্টির ফোঁটায় রূপান্তরিত হবে এবং ফিরে আসবে। কিছুকালের মধ্যে সেখানে বৃষ্টি হবে। শুক্রের চার-পাঁচ-শত কোটি বছরের জীবনে প্রথম বৃষ্টিপাত। নিচু জমিতে জমবে জল, খাদ নিয়ে বইবে নদী। দেখা দেবে সমুদ্র—তার গভীরতা কত কে জানে?

মোট কথা সাগান ভবিষ্যদ্বাণী করলেন "When more rain falls the heat retaining clouds will partly clear away, leaving an oxygen-rich atmosphere, and a temperature cool enough to sustain hardy plants and animals from Earth." [আরও বৃষ্টি হবার পর তাপ-রোধক মেঘস্তূপ কিছু পরিমাণে মিলিয়ে যাবে। বাতাসে অক্সিজেনের ভাগ বাড়বে এবং উত্তাপও যাবে কমে। তখন পৃথিবী থেকে নিয়ে যাওয়া কষ্টসহিষ্ণু গাছ বা প্রাণীর পক্ষে সেখানে জীবন ধারণ করা সম্ভবপর হবে।] (৬)

দুই—পৃথিবী : যুক্তি-তর্ক :

সামনের দিকে কোথায় যাচ্ছি দেখতে হলে পিছনের দিকে ফিরে দেখতে হয়—কোথা থেকে এলাম। ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দের ছবি আঁকতে হলে তাই দেখা দরকার ১৮৭৬ সাল থেকে ১৯৫৫ সালে কতটা পথ পাড়ি দিয়েছি। না, ভুল বললাম—সে-হিসাবটাও ঠিক হবে না, হতে পারে না। প্রগতির গতিবেগের ক্রম প্রতিনিয়তই ক্রমবর্ধমান! প্রতিটি বিষয়ে গত এক শ' বছরে পৃথিবী যতটা এগিয়েছে আগামী এক শ' বছরে অগ্রগতি সেই হারে হবে না, হবে আরও অনেক-অনেক দ্রুত হারে। এখানেও যে সেই সুপার-এক্সপোনেন্সিয়াল বৃদ্ধির হার। এ প্রসঙ্গ আমরা আগেও আলোচনা করেছি—সেই ক্লাব অব রোমের যুক্তির বিষয়ে আলোচনা-কালে। তবে সে-সময় হাতে-কলমে কোন প্রমাণ দাখিল করিনি। সেটা এখন করা যেতে পারে।

প্রতিটি বিষয়ে—বিজ্ঞানের উন্নতিতে, প্রযুক্তি-বিদ্যার অগ্রগতিতে, প্রকৃতির-উপর আধিপত্য বিস্তারে—সর্বত্রই প্রগতি হচ্ছে এক্সপো-নেন্সিয়াল-হারে। অনেকটা সেই কচুরিপানায়-ঢাকা পুকুরের মত। প্রথম দিকে প্রতি শতাব্দীতে যতটা এগিয়েছি ইদানিং হয়তো প্রতি দশকে ততটা এগিয়ে যাচ্ছি। আগামী শত বৎসরে হয়তো সেই প্রতি-দশকের-অগ্রগতি সুসম্পন্ন হবে প্রতি বছরে। তাই ইদানীং কালে মিল্‌খা সিংয়েরা বিশ্ব-রেকর্ড বিচূর্ণ করেও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ মেডেল পায়না। মনট্রিল অলিম্পিকে তাই দেখলাম, মানুষ আর মানুষের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করছে না, করছে সময়ের সঙ্গে! দু' একটি বাস্তব উদাহরণ নিয়ে আলোচনা করলে প্রতিপাদ্য বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে।

প্রথম উদাহরণ : গতির প্রগতি। নিচের তালিকায় লক্ষণীয়—গতির অগ্রগতিটা প্রথমদিকে দেখানো হয়েছে সহস্রাব্দীর ব্যবধানে, পরে শতাব্দীর ব্যবধানে, বর্তমান শতাব্দীতে পৌঁছে প্রায় প্রতি

দশকে এবং শেষা-শেষি প্রতি বছরে। তবু দেখুন, কী-ভাবে মানুষের গতিটা বেড়েছে। প্রযুক্তিবিদ্যার নব নব নব আবিষ্কারে প্রতি যুগেই কিছু পরিমাণ গতিবৃদ্ধি হয়েছে ; কিন্তু মহাকাশ-যান নির্মিত হওয়া-মাত্র সেই মন্থর গতিবৃদ্ধির হার অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বদলে গেল।

গতি কি. মি./ঘণ্টা	নাম	যান	দেশ	কাল
১৬		দৌড়ে		প্রাগৈতিহাসিক
৩২		চাকাওয়ালা গাড়ী	ব্যাবিলন ইত্যাদি	৩০০০ খ্রীঃ পূঃ
৪৮		নৌকা	ফোনিশিয়ান	১৫০০ ” ”
১৪৫	ক্রাপটন-৬০৪ ইঞ্জিন	রেলগাড়ি	ফ্রান্স	১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দ
২৪১	ফেড্রিক ম্যারিয়ট	স্পীডবোট	আমেরিকা	১৯০৭ ”
৩৩৮	প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত	এয়ারোপ্লেন	জার্মানী	১৯১৮ ”
৪৪১	লেঃ হ্যারল্ড ব্রাও	ঐ	আমেরিকা	১৯২৩ ”
৭৮২	কাপ্তেন ওয়েণ্ডেল	ঐ	জার্মানী	১৯৩৯ ”
১৫৫৬	ক্যাঃ চার্লস্ ইয়েগার	ঐ	আমেরিকা	১৯৪৮ ”
৩৩৭০	ক্যাঃ এম. আপ্ট্	ঐ	ঐ	১৯৫৬ ”

দ্বিতীয় আর একটি উদাহরণ নিন : মনুষ্য-নির্মিত স্থাপত্যকীর্তির উচ্চতা। এক্ষেত্রেও চিত্রটার একই রূপ। বৃদ্ধির হারটা বাড়ছে সময়ের সঙ্গে তাল না রেখে, এক্সপোনেন্সিয়াল-হারে।

উচ্চতা মিটার	নাম	অবস্থান	কাল
৬২	যোশার পিরামিড (প্রাচীনতম)	সাক্কার, মিশর	২৬১০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ
১৪৭	গ্রেট পিরামিড (বৃহত্তম)	গীজা, মিশর	২৫৮০ ঐ
১৪৯	সেণ্ট পল্‌স্‌ গীর্জা	লণ্ডন	১৫৬১ খ্রীষ্টাব্দ
১৫৬	কোলন গীর্জা	কোলন, জার্মানী	১৮৮০ ঐ
১৬৯	ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল	ওয়াশিংটন ডি সি.	১৮৮৪ ঐ
৩০০	আইফেল টাওয়ার	প্যারিস	১৮৮৯ ঐ
৩৮১	এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং	নিউ ইয়র্ক	১৯৩০ ঐ
৪৭৯	টেলিভিশন টাওয়ার	ওকলাহামা সিটি	১৯৫৪ ঐ

এবারেও দেখুন, পিরামিডের মাথা থেকে আইফেল টাওয়ারের মাথায় চড়তে আমরা দ্বিগুণ-উচ্চতায় উঠেছি—কিন্তু সে-ক্ষেত্রে পাড়ি দিতে হয়েছে সাড়ে চার হাজার বছরের প্রযুক্তিবিদ্যার ক্রমোন্নতি ; অপর পক্ষে আইফেল টাওয়ারের দ্বিগুণ উচ্চতায় উঠতে আমাদের পঁচাত্তর বছরও লাগেনি !

আমাদের তৃতীয় উদাহরণ : ভূপৃষ্ঠ ছেড়ে উপরে ওঠা।

এবার আর প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে নয়—মাত্র দুই শ' বছরের খতিয়ান বিচার করলেই দেখতে পাব—অগ্রগতিটা কী-ভাবে এক্সপোনেন্সিয়াল-বৃদ্ধির রূপ নিয়েছে :

উচ্চতা মিটার	যান	দেশ	স্থান	কাল
২৪	উত্তপ্ত বাতাসভরা বেলুন	ফ্রান্স	প্যারিস	১৭৮৩
২,৭৪৩	হাইড্রোজেন ভরা ঐ	ঐ	ঐ	১৭৮৩
৬,০৯৬	ঐ	জার্মানী	হামবুর্গ	১৮০৩
১১,১৪৫	এয়ারোপ্লেন	ফ্রান্স	প্যারিস	১৯২৩
২২,০০০	বেলুন	রাশিয়া	মস্কো	১৯৩৪
২৮,৩৪৬	রকেট প্লেন	আমেরিকা	ক্যালিফোর্নিয়া	১৯৫৪

উচ্চতা	যান	দেশ	স্থান	কাল
কিলোমিটার				
৩২৭	ভোস্টক-১	রাশিয়া	মহাকাশ	১৯৫৫
১৩৭০	জেমিনি-১১	আমেরিকা	ঐ	১৯৫৬
৩৭৭৩৬০	এ্যাপোলো-৮	ঐ	ঐ	১৯৫৮

এখানেও লক্ষণীয়, মানব সভ্যতা গত পনের বছরের ভিতর দুই-দুইবার 'জয় রাম' বলে মহাবীরের মত লাফ মেরেছে। প্রথমবার ১৯৫১ সালে উরি গ্যাগারিন যখন পৃথিবীর বন্ধন কাটিয়ে মহাকাশে উঠ্‌লেন; দ্বিতীয়বার ১৯৫৮ সালে বোরম্যান প্রভৃতি যখন পার্থিব এলাকা ছাড়িয়ে চন্দ্রলোকের কাছাকাছি পৌছালেন (এ্যাপোলো-৮)। ভোস্টক-১-এর কেরামতিতে আমরা আমাদের মাপ কাঠিটাই বদলাতে বাধ্য হলাম—মিটারের বদলে কিলোমিটার। সেই নজিরে আগামী শতাব্দীতে কি আবার আমরা মাপকাঠিটা বদলাতে বাধ্য হব?—কিলোমিটারের বদলে 'আলো-মিনিট'? উদাহরণ আর না বাড়িয়ে আমরা আমাদের আলোচ্য প্রসঙ্গে ফিরে আসি। ইতিপূর্বেই বলেছি (পৃঃ ৯২)—বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন কোন মৌল আবিষ্কার সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে আসে। তেমন কোন মৌল-আবিষ্কারের কথা বাদ দিয়ে আমরা প্রত্যাশিত আবিষ্কারের একটি তালিকাও পেশ করেছিলাম। এবার আমরা আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি মত সেই অগ্রগতির বিষয়ে একটি ভবিষ্যদ্বাণী তালিকাকারে রাখছি। আশা আছে, প্রথম দু-এক দশকের ভবিষ্যদ্বাণী কতটা সার্থক হল, তা আমি নিজের জীবদ্দশাতেই দেখে যাব—বাকিটা দেখবেন আপনারা এবং আপনার-আমার, আমাদের বংশধরেরা। তালিকাটি প্রণয়ন করার আগে বিগত দেড়শ-বছরের অগ্রগতিটা লিপিবদ্ধ করে নিলে সুবিধা হয়, অর্থাৎ যা নাকি আমাদের এক্সপোনেন্সিয়াল বৃদ্ধি-হারের হাইপথেসিস্:

বিগত দেড়শ বছরের অগ্রগতি

সাল	গমনাগমন	ভাববিনিময়	প্রযুক্তিবিদ্যা	জীববিজ্ঞান/রসায়ন	পদার্থ/গণিত
১৮০০				অজৈব রসায়ন	
	রেলগাড়ি	ক্যামেরা			
	বাষ্পীয় জলযান	টেলিগ্রাফ			স্পেকট্রোস্কোপ
			ইলেকট্রিসিটি	জৈব রসায়ন	
		টেলিফোন			ইলেকট্রোম্যাগনেটিজম
		ফোনোগ্রাফ		বিবর্তনবাদ	
	মটোর গাড়ি	সিনেমা	ডিজেল এঞ্জিন		
১৯০০			পেট্রোল এঞ্জিন		এক্স-রে
	এয়ারোপ্লেন			জেনেটিকস্	ইলেকট্রন
			ভ্যাকুয়াম কক্ষ	ভিটামিন	রেডিও-এ্যাকটিভিটি
				প্লাস্টিক	
১৯১০					পরমাণুর রূপ
		রেডিও			আইসোটোপ
				ক্রমোসোম	কোয়াণ্টাম থিয়োরি
১৯২০				জীন	আপেক্ষিকতাবাদ

সাল	গমনাগমন	ভাববিনিময়	প্রযুক্তিবিদ্যা	জীববিজ্ঞান/রসায়ন	পদার্থ/গণিত
১৯৩০		টেলিভিশান		হর্মোন	নিউট্রন
১৯৪০	জেট/রকেট		রেডার		
	হেলিকপ্টার	টেপ-রেকর্ডার			
		ইলেকট্রনিক কম্পুটার	এ্যাটম বোমা		ইউরেনিয়াম ফিসন্
১৯৫০				সিন্থেটিক	রেডিও এ্যাস্ট্রনমি
		ট্রানজিস্টার		এ্যাণ্টিবায়োটিক	
	কৃত্রিম উপগ্রহ		হাইড্রোজেন বোমা		
	হোভার ক্রাফট্		লেসার		
১৯৬০	মহাকাশ যান চন্দ্রে উপনীত	কৃত্রিম উপগ্রহ মাধ্যমে টি. ভি	পারমাণবিক শক্তির ব্যাপক ব্যবহার	প্রোটিন স্ট্রাকচার	
	মহাশূন্যে পাইওনিয়ার প্রেরণ				

প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতিতে পৃথিবীর চেহারা আমূল পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে। বিস্তারিত আলোচনার এখানে স্থানাভাব। একটি মাত্র উদাহরণ দেখাই। গত দশকেই 'হোভারক্রাফ্‌ট'-যান (G. E, M) আবিষ্কৃত হয়েছে। তার চাকা নেই, সেটা মাটি স্পর্শ করে চলে না—মাটি থেকে কয়েক ফুট উপর দিয়ে চলে। ইটালীর কাপ্রি ভ্রমণকালে সেটার কার্যকারীতা প্রত্যক্ষ করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। সমতল ক্ষেত্রের উপর দিয়ে জাহাজের চেয়ে দ্রুততর গতিতে সে যেতে পারে। এটির উন্নতি হলে কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ শুধু নয়, পৃথিবীর যাবতীয় বন্দরের চেহারা আমূল পালটে যাবে। কারণ তখন হোভারক্রাফ্‌ট-জাহাজ উপকূলভাগের যে কোন অংশ দিয়ে— বাধাহীন পথ পেলে সোজা দেশের ভিতরে চলে গিয়ে থামবে। সুইজারল্যাণ্ডের পক্ষে তখন পৃথিবীর বৃহত্তম বন্দর বানাতে কোন অসুবিধা থাকবে না। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে তখন 'ডি-ডে' বলে কিছু থাকবে না। কারণ ঐ জাতীয় যন্ত্রের অধিকারী হওয়ায় আগামীযুগের আইসেনহাওয়ার নর্ম্যাণ্ডি উপকূলে জাহাজ থেকে আদৌ অবতরণ করবেন না—জাহাজ নিয়েই সোজা সে-যুগের বার্লিনে পৌঁছে যাবেন!

বাহ্যিক পরিবর্তন নিয়েই এতক্ষণ আলোচনা করেছি—জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা, খাদ্য-সমস্যা, প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতি প্রভৃতি। এবার বরং দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে দেখবার চেষ্টা করি, ঐ সব বিবর্তনের জন্য মানবিক মূল্যবোধ—যাকে ইংরাজিতে বলি ' হিউম্যান ভ্যালুজ', কতটা পরিবর্তিত হবে। ভবিষ্যতে, যুগের পরিবর্তনে মানুষের ধ্যান-ধারণা, তার ব্যক্তিগত, পরিবারগত সমাজগত ও জাতিগত জীবনকে কী-ভাবে রূপান্তরিত করবে।

আমার তো মনে হয়—পরিবর্তনটা সর্বত্র সমান তালে হবে না। আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানবিক মূল্যায়নে বিবর্তিত হচ্ছি বিভিন্ন রীতিতে। গত একশ' বছরে, পশ্চিম-খণ্ডের জীবনযাত্রা

যতটা দ্রুতচ্ছন্দে পরিবর্তিত হয়েছে, আমাদের পরিবর্তন তার চেয়ে অনেক কম। আমরা অনেক ঢিমে-তালে চলতে অভ্যস্ত। এখানে আমি প্রযুক্তিবিদ্যার কথা, জাতীয়-জীবনের উন্নতির কথা বলছি না কিন্তু। বলছি, সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তনের কথা।

বিধবা-বিবাহ আইন-সম্মত হয়েছে একশ' বছরের উপর—আমাদের সমাজে আজও তা ব্যাপক ভাবে গৃহীত হয় নি। তিন-আইনে অসবর্ণ-বিবাহ আইনসিদ্ধ হয়েছিল—ঐ বিদ্যাসাগর মশায়ের প্রচেষ্টাতেই—১৮৭২ সালে। গত দশক পর্যন্ত আমাদের উচ্চকোটি সমাজে তা অনুমোদন লাভ করে নি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরিবর্তনটা ইদানিং দ্রুতগতিতেও হতে দেখছি। 'বিলাত গেলে জাত যায়' এই ধারণাটার বিরুদ্ধে আমার পিতৃদেবকে কয়েক দশক ধরে যুক্তি-তর্ক পেশ করতে দেখেছি আমার জীবনেই। বর্তমান-দশকে আমার পরিবারেই একাধিক নিকট আত্মীয়কে কালাপানি পার হতে দেখলাম! বিশ বছর আগে আমাদের পরিবারে বিবাহ-সম্বন্ধ এলে শুধুমাত্র 'বারেন্দ্র' এবং 'ভিন্ন গোত্রের' ছাড়পত্র পেলেই চলত না, তাঁরা 'কুলীন' কিনা দেখে নেওয়া হত। বর্তমানে সেখানে একাধিক অব্রাহ্মণের সঙ্গে অসবর্ণ-বিবাহ সামাজিক অনুমোদন পেয়েছে দেখতে পাচ্ছি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে যে-সব একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের চিত্র আছে—আজকের সমাজে, মাত্র পঞ্চাশ বছরের ভিতরেই তা প্রায় অবাস্তব। সুতরাং বলতে পারা যায়—আমাদের সামাজিক বিবর্তনও ঐ এক্সপোনেন্সিয়াল-হারে হচ্ছে! যত দিন যাচ্ছে, পরিবর্তনের 'হার' তত বাড়ছে।

ঐ সূত্র ধরেই একশ' বছর পরের সমাজ-ব্যবস্থার কাল্পনিক চিত্রটি আঁকতে হবে। কতকগুলি 'কারণ' বা 'হেতু' নজরে পড়ছে, তারই সূত্র ধরে আন্দাজ করতে হবে 'পরিণাম'কে।

এক নম্বর হেতু হচ্ছে 'অর্থনৈতিক'। উপরতলার মুষ্টিমেয়

অতি ধনবান, যাঁরা কৃষ্ণমুদ্রার অধিকারী, তাঁদের কথা বাদ দিলে— মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের আয়বৃদ্ধি অপেক্ষা ব্যয়বৃদ্ধি হয়েছে। ফলে, মানুষের স্বার্থপরতা, সঙ্কীর্ণতা স্বভাবতই বাড়ছে। শহরে উকিলবাবু, ডাক্তারবাবু বা পাটের দালালবাবু আছেন, সুতরাং গ্রাম থেকে দশ-বিশজন ছাত্র এসে তাঁর একতলায় পড়ে থাকবে—কলেজে পড়বে বা চাকরি করবে সে ব্যবস্থা আজকাল আর হয় না। বাড়ির কর্তা রোজগার করেন এবং তাঁর ভাইপো-ভাগ্নের দল বসে খায়— এ সম্ভাবনাও অল্প। দু-ভাই যখন বিবাহ করে, উপার্জন শুরু করে, তখন আজকাল তারা সচরাচর পৃথগন্ন হয়। তবু বুড়ো বাবা বা মাকে কেউ একজন আশ্রয় দেয়। আগামী যুগে বুড়ো বাপ-মায়ের অবস্থা হবে আজ পশ্চিম-খণ্ডে বুড়োর দলের যে অবস্থা। উপার্জনক্ষম পুত্র-কন্যার সংসারে থাকা তাঁদের পক্ষে বাঞ্ছনীয়ও হবে না, সম্ভবপরও নয়। পরিবার আরও ছোট হয়ে যাবে। শুধু পিতা-মাতা নয়, পুত্র-কন্যাও যৌবনে পদার্পণ করেই পৃথক হতে চাইবে। অর্থাৎ ভারতবর্ষের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থা হবে আজকের দিনের পশ্চিম-খণ্ডের মত।

দ্বিতীয় হেতুটা হচ্ছে 'গতি'। দুনিয়া ছোট হয়ে আসছে। গ্রাম ও শহরের মধ্যে ব্যবধানটা কমে যাচ্ছে। গতিবেগ যত বাড়ছে ততই অন্যান্যভাবে প্রভাবিত হচ্ছে জীবন। মার্কিন-মুলুকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সম-সময়ে একজন আমেরিকান গড়ে বছরে প্রায় ৪৮২ কিলোমিটার ভ্রমণ করত। এখন সে গড়ে প্রায় ষোলো হাজার কি. মি. ভ্রমণ করে (৭)। এই ষাট-বাষট্টি বছরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জন-সংখ্যার বৃদ্ধি হয়েছে ৩৮.৫ শতাংশ, অথচ রাস্তার বৃদ্ধি হয়েছে শতকরা শতভাগ। সারা পৃথিবীর প্রতিটি অগ্রসর দেশেই এটা ঘটেছে, কম আর বেশি। এই যে ছোটাছুটি, এর প্রভাব মানব-জীবনে পড়বেই। এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা না করে এটুকু বলতে পারি, একশ' বছর পরে হয়তো আমাদের অনেককেই

অমিত্রায়ের মত বলতে শোনা যাবে, "ঘড়ির দিকে চোখ রেখে চলতে চলতে যা-কিছু সকল সময়ের অতীত তার দিকে চোখ তুলবার সময় পাইনি।"

হয়তো ভুল বললাম। 'অনেক কেই ও-কথা বলতে শোনা যাবে না। বলবে মুষ্টিমেয় মানুষ, যাদের আর পাঁচজন বলবে—পাগল! আমাদের মানসিকতাই এমনভাবে বদলে যাবে যে, আমরা যে কী হারাচ্ছি তা আমরা খেয়ালই করব না! তার কারণও ঐ অর্থনৈতিক অবস্থা এবং গতি, তাছাড়া তৃতীয় হেতু—যাকে বলব 'অবকাশের অভিশাপ'। মানুষ তখন অঢেল অবকাশ পাবে। প্রযুক্তি-বিদ্যার উন্নতিতে। হাজার জন মানুষে যা করে একটি যন্ত্র তা করবে। পশ্চিম-খণ্ডে এখন সপ্তাহে দু-আড়াই দিন অবকাশ—শনি-রবি। এটা আরও বাড়বে। অবকাশ কী-ভাবে অতিবাহন করা যাবে সেটাই দাঁড়াবে সমস্যা! কথাটা অদ্ভুত মনে হলেও এটা একটা সম্ভাব্য সমস্যা যা ভবিষ্য-বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে। আপনি হয়তো ভাবছেন—অবকাশ যত বেশি হবে, ততই মানুষ সুকুমার বৃত্তিগুলোর দিকে বেশি করে দৃষ্টি দেবার সময় পাবে। উন্নত হবে বিভিন্ন ললিতকলা—চিত্রকলা, ভাস্কর্য, সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি। আমি একমত হতে পারলাম না। আমার আশঙ্কা সেগুলির ক্রমাবনতি ঘটবে। কারণ? একই পদ্ধতিতে পিছন ফিরে দেখুন। মিলিয়ে নিন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মহাকাব্যের যুগ গেছে। কথাটা আরও ব্যাপকভাবে নিতে ইচ্ছে করছে—মহৎ শিল্পের যুগও গেছে। শুধু রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়ার্ড-ওডিসিই নয়, আজকের সাহিত্যজগতে —সেক্ষপীয়র, মিলটন, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথও ফিরে আসতে পারবেন না! বিটোফেন, মোজার্ট, লিওনার্দো, মিকেলাঞ্জেলোর শেষ উত্তর-সাধক বোধকরি চার্লি চ্যাপলিন! কোন সুকুমার-শিল্পেই আজ একক প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর নয়—আর্ট ক্রমশঃ ক্রাফ্‌টের

আওতায় এসে যাচ্ছে। সবই যৌথ প্রয়াস। ত্রিশ বছর আগে শিশিরবাবুর অভিনয় দেখতে যেতাম, আজ যাই উৎপলের 'প্রডাক্‌শান' দেখতে। মার্কিন-মুলুকে পাহাড় কেটে প্রাক্তন-প্রেসিডেন্টদের যে মূর্তি রচিত হয়েছে এবং হচ্ছে সেগুলি আকারে নিশ্চয় সিস্‌টিন-চ্যাপেলের চিত্রাবলীর চেয়ে বড়—কিন্তু মিকেলাঞ্জেলোর মত তা একা হাতের কাজ নয়।

তাছাড়া 'অবকাশ' সবসময়ে সভ্যতার সহায়ক নয়, ক্ষতিকারক। দু-একটি উদাহরণ দিই। বহু শতাব্দী আগে একদল দুর্ধর্ষ ফোনিশিয়ান নাবিক বেরিয়ে পড়েছিল নূতন দিগন্তের সন্ধানে। প্রশান্ত মহাসাগরের কতকগুলি ক্ষুদ্র দ্বীপে অবতীর্ণ হল তারা—'ইস্টার' দ্বীপ। যা দেশে খুঁজে পায়নি তাই পেল—সহজলভ্য খাদ্য, পানীয়, নারীসঙ্গ। দিবারাত্র জীবনসংগ্রামে যারা ছিল অভ্যস্ত, তারা পেল অখণ্ড অবকাশ। দেশে ফিরে গেল না তারা। বহু বর্ষ পরে যখন সভ্যজগতের নাবিক দ্বিতীয়বার আবিষ্কার করল ঐ দক্ষিণ-সমুদ্রের ইস্টার আইল্যাণ্ডকে তখন দেখল, তাদের পূর্বসূরীরা নিজেদের সবকিছু খুইয়ে আরামপ্রিয় অলস আদিম দ্বীপবাসীর সগোত্র হয়ে গেছে। তাদের পূর্বযুগের উন্নত সভ্যতার সাক্ষীরূপে দ্বীপের এখানে ওখানে মাটিতে পোঁতা আছে তাদেরই পূর্বপুরুষের তৈরী অতি বিরাটকায় পাথরের মূর্তি। দ্বীপবাসীরা জানে না—ঐ মূর্তিগুলি কারা, কেন বানিয়েছিল! দ্বিতীয়তঃ পশ্চিমখণ্ডের হিপ্পিদের দেখুন। ওদের প্রাচুর্য যথেষ্ট, অন্নাভাব ওদের ভবঘুরে করেনি। বরং অবকাশ যাপনের উপায় খুঁজে না পেয়ে ওরা এল. এস. ডি, মাজুরিনার শরণাপন্ন হচ্ছে।

চতুর্থতঃ 'নন্দনতত্ত্বের নব-মূল্যায়ন'। এই শতাব্দী শেষ হওয়ার পূর্বেই হয়তো পশ্চিমখণ্ডে 'বেবিটোরিয়াম' (babytorium) যন্ত্রটা বাস্তবায়িত হবে (৮) এবং পরের দশকে তা ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছাবে। 'বেবিটোরিয়াম' বস্তুটা কী? সহজবোধ্য জবাব—

এ্যাকোয়ারিয়ামে যদি জলজন্তুর সাক্ষাৎ মেলে, প্ল্যানাটোরিয়ামে মেলে গ্রহ-নক্ষত্রের, তবে বেবিটোরিয়ামে পাওয়া যাবে খোকা-খুকু! এখনই জেনেটিক-বিজ্ঞান ঔষধ ও ইনজেক্শনের মাধ্যমে গর্ভস্থ ভ্রূণকে বেশ কিছুটা নিয়ন্ত্রিত করতে পারছে। অদূর ভবিষ্যতে ঔষধ প্রয়োগে অজাত সন্তানের লিঙ্গ, বুদ্ধিমত্তা বা আই. কিউ. গাত্রবর্ণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত হবার সম্ভাবনা। তার পরবর্তী পর্যায়ে এক নারীর গর্ভস্থ নিসিক্ত-বীজকে অপর নারীর গর্ভে বপন করা সম্ভবপর হবে। শুধু সম্ভবপর নয়, সেটাই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করবে ভবিষ্যতের দম্পতি—কারণ সে-ক্ষেত্রে অজাত সন্তানের আকৃতি ও প্রকৃতি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হবে। কে না চাইবে--তার কন্যা মার্লেন ডিয়াট্রিচের মত সুন্দরী হোক অথবা বার্ণাড শ'র মত পণ্ডিত হোক? বেবিটোরিয়ামে ভ্রূণ কিনতে পাওয়া যাবে। ভ্রূণ অর্থে নিসিক্ত-বীজ—কাচের জারে রাখা অবস্থায়। তার গুণাগুণ এবং মূল্য লেখা থাকবে তালিকায়। সন্তান তো সুন্দর ও বুদ্ধিমান হল—কিন্তু তার প্রকৃত পিতামাতা কে? প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সন্তানের থাকবে একজোড়া প্রাণীবিজ্ঞান-সম্মত পিতা-মাতা এবং একজোড়া পালক পিতামাতা। অনেকটা আমাদের দত্তক প্রথায় যা ছিল। কিন্তু এতে মাতৃত্বের সংজ্ঞাটাই বদলে যেতে বসবে না কি? শুধু মাতৃত্ব নয়। পিতৃত্বেরও। যে অনুভূতি আজ আছে পিতামাতার—ঠিক সে অনুভূতি আর হয়তো তখন থাকবে না। তাছাড়া শিশু-বিজ্ঞান বলছে— শিশুর পরিণতি বহুলাংশে নির্ভর করে শৈশবে তাদের পিতামাতার ব্যবহারের উপর। শিশুপালন একটা বিশেষ জাতের আর্ট। ভবিষ্যতের স্পেশালাইজেশানের যুগে—যখন পিতামাতা দুনিয়াদারীর ধান্দায় ক্রমাগত ছোটাছুটি করছে, তখন শিশুদের মানুষ করবার জন্যও লোকে বিশেষজ্ঞ খুঁজবে। আজ পশ্চিমখণ্ডে 'ক্রেশ' চালু হয়েছে। মায়েরা কাজে যাওয়ার সময় বাচ্চা জমা দিয়ে যায়, কাজ থেকে ফেরার পথে বাচ্চা ফেরত নিয়ে যায়। ভবিষ্যতে দৈনিক নয়, দু পাঁচ বছরের জন্য বাচ্চাকে ঐ জাতীয়

প্রতিষ্ঠানে রাখতে বাধ্য হবে বাবা-মা। তাহলে সন্তানের সঙ্গে পিতা-মাতার সম্বন্ধটা কি-জাতের হবে?

তা আন্দাজ করতে পারছি না, তবে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' ফর্মুলাটা আর কার্যকরী থাকবে না। সতীত্বের ধারণাটা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হলে, যৌনজীবনের প্রচলিত নিষেধাজ্ঞা শিথিলতর হলে, দ্বিতীয় কারণেও মানুষ বিবাহ করবে না। তখন 'বিবাহ' এ ধারণাটা যদি আদৌ থাকে, তবে সেটাকে মেনে নেবে একটা চুক্তি হিসাবে। স্বামীস্ত্রীর সম্পর্কটা দাঁড়াবে অনেকটা বন্ধুত্বের পর্যায়ে। পারস্পরিক সুবিধার জন্য এক ছাদের তলায় থাকা এবং এক বিছানায় শোওয়া। 'প্রেম' শব্দটার সংজ্ঞাও হয়তো বদলে যাবে। বিবাহ তখন দীর্ঘস্থায়ী হওয়া দুষ্কর হবে—ঐ দ্রুতছন্দ জীবনের জন্য। স্বামী ও স্ত্রী উভয়েই তো ক্রমাগত ঠাঁই বদলাচ্ছে—বিভিন্ন কর্মচক্রপথে। ফলে সাময়িক-বিবাহ প্রথা চালু হতে পারে। তাতে কোন পক্ষই দোষ ধরবে না। এখনই এ সব লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠছে অতি-অগ্রসর দেশের সমাজ জীবনে—মার্কিন মুলুকে, কিম্বা সুইডেন-এ। সেখানকার দ্রুতছন্দ বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পুনর্বিবাহ তো ঐ অবস্থারই প্রথম পর্ব। সমাজ বিজ্ঞানী জেসি বার্নার্ড বলছেন, Plural marriage is more extensive in our society today than it is in societies that permit polygamy—the chief difference being that we have institutionalised plural marriage serially or subsequentially rather than contemporaneously." [যে সব সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত তাদের চেয়ে আজ আমাদের সমাজে বহুতর বিবাহ ঘটছে। মূল তফাতটা এই যে, আমরা একসঙ্গে অনেকগুলি বিবাহ না করে একের পর একটি করছি।] বিবাহ-বিচ্ছেদ ও পুনর্বিবাহ ও দেশে এমনই ডাল-ভাত যে, আমেরিকায় একটি মেয়ে চাকরির দরখাস্তে ফর্ম ভর্তি করার সময় কী লিখবে ভেবে পায়নি। 'ম্যারিটাল স্ট্যাটাস্' প্রশ্নের খোপে তাকে প্রশ্ন

করা হয়েছিল—'তুমি কি কুমারী, বিবাহিত, বিধবা অথবা পুনর্বিবাহিত?' মেয়েটি অনেকক্ষণ তার 'ডট পেন' কামড়ে কি ভাবল, তারপর লিখল,—'কোনটাই নয়, আমি অপুনর্বিবাহিত (unremarried) !'

পৃথিবী—গল্প ঃ

সভাপতি পার্থিব রায় তার সভায় সমবেত জন-সমষ্টির দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। জমায়েতে হাজির হয়েছে জনাপঞ্চাশ নরনারী, বুড়ো-বাচ্ছা-যুবক-যুবতী। কে বলবে এটা একবিংশ-শতাব্দীর শেষ পাদ! মানুষ চাঁদে, শুক্রে, মঙ্গলে উপনিবেশ স্থাপন করেছে! সভাস্থ পুরুষেরা কেউ পাঁচফুটের বেশী লম্বা নয়, নিকষ-কালো, উদোম গা। পরনে একটিমাত্র কোপনি। কারও কারও মুখে রাঙামাটির বিচিত্র আলিম্পন। স্ত্রীলোকদের মাজা থেকে হাঁটু পর্যন্ত একখণ্ড বস্ত্র। ঊর্ধ্বাঙ্গ অধিকাংশেরই অনাবৃত। তারা অতি-আধুনিক টপ্‌লেস্ নয়। তাদের চৌদ্দ পুরুষ, থুড়ি, চৌদ্দ রমণী কস্মিনকালেও মাতৃত্বের যুগল জয়স্তম্ভকে লোকচক্ষুর অন্তরালে নেবার কথা ভাবেনি। ওরা আজও চাষ-আবাদ করে না। আগুন জ্বালতে জানে না—তাই জ্বলন্ত কাঠ যত্নে সাজিয়ে রাখে বিয়ারায় (কুঁড়ে ঘরে)। কোন কোন স্ত্রীলোকের কণ্ঠে স্তনযুগলের অলঙ্করণ এক ছড়া মালা—তাতে আছে মৃতজন্তুর হাড়, সামুদ্রিক ঝিনুক অথবা মৃত নিকট-আত্মীয়ের দন্তপাতি-লাঞ্ছিত নিচের চোয়াল! মানব ভাগ্যের ওঠানামার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করে আত্মসমাহিত তেঁতুল গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে ভারত ভূখণ্ডের একান্তে এই আঙ্গে-সমাজ।

ছোট্ট একটি সমুদ্র-মেখলা দ্বীপ। উত্তরে আন্দামান, দক্ষিণে নিকোবর। তার কেন্দ্রস্থলে সমুদ্র যেন জোড়া-ভ্রূর মাঝখানে সবুজ দ্বীপের একটি টিপ পরেছে! দ্বীপটির নাম লিট্‌ল্ আন্দামান—বা

ছোট আন্দামান। দৈর্ঘ্যে তেতাল্লিশ কিলোমিটার, প্রস্থে মাত্র চব্বিশ কিলোমিটার। দুনিয়া জেটোত্তর প্লেনের গতিতে এগিয়ে গেছে, কিন্তু ওরা আছে প্রায় ওদের আদিম অবিকৃত অবস্থায়। অতি যত্নে, অতি সাবধানে ওদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে।

সমগ্র বিশ্বে আদিম জাতিরা একে একে চলে গেছে ইতিহাসের মহানেপথ্যে। অথবা সভ্যতার সংস্পর্শে এসে এমনভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেছে যাতে তাদের আর সনাক্ত করা যায় না। এখনও সামান্য কয়েকটি বিক্ষিপ্ত স্থানে দু-একটি আদিম জাতির সন্ধান মেলে। অষ্ট্রেলিয়ায়, নিউ গিনিতে, প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপে। আফ্রিকার আদিম নিগ্রো-মানবগোষ্ঠি অবলুপ্ত, আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ান অসভ্যতা মৃত। তাই ভারত সরকার অতি যত্নে এদের বৈশিষ্ট্য সমেত বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন। ডক্টর পার্থিব রায় সেই উদ্দেশ্যেই এসে আস্তানা গেড়েছে ওখানে।

সবরকম প্রচেষ্টা সত্বেও ওরা ক্রমশঃ লুপ্ত হয়ে যেতে বসেছিল। সভ্যজগত ঐ 'আঙ্গে' জাতির সন্ধান পেয়েছিল প্রায় দু-শ' বছর আগে, বস্তুত ১৮৬৭ সালে, যখন ঐ দ্বীপের কাছে নোঙর গেড়ে 'আসাম ভ্যালী' জাহাজের কাপ্তেন কয়েকজন নাবিককে নিয়ে দ্বীপের দিকে নৌকা নিয়ে 'কাষ্ঠাহরণে' গিয়েছিলেন এবং আর ফিরে আসেন নি। তাঁর অন্যান্য সহকর্মীরা, যারা জাহাজে অপেক্ষা করছিল তারা যদি বলতে পারত—'তোদের নবকুমার কি আছে? তাহাকে শেয়ালে খাইয়াছে'—তাহলে হয়তো লেঠা চুকে যেত। কিন্তু তারা সে কথা না বলে দ্বীপে কি-জাতীয় শেয়াল আছে তা দেখতে গেল। দেখা পেল 'আঙ্গে'দের। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ওদের সমাজের ভিতর প্রবেশ করে কোন কাজ করা যায় নি। ওরা তীর-ধনুক, বল্লম নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছিল—ওদের দ্বীপে জাহাজ থেকে সভ্যতাকে নামতে দেবে না। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মনে হল ওদের সংখ্যা ছয় সাত শ'। কমতে কমতে ১৮৬১ সালে

তাদের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মাত্র একশ উনত্রিশে (৯)। পরের দশকে, ১৯৭১ সালে সেটা নেমে এল ১২০-তে। ভারত সরকার উঠে পড়ে লাগলেন। ছোট্ট আন্দামান দ্বীপের ঐ আদিম নিগ্রয়েড জাতিটিকে ডোডো-পাখির সমগোত্রীয় কিছুতেই হতে দেবেন না। ভারতবর্ষে যখন আর্যরা এসেছিল তারও পূর্বে নাকি এখানে ছিল এক দ্রাবিড় জাতি। তাদেরও আগে নিগ্রয়েড-জাতির একটি শাখা এ-দেশে আসে আফ্রিকা অঞ্চল থেকে। এই সওয়া শ' 'আঙ্গে' সেই অতি-আদিম প্রাগৈতিহাসিক ঘটনার একটি জীবন্ত প্রমাণ। তাই ওদের বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।

গবেষণা করে দেখা গেল—ওদের বংশবৃদ্ধি না হওয়ার অনেকগুলি হেতু। প্রথম কথা—ঐ আদিম বন্য সমাজে বহুবিবাহের চলন নেই! ওদের স্ত্রীলোকেরা দ্রৌপদীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারেনি, পুরুষেরাও কুলীনকুলতিলকদের মত পুত্রার্থে একাধিক ভার্জা ঘরে আনত না। দ্বিতীয় কথা, ম্যালেরিয়া, নিমুনিয়া প্রভৃতি রোগের বেশ প্রাদুর্ভাব। তৃতীয়তঃ, নৌকা ডুবিতেও প্রায়ই একসঙ্গে অনেক লোক প্রাণ হারায়। বোঝা গেল, আঙ্গেদের টিকিয়ে রাখতে গেলে ওদের ঔষধ-পথ্য দিতে হবে, স্বাস্থ্যবিধির প্রাথমিক নিয়ম-কানুন শেখাতে হবে। ওরা দাঁত মাজে না, স্নান করে না, খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই। এসব স্বাস্থ্যবিধির আধুনিক নিত্যকর্ম-পদ্ধতিতে শিক্ষিত করতে পারলে তারা টিকে থাকবে বটে, কিন্তু 'আঙ্গে' রূপে বেঁচে থাকবে না। ভারত সরকার তাই একদল বিশেষজ্ঞকে নিযুক্ত করলেন এই কাজে—তাঁরা দেখবেন জাতিগত বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও কেমন করে ওরা বংশবৃদ্ধি করে। আঙ্গেদের বিষয়ে নৃতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা করতে আন্দামানে এসেছে ডক্টর পার্থিব রায়। আজ মাসখানেক হল সে আছে এখানে।

ডক্টর পার্থিব রায়। বছর ত্রিশেক বয়স। অত্যন্ত দীর্ঘকায় —একশ তিরাশী সেন্টিমটার, অর্থাৎ ছয় ফুট। বাঙালী, যদিও বাঙলা

দেশকে প্রথম দেখেছে বিশ বছর বয়সে। ওর জন্ম ও বাল্যকাল কেটেছে কোপারনিকাস বেস্-এ। অর্থাৎ চাঁদে। হয়তো চাঁদে অভিকর্ষ কম বলেই চাঁদে-জন্ম, চাঁদে-মানুষ পার্থিব এতটা লম্বা হয়েছে। ওর বাবা প্রণব রায়, একজন নামকরা লুনোলজিস্ট। কোপারনিকাস এ্যালয় ষ্টীলের জেনারেল ম্যানেজার। ওর মা কোপারনিকাস মাল্টিপারপাস স্কুলের প্রিন্সিপাল। পার্থিব সেখান থেকেই স্কুল-লিভিং-সার্টিফিকেট নেয়। প্রণব রায়ের ইচ্ছা ছিল—ছেলে এঞ্জিনিয়ার হোক, কিন্তু সে পড়তে চাইল নৃতত্ত্ব। অগত্যা ওকে পৃথিবীতে পাঠাতে হল। সেখানেই ডক্টরেট করেছে এবং ডিগ্রি প্রাপ্তিতে না থেমে নূতন-নূতন পথে গবেষণা করে চলেছে। জীব-বিজ্ঞান এবং নৃতত্ত্ব দুটি বিষয়েই সে যৌথ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ওর বিচিত্র সব খেয়াল। কিছু দিন পড়ে ছিল জীবাণু নিয়ে। তাদের নিয়ে কয়েক মাস নাড়া-চাড়ার পর বোধকরি বৈচিত্র্যের সন্ধানেই মেতেছে আঙ্গেদের নিয়ে। জীবাণুদের ক্ষেত্রে যদিও সে তাদের সগোত্র হবার চেষ্টা করেনি কিন্তু এখানে এসে ও মনে-প্রাণে আঙ্গে হবার চেষ্টা করছে। না হলে নাকি সবটাই সৌখীন মজদুরি হয়ে যাবে। তাই এই অন্তেবাসীর দ্বীপে আজ মাসখানেক সে নখ-চুল-দাড়ি কাটেনি ; আছে খালি গায়ে, খালি পায়ে। গলায় পরেছে মৃত-মানুষের দন্তপাতির মালা, মুখে এঁকেছে 'আলাম'-এর (শূকরের চর্বি) সঙ্গে 'উয়াই' (গিরিমাটি) মিশিয়ে অতি বিচিত্র রক্তিম নক্শা। ওর মাথায় চুল অবশ্য নিগ্রো-ধর্মী কোঁকড়া পশমের নয়, গাত্রবর্ণও নয় আঙ্গেদের মত নিকষ কালো। তাই সাজপোষাকের এত পরিবর্তন সত্ত্বেও তাকে ঠিক হংস মধ্যে বকের মত মনে না হলেও 'লিলিপুটিয়ান-মধ্যে গ্যালিভার যথা' মনে হচ্ছিল।

সভা—সভা ঠিক নয়, চণ্ডীমণ্ডপের জমায়েত বলা চলে—বসেছে দ্বীপের দক্ষিণপ্রান্তে। দশম-অক্ষাংশ প্রণালীর অর্থাৎ সমুদ্র থেকে এক কিলোমিটার ভিতরে ; সেই যেখানে সমুদ্রের উদ্দামতা ঝাউ আর

নারকেল গাছের আন্দোলনে ছড়িয়ে পড়েছে। তার পরেই নিরক্ষরেখা-অঞ্চলের ঘন জঙ্গল। ওরই মধ্যে একটা ফাঁকা অংশ—চারদিক ঘিরে আঙ্গেদের মাচাঙ। আঙ্গে গ্রাম। না। গ্রাম নয়, —ওরা যাযাবর। এক জায়গায় বেশিদিন থাকে না। এটা তাই ওদের একটা সাময়িক আস্তানা। মাঠের মাঝখানে একটা বাঁশ পোঁতা—ওরা বলে 'তেজাই'—তাকে ঘিরে গোল হয়ে বসেছে উলঙ্গ নরনারী। মধ্যমণিরূপে প্রায়-উলঙ্গ সভাপতি ডক্টর পার্থিব রায়, ডি.এস্‌সি! নাচগান উদ্দাম হয়ে উঠেছে। হাতে হাতে ফিরছে গুড্ডা—তামাক পাতা। সব পূজার আগেই যদি গণেশপূজা, তবে ওদের সব শুভকাজের আগেই নাচগান। হঠাৎ কোথাও কিছু নেই ছুটতে ছুটতে এসে হাজির হল বছর দশেকের একটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ বাচ্ছা। হাত-পা নেড়ে অত্যন্ত উত্তেজিত স্বরে সে কিছু বলতে চায়। তালভঙ্গ হল নৃত্যছন্দে। মোড়ল মিংকোপি মহড়া নিল—মাজায় হাত রেখে শুনল বক্তব্যটা। লিখিত ভাষা না থাকলেও ওদের কথ্য ভাষা আছে, তার উপর আছে হাত ও পা, যা নেড়ে কথা বলা যায়। ছেলেটির বক্তব্য ঃ "একটা কোঁচ নিয়ে সমুদ্রের খাঁড়িতে। বর্শায় গেঁথে মাছ। কোথায় মাছ? সব ফসকে যায়! হঠাৎ আকাশে মস্ত কল-শকুন! ঈ বাব্বা! কী চেঁচায়। পড়ল জলে। হুই দূরে। সমুদ্রের মধ্যেখানে। সেখানেই ডিম পাড়ল। ডিম থেকে নৌকার বাচ্চা। সাঙাৎরা ডাঙ্গায় এল বলে। চল সবাই। উপহার! ঢাই ঢাই উপহার! লুঠে নাও!"

প্রাঞ্জল বক্তব্য। প্রাণ জল হয়ে গেল সকলের। বুঝল সকলেই। মায় পার্থিব পর্যন্ত। কলের শকুনটা সী প্লেন। সভ্যজগতের কিছু মানুষ নৌকা করে ডাঙায় আসছে। দেড় দুশ' বছরের অভিজ্ঞতায় ওরা জানে—সভ্যজগতের মানুষ কোন ক্ষতি করে না। তারা দিয়ে যায় নানান জাতের উপহার। তাই তারা 'সাঙাৎ'। রইল পড়ে নাচ-গান সভা-সমিতি। পড়ি-তো-মরি করে

ছুটল সবাই সাগরপানে।

বিস্তীর্ণ বালুকাবেলায় সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত ভূখণ্ডের আদিমতম বাসিন্দার দল। আর তার মাঝখানে 'গ্যালিভার দলে ব্রব্‌ডিগ্‌ন্যাগিয়ান যথা' ডক্টর পার্থিব রায়। কপনিসার, নগ্নপদ, রঙমাখা-মুখ। সে রীতিমত অবাক হয়ে গেছে। পোর্ট ব্লেয়ার থেকে সাহায্য আসার কথা আরও দিন তিনেক পরে। তাছাড়া তারা আসে হেলিকপ্টারে। এটুকু দূরত্বের জন্য সী প্লেনে আসবে কেন?

নৌকাটা বাঁশের মাচাঙ-বাঁধা জেটিতে ভিড়ল। যারা নামল— আশ্চর্য, তারা তো ভারতীয় নয়। কে ওরা? নিশ্চয়ই মঙ্গোলীয়। চীনা, ভিয়েৎনামী অথবা কোরিয়ান। ওদের কাঁধে মেশিনগান ধরণের বিচিত্র আগ্নেয়াস্ত্র। কী চায় ওরা? কেন আসছে?

উপহারের লোভে আদিবাসীরা এগিয়ে গেল ওদের দিকে। হঠাৎ আগন্তুকদল পাশাপাশি হাঁটু গেড়ে বসল, কাঁধ থেকে অস্ত্রটা নামাল এবং মেশিনগান চালানোর ভঙ্গিমায় অস্ত্রটা বাম থেকে দক্ষিণে চক্রাকারে ঘুরিয়ে দিল। না, ওগুলো মেশিনগান নয়। কী তাহলে? ওরা চীৎকার করে উঠল আতঙ্কে। সাঙাৎ তো নয়! পালাচ্ছে! দুদ্দাড়িয়ে পালাচ্ছে প্রাণধারণের তাগিদে। পারছে না। পড়ে যাচ্ছে একের পর এক। অথচ রক্তক্ষরণ হচ্ছে না তো! ব্যাপারটার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বুঝে ওঠার আগেই একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেল পার্থিব। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল আদিম অরণ্যপ্রান্তরে, বালুকাবেলায়।

ঐ ঘটনার বাহাত্তর ঘণ্টা আগেকার কথা। পৃথিবীর অপর প্রান্তে একটা সভার আয়োজন হয়েছে। অপরপ্রান্তে বলতে ঠিক একশ আশি ডিগ্রি ফারাকে—পুব মুখেই যাও কিংবা পশ্চিমমুখে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ অর্লিন্স নগরীতে। সেটাও সমুদ্রতীর, তবে সেখানকার সভ্যতার সঙ্গে এ লিট্‌ল্ আন্দামানী সভ্যতারও একশ আশি ডিগ্রি ফারাক।

ইউ. পি. ও-র একটি জরুরী সভা বসেছে।

ইউ. পি. ও বা 'ইউনাইটেড প্ল্যানেটারী অর্গানিজেশন', অর্থাৎ ঐ আন্তগ্র্ াহিক প্রতিষ্ঠানের বয়স উনষাট বছর। আগামী বৎসর তার হীরক-জয়ন্তী হবার কথা। এখনও পর্যন্ত তার পাঁচজন সভ্য—পৃথিবী, চাঁদ, শুক্র, মঙ্গল ও বুধ। সভ্যদলের বড়দা হতে চান পৃথিবী—এককালে, সেই-যে আমলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে নাকি সূর্য অস্ত যেত না তখন ডোমিনিয়াম-গোষ্ঠীতে যেমন ছিল গ্রেট ব্রিটেন। এখানে কিন্তু ঠিক তা হয়নি ; ওদের মধ্যে একজন হয়ে উঠেছে, দুর্বিনীত, উদ্ধত। পৃথিবীই যে অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহে সভ্যতা বিস্তারের জনক একথা সে যেন ভুলে গেছে। দুর্বিনীত সন্তানটা বাপকে মানতে চায় না, বলে 'জেনারেশন-গ্যাপ !'

সংস্থার সেক্রেটারী-জেনারেল হচ্ছেন সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন নরউইজিয়ান পণ্ডিত—নিতান্ত নির্বিরোধী মানুষ, ডক্টর নিদাগ হ্যামারস্টোন। পৃথিবীর সাতশ-কোটি নরনারীর প্রতিনিধিত্ব করছেন সেনেটর পল মিকেলোভিচ্। আমেরিকান, ধুরন্দর রাজনীতিক—যদিচ তাঁর মুখ্য পরিচয় তিনি বিশ্বপ্রধান মাদাম জেকেলিন ওয়াটকিন্স-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। 'ওয়ান-ওয়ার্ল্ড' আর স্বপ্ন কথা নয়, বাস্তব সত্য। একবিংশ শতাব্দীর এই শেষ পাদে পৃথিবীর প্রতিটি রাষ্ট্রের স্বায়ত্ব শাসনের অধিকার আছে বটে, কিন্তু সকলেই বিশ্ব-সরকারের সার্বভৌমত্ব মেনে চলে। পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন প্রকারের শাসন-ব্যবস্থা চালু আছে—নির্ঝঞ্ঝাট-ধনতন্ত্র, আধা-সমাজতন্ত্র, মেকি-সমাজতন্ত্র, নির্বুজোয়া-সমাজতন্ত্র। তা থাক, তাতে কেউ দোষ ধরে না—গত শতাব্দীতে যেমন এক-এক দেশে এক-এক ধরণের মুদ্রা থাকতে কারও ব্যবসা-বাণিজ্য বা সুইস্-ব্যাঙ্কে নাম-ঠিকানাহীন

এ্যাকাউন্ট খুলতে অসুবিধা ছিল না। একবিংশ শতাব্দীতেও তেমন নানান তন্ত্রবাজী চালু থাকলেও সবাই কেন্দ্রীয় বিশ্ব-সরকারের সার্বভৌমত্ব মেনে চলে। প্রথম দিকে পৃথিবীর দুটি প্রধান শক্তিশালী রাষ্ট্র থার্মোনিউক্লিয়ার শাসনদণ্ডের অধিকারে দ্বৈত-শাসনের প্রবর্তন করেছিলেন—কিন্তু সে দ্বৈত-শাসনকে অন্যান্য রাষ্ট্র দৈত্য-শাসন বলে মনে করল। ওঁরাও অনুধাবন করলেন, একসঙ্গে একাধিক বিবাহের যুগ গেছে, এখন পর্যায়ক্রমে বহুবিবাহ বিধেয়। তাই প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বিশ্বপ্রধানের নির্বাচন হয়। অলিখিত-আইনে প্রথম পাঁচ বছর টুইডল্‌ডাম এবং পরের পাঁচ-বছর টুইডল্‌ডী রাজ্য থেকে বিশ্বপ্রধান নির্বাচিত হন। এই অলিখিত আইনের ব্যতিক্রম করে অবশ্য পর পর দুটি টার্ম বিশ্বসিংহাসন দখল করে আছেন মহামান্যা জেকেলিন ওয়াটকিন্স।

চাঁদে লোকসংখ্যা বেশী নয়, দুই লক্ষ। পৃথিবী যেমনটি আশা করেছিল—চাঁদ রাজনৈতিক-ক্ষেত্রেও তারই উপগ্রহ হয়ে থাকবে, তা ঘটেনি। বর্তমানে তার আধখানা পৃথিবীর এক্তিয়ারে, বাকি আধখানা শুক্রের। গত শতাব্দীতে কোরিয়ায় যেমন আটত্রিশ অক্ষাংশ তাকে দু-টুকরা করেছিল, বর্তমানে চাঁদের ঐ হাল। উত্তর গোলার্ধের মানুষ দক্ষিণ গোলার্ধে যাবার পাস্‌পোর্ট-ভিসা পায় না। মঙ্গলের জনসংখ্যা আরও কম—মাত্র পঞ্চাশ হাজার। বুধ যদিও ইউ. পি. ও-তে একটি আসন পেয়েছে, কিন্তু বুধে উপনিবেশ স্থাপনই করা যায়নি এখনও। সামান্য কয়েক হাজার বৈজ্ঞানিক সেখানে গবেষণারত। দু-তিন সপ্তাহের বেশী সেই বিষম বাতাবরণে মানুষ শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত কক্ষেও টিকতে পারে না। পৃথিবীর সঙ্গে পাঞ্জা কষার স্পর্ধা রাখে, শুধুমাত্র শুক্রগ্রহ। জনসংখ্যা যদিও পৃথিবীর তুলনায় নগণ্য—প্রায় সাত কোটি, অর্থাৎ পৃথিবীর জনসংখ্যার মাত্র শতকরা একভাগ, তবু তারা পৃথিবীর উপর টেক্কা দেবার হুমকি দেখায়। সেটা কেমন করে সম্ভব হল জানতে হলে শুক্রগ্রহে সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসটা

জানতে হয়। শুক্রে 'ব্লু-এ্যাল্‌গী' প্রকল্প চালু হয় ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে এবং মাত্র দশ বছরের ভিতরেই শুক্রের বহিরাবরণে কার্বন-ডায়ক্সাইড এত কমে যায় যে, সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে। ততদিনে পৃথিবী এক কেন্দ্রীয় শাসনের এক্তিয়ারে এসেছে। আগেই বলেছি, বিশ্বরাজনীতি তখন ছিল উপবৃত্তাকার—ইলিপ্‌টিকাল; তার দুটি নাভি বা 'ফোসাই'। একটি নাভি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয়টি রুশদেশ। তৃতীয় আরও একটি রাষ্ট্র নাকি সমানতালে শক্তিশালী হয়ে উঠছিল—কিন্তু তার শক্তির প্রকৃত পরিমাপ করা যায়নি। কারণ কাস্পিয়ান সাগর থেকে প্রশান্ত মহাসাগর পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে বিপুল জনসমষ্টি নিয়ে তারা যে এতদিন ধরে কী করেছে, কী না করেছে তার পাত্তাই পাওয়া যায়নি। পারমাণবিক ফুলঝুড়ি ছড়ানো তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের দেওয়ালী রাত্রি অবশ্য আসনি—সে অমানিশাকে পৃথিবী কোনক্রমে ঠেকিয়ে রেখেছে; কিন্তু লৌহ-যবনিকার অন্তরালে ঐ বেঁটে-বেটারা সেই তালেই আছে কিনা বোঝা যায়নি। ওদের শায়েস্তা করতে রুশ-মার্কিন যৌথ অভিযান চালাতেও এরা সাহসী হয়নি। ওদের উপেক্ষা করাই স্থির হল। ওরা একঘরে হতে আপত্তিও করল না।

কিন্তু একবিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদে—ঐ যখন শুক্রগ্রহ মনুষ্য বাসের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হল, সেই সময়ে আরও একটি জাতি রুশ-মার্কিন শান্তিজোটের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল। তারাও বেঁটে, তাদেরও চোখ কুৎকুতে, তারাও এশিয়াবাসী এবং অনার্য—মঙ্গোলিয়ান। তারা ক্রমে ক্রমে বিশ্বের বাজারে এমন আধিপত্য বিস্তার করেছে যে, রুশ-মার্কিন গোষ্ঠী চিন্তাগ্রস্ত, বিরক্ত, বিব্রত। রাশিয়ায় বা মার্কিন-মুলুকে যা কিছু নূতন প্রযুক্তিবিদ্যার আবিষ্কার হয়, ও-বেটারাও রাতারাতি তা বানিয়ে ফেলে, আর খোদায় মালুম কেমন করে জানি, অনেক সস্তা দরে সেগুলি বাজারে ছাড়ে। ওদের মাথা পিছু গড় আয়ের অঙ্কটা দেখলে এদের মাৎসর্য বিষ-দংশনে খামকা

কষ্ট পেতে হয়। কিছুতেই যখন ঐ বেঁটে বেটাদের কব্জা করা গেল না তখন রুশ-মার্কিন গোষ্ঠী কায়দা করে ওদের নির্বাসন দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন। চক্ষুশূলকে বিতাড়ন কর। স্থির হল, গোটা শুক্রগ্রহটা ওদের ইজারা দেওয়া হবে।

জাপান রাজী হল। সর্ত হল, শুক্রগ্রহের সার্বভৌম অধিকার তাদের দিতে হবে। রুশ-মার্কিন গোষ্ঠী কোনভাবেই ওখানে নাক গলাতে যাবে না। এঁরা রাজী হলেন; বিনিময়ে জাপানও প্রতিশ্রুতি দিল পৃথিবীর বাজারে তারা নাক গলাবে না।

সে আজ ষাট-সত্তর বছর আগেকার কথা। তখন থেকেই শুক্রগ্রহ জাপানের একচ্ছত্র উপনিবেশ। দলে দলে শুধু মাত্র জাপানীরাই মহাকাশ পাড়ি দিয়ে শুক্রে গেল—একদিন পালতোলা জাহাজে য়ুরোপ যেমন অতলান্তিক পাড়ি দিয়ে গিয়েছিল আমেরিকায়। ঠিক সংখ্যাটা জানা যায় না, তবে বাজারে গুজব আদি যুগে নাকি মাত্র বাছা-বাছা শতখানেক জাপানী নরনারী, যাদের আই-কিউ-র পরিমাণ খুব বেশি, তারাই ওখানে উপনিবেশ স্থাপন করতে যায়। কথাটা বিশ্বাস হয় না—মানুষ কিছু ইঁদুর নয়; একশত নরনারী থেকে অর্ধশতাব্দীর ভিতর সাত কোটি মানুষ পয়দা হতে পারে না। এ-বিষয়ে ওরা কিছু বলতে নারাজ। বস্তুত শুক্রগ্রহের চতুর্দিকে ওরা একটা লৌহ-যবনিকা টেনে দিয়েছে। ইতিহাস নিজের পুনরাবৃত্তি—পৃথিবীর নাকের ডগায় এভাবে পরদা টেনে দেওয়াটা পৃথিবী বরদাস্ত করেনি। একজন দুঃসাহসিক মার্কিন নভোচারী—তাঁরও নাম পিয়ারী—এ্যাডমিরাল না হলেও এ্যাস্ট্রনট পিয়ারী, নিষেধাজ্ঞা না মেনে শুক্রগ্রহে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন। পারেন নি। মাঝ রাস্তা থেকেই তাঁকে পাকড়াও করে ওরা চাঁদে ফেরত পাঠায়। দুর্জনে বলে, চন্দ্রে ফেরত পাঠাবার আগে নাকি তাঁর কর্ণমর্দনও করা হয়েছিল। মোটকথা শুক্র সম্পূর্ণ শম্বুকবৃত্তি গ্রহণ করে আছে, পৃথিবীর সঙ্গে কোন রকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক,

সাংস্কৃতিক ডেলিগেট বিনিময় করতে তারা গররাজী। অথচ ওদের প্রতিনিধি পৃথিবীতে 'আসে, মঙ্গলে যায়, ইউ. পি. ও-র অধিবেশনে যোগ দেয়। তাছাড়া পৃথিবীস্থিত ওদের মূল ভূখণ্ডের প্রতিও ওদের তীব্র আকর্ষণ। পৃথিবীর জাপান—অর্থাৎ হক্কাইডো, হনস্যু, কিউস্যু, সিকোকু দ্বীপচতুষ্টয় তাদের খাদ্য, সম্পদ, অর্থনৈতিক পরিবেশ উন্নতমানের রাখতে পেরেছে ঐ গ্রহান্তরের দাক্ষিণ্যে। পৃথিবীর জাপান বিশ্বের বাজারে প্রতিযোগিতা করতে যায় না। তারা স্বয়ম্ভর, আত্মকেন্দ্রিক এবং আত্মসন্তুষ্ট।

বিশ্বপ্রধান মাদাম জ্যাকেলিন ওয়াটকিন্স মার্কিন মহিলা। প্রৌঢ়া—বয়স বিরাশী। প্রোঢ়াই—কারণ এখন মানুষের গড় আয়ু পঁচাত্তর। সওয়া শ' বছরের কর্মক্ষম মানুষ হামে হাল দেখতে পাওয়া যায়। তাই মাদাম জ্যাকেলিন পলিতকেশা বৃদ্ধা নন, রীতিমত শক্ত সমর্থ; পারমাণবিক শক্তিচালিত হেলিকপ্টারে সারা পৃথিবী দাবড়ে বেড়াচ্ছেন এবং বক্তৃতা দিচ্ছেন। মাঝে মাঝে গ্রহান্তরেও যাচ্ছেন সৌজন্য-ভ্রমণে। মাথার চুলে পাক ধরেছে—তাতে তাঁকে আরও সুন্দরা দেখায়।

মাদামের দুই পুত্র এক কন্যা। কন্যাটির বিবাহ দিয়েছেন—ওর স্বামী মঙ্গলগ্রহের গভর্নর। ছোট ছেলেটি—তা সব সুখ কি আর কপালে থাকে—মূর্খ। স্কুলের গণ্ডী পার হতে পারেনি। তা হোক, করিৎকর্মা। মাদাম তাকে অনেক কষ্টে একটি ভাল চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন, যেখানে বুদ্ধির চেয়ে পদাধিকারটাই বড় কথা। অবশ্য দুর্জনে ও-কথা বলে, পীটর ওয়াটকিন্স রীতিমত ইণ্টারভিয়ু দিয়ে সর্বসম্মতিক্রমে ঐ চাকরিটা পেয়েছে। বর্তমানে সে চাঁদে পোস্টেড—'লুনার এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের' ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। ওঁর বড় ছেলেটি রত্ন। যদিও পড়াশুনায় সেও সুবিধা করতে পারেনি—সাধারণ গ্র্যাজুয়েট—তবু বাপের রক্তটা পেয়েছে। বাড়ির চেয়ে বড় বিশ্ববিদ্যালয় আর কোথায় আছে? রাজনীতি পল মিকেলোভিচের

রক্তে। ওর বাবা—মিখেইল মিকেলোভিচ্ হচ্ছেন প্রাক্তন বিশ্বপ্রধান। রাশিয়ান মালটি মিলিওনেয়ার। অবশ্য সেটাও দুর্জনের অপপ্রচার। রুশদেশ সাম্যবাদী—সেখানে 'ক্রোড়পতি' শব্দটাকেই অভিধানে স্থান দেওয়া হয়নি। মাদাম জ্যাকেলিন তাঁকেই প্রথমে বিবাহ করেছিলেন, তাঁর স্বর্গারোহণে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন মার্কিন সেনেটর ওয়াটকিন্সকে। হয়তো এজন্যেই তিনি দু-পক্ষের সমর্থন পান। দু-পক্ষই মনে করে উনি তাদের ঘরের বউ!

অধিবেশন শুরু হল। নিদাগ হ্যামারস্টোন সকলকে স্বাগত জানিয়ে বললেন, আজকের সভার আলোচ্য বিষয়বস্তুগুলি আপনারা মিটিং-এর নোটিশের সঙ্গেই জেনেছেন। এ্যাজেণ্ডা-অনুযায়ী সভার কার্য শুরু হওয়ার পূর্বে সর্বপ্রথমে আমাদের সৌরমণ্ডলের জাতীয় সঙ্গীতটি গীত হবে।

সেক্রেটারী-জেনারেল আসন গ্রহণ করলেন না, দাঁড়িয়েই রইলেন। কারণ পরমুহূর্তেই অর্কেস্ট্রা-পিট-এ সমবেত কণ্ঠে সৌর-মণ্ডলের জাতীয় সঙ্গীত শুরু হল। ঃ গড সেভ দ্য সান্! সকলেই যে-যার আসনে উঠে দাঁড়ালেন। একমাত্র ব্যতিক্রম মঙ্গলের প্রতিনিধি—প্রফেসর নীলস্ ও'টুল। তিনি ভ্রূক্ষেপ করলেন না। নিজ আসনে গ্যাঁট হয়ে বসেই রইলেন। তাঁর এই অসৌজন্যমূলক ব্যবহারে কেউ কিছু দোষ ধরল না অবশ্য। কারণ সভাস্থ সকলেই জানে ও'টুল এবার স্বয়ং এ-সভায় উপস্থিত হতে পারেননি। তাঁর চিহ্নিত আসনে যিনি বসে আছেন তিনি প্রফেসর ও'টুলের ত্রি-মাত্রিক টেলিভিশন ছায়া। মঙ্গলগ্রহে একটি টেলিভিশন-স্ক্রীনের সামনে বসে তিনি এ অধিবেশন যোগ দিচ্ছেন। সেখানে যে-মাত্র জাতীয় সঙ্গীতটি তাঁর কর্ণগোচর হবে, তিনি উঠে দাঁড়াবেন। তাঁর ছায়া উঠে দাঁড়াবে আরও পাঁচ মিনিট পরে। উপায় নেই, পৃথিবী থেকে মঙ্গলগ্রহ বর্তমানে যত দূরে আছে তাতে বেতার-তরঙ্গ যাতায়াতে দশ-মিনিট বত্রিশ-সেকেণ্ড সময় লাগবে। সেকেণ্ডে তিন

লক্ষ কিলোমিটার বেগে দৌড়েও প্রফেসর ও'টুলের শিষ্টাচার তার পূর্বে পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারবে না। সঙ্গীত শেষে এখানে সভাস্থ সবাই যখন উপবেশন করবেন, তখন দেখা যাবে প্রফেসর ও'টুল তড়াক করে উঠে দাঁড়াচ্ছেন।

সভাপতির নির্দেশে চন্দ্রলোকের রাষ্ট্রদূত এ্যাজেণ্ডার প্রথম বিষয়-বস্তুটি উত্থাপন করলেন। বিষয়টি জটিল—একটি আন্তগ্রাহিক সমস্যা। চন্দ্রের রাষ্ট্রদূত ইউ. পি. ও-র নির্দেশপ্রার্থী। ওঁর উত্থাপিত প্রশ্নটা এই :

চন্দ্রলোকে ইতিমধ্যে প্রযুক্তি-বিদ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতি উন্নতিলাভ করেছে। বিশেষ করে ভ্যাকুয়াম-ইণ্ডাস্ট্রি, ইলেকট্রনিক্‌স্ ও অতসী কাচ। অত সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পৃথিবী বা শুক্রে তৈরী করা যায় না, নানান কারণে। চন্দ্রলোকে প্রস্তুত ঐ সব যন্ত্রপাতির সুসম বণ্টন-ব্যবস্থার জন্য একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, যায় নাম 'লুনার এক্সপোর্ট কর্পোরেশন' বা চান্দ্র বহির্বাণিজ্যিক-সংস্থা। চন্দ্রের দুই গোলার্ধেই তার এক্তিয়ার। বিশ্বপ্রধানের কনিষ্ঠ পুত্র পীটর ওয়াটকিন্স তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টার। চন্দ্রলোকে প্রস্তুত যাবতীয় যন্ত্রপাতি কে কতটা, কত দরে কিনতে পারবে তা নির্ধারণ করে দেয় ঐ সংস্থা। ইউ. পি. ও-র নির্দেশে প্রতিটি গ্রহই এতাবৎকাল এই ব্যবস্থা মেনে এসেছে। চন্দ্রলোকের রাষ্ট্রদূত জানাচ্ছেন, সম্প্রতি শুক্রগ্রহ থেকে তাঁদের উত্তর-খণ্ডের শিল্পপতিরা একটি প্রস্তাব পেয়েছেন। শুক্রের বৈদেশিক মন্ত্রী 'লুনার এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের' মাধ্যমে দরখাস্ত না করে ঐ উত্তরখণ্ডের, অর্থাৎ শুক্রপ্রভাবিত অঞ্চলের শিল্পপতিদেরজানিয়েছেন যে, তাঁরা শতকরা পঁচিশভাগ বর্ধিতমূল্যে ওদের কারখানায় উৎপন্ন যাবতীয় মাল ক্রয় করতে ইচ্ছুক। খবরটা গোপন থাকেনি, কারণ শুক্র এই সংবাদটি বেতারে প্রচার করেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে ঐ সময়ে নিখিল-চন্দ্রের কারখানাগুলিতে একটা চরম অবস্থা—লকআউট-ধর্মঘটের দোলায় দুলছিল। মালিক ও মজদুর পক্ষ কোনও সমঝোতায় আসতে পারছিলেন না। শ্রমিকদের বোনাস-বৃদ্ধির দাবী মালিকপক্ষ কোন-

ক্রমে ঠেকিয়ে রাখছিলেন লাভের অভাব দেখিয়ে। সেই ব্রাহ্মমুহূর্তে শুক্রের পক্ষে বেতারে ঐ জাতীয় প্রচারে অবস্থা অত্যন্ত জটিল হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ ইউ. পি, ও-র সনদ অনুযায়ী লুনার এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের মাধ্যম ছাড়া চাঁদের মাল বাইরে বিক্রয় করা বে-আইনি। দ্বিতীয়তঃ পৃথিবী গরীব, বেশি দাম তারা দেবে না। তৃতীয়তঃ বর্ধিতমূল্যের 'অফার' পেয়েও যদি চন্দ্রলোকের শিল্পপতিরা তা অগ্রাহ্য করেন, তাহলে শ্রমিকরা আর ঘেরাও-য়ে সন্তুষ্ট থাকবে না। ধরে ঠেঙানি দেবে। ফলে সমস্যাটা শুধু চন্দ্রলোকের স্থানীয় ব্যাপার নয়, একটা আন্তগ্র্াহিক সমস্যা।

সভায় একটা চাপা উত্তেজনা। নিদাগ হ্যামারস্টোন টেবিলে তাঁর হাতুড়িটা ঠুকলেন। সভায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে। এবার সেক্রেটারী-জেনারেল জানতে চাইলেন, এ বিষয়ে শুক্র-রাষ্ট্রদূতের কি বলবার আছে।

উঠে দাঁড়ালেন জেনারেল কোনো কাওয়াবাতা—শুক্রের আন্তর্গ্রাহিক মন্ত্রী, তথা ইউ. পি. ওর শুক্র মনোনীত সদস্য। শোনা যায় শুক্র-প্রধানের তিনি দক্ষিণ হস্ত এবং উত্তরাধিকারী। খর্বকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তি। চোখে রিমলেস্ চশমা, কণ্টাক্ট-লেন্স ব্যবহারের তিনি বিপক্ষে। লোকে বলে, ওঁর চশমায় পাওয়ার নেই, ওটা ওঁর একটা আভরণ। সমবেত সবাইকে 'আরিগাতো' (জাপানী নমস্কার) জানিয়ে জেনারেল কাওয়াবাতা বললেন, আমাদের রাষ্ট্র যা করতে চাইছেন, তা বৃহত্তর মানবসভ্যতার কল্যাণের জন্যই। আমরা মনে করি—পৃথিবী পরিচালিত পথে মানব সভ্যতা দুই তিন শতাব্দীর মধ্যেই উন্নতির শেষ সীমান্তে এসে থেমে যাবে। বুধকে পোষ মানানো যায়নি, মঙ্গল ও চন্দ্রলোকের কৃত্রিম আবহাওয়ায় আমরা মুষ্টিমেয় মানুষের বসবাসের আয়োজন করেছি। চাঁদ, বুধ এবং মঙ্গলবাসীরা বস্তুত পৃথিবীর স্বার্থে, হ্যাঁ—বলতে পারেন, শুক্রের স্বার্থেও ওখানে কোনক্রমে টিকে আছে। নানান বৈজ্ঞানিক

পরীক্ষাকার্য চালিয়ে যাচ্ছে। মুক্ত আকাশের নিচে তারা যেতে পারে না—তারা আমাদের স্বার্থেই স্বেচ্ছাবন্দী, দুর্বিসহ জীবন যাপন করছে। আশা করি চন্দ্র, বুধ ও মঙ্গলের রাষ্ট্র-প্রতিনিধিরা আমার সঙ্গে একমত ?

জেনারেল ওদের দিকে ফিরে একটি 'বাও' করলেন।

বুধ প্রতিনিধি বললেন, আলবৎ !

চান্দ্র রাষ্ট্রদূত তৎক্ষণাৎ বললেন, একশ বার !

অথচ মঙ্গলের প্রতিনিধি প্রফেসর নীলস্ ও'টুল মৃত পাবদা-মাছের মত একজোড়া চোখ মেলে বসেই রইলেন। নির্বাক।

জেনারেল কাওয়াবাতা সভাপতিকে বললেন, প্রফেসর ও'টুলের জবাবটা স্যার দশ মিনিট বত্রিশ সেকেণ্ড পরে যখন পাওয়া যাবে তখন রেকর্ড করবেন। আপাতত আমি বলে যাই—যে কথা বলছিলাম, মানুষের পক্ষে জীবন তখনই কাম্য যখন সে মুক্ত নীলাকাশের নিচে বাস করবে ! পাহাড়ে চড়বে, নদীতে নৌকা বাইবে, সমুদ্রে অবগাহন করবে, জগতের রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শকে পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে নিবিড়ভাবে উপভোগ করবে—যেমন আপনারা করছেন পৃথিবীতে, আমরা করছি শুক্রে। বদ্ধ খাঁচাতেও পাখী বাঁচে, কিন্তু মুক্ত নীলাকাশে পাখা মেলার অধিকার নিয়েই সে দুনিয়ায় এসেছে !

চন্দ্র বলেন, হিয়ার হিয়ার !

বুধ পুনরুক্তি করেন, আলবৎ !

প্রফেসর ও'টুল যথারীতি পাবদা-মাছ !

কাওয়াবাতা উৎসাহ পেয়ে বলতে থাকেন, আমাদের মনে হচ্ছে পৃথিবী মানব সভ্যতার প্রসার চায় না। চন্দ্রলোকের যন্ত্রপাতি দিয়ে সে শোষণের ব্যবস্থাটাই পাকা পোক্ত করতে চায়। অপর পক্ষে আমরা ঐ যন্ত্রপাতি দিয়ে মানবসভ্যতাকে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিতে চাই। আমি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি—তেমন একটি নূতন দিগন্তের সন্ধান আমরা সম্প্রতি পেয়েছি ! সেই গবেষণার

জন্যই আমাদের পক্ষে যন্ত্রপাতি আরও বেশি পরিমাণে প্রয়োজন। আমরা মনে করি, চান্দ্র কারখানায় আমাদের স্বার্থে যারা আত্মদান করছে তাদের যে মজত্থুরি দেওয়া হয় তা যথেষ্ট নয়; এ জন্য বর্ধিত মূল্য দিতেও আমরা স্বীকৃত। এতে তো অন্যায় কিছু দেখি না। কারও ব্যক্তিগত স্বার্থে চন্দ্রলোকের সব রপ্তানী যদি একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানকে কুক্ষিগত করে রাখার—

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে ওঠেন পৃথিবীর প্রতিনিধি পল মিকেলোভিচ্: অবজেকশান স্যার! 'ব্যক্তিগত স্বার্থ' কথার মানে কি?

জেনারেল-সেক্রেটারিকে রুলিং দিতে হয় না। কাওয়াবাতা নিজেই হেসে বলেন, আই উইথড্র। ব্যক্তিগত স্বার্থ না হলেও গ্রহগত স্বার্থ, পৃথিবীর স্বার্থ।

—না! পৃথিবীর স্বার্থ নয়, সৌরমণ্ডলের স্বার্থ। মানবজাতির স্বার্থ!

সভাপতি পলকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, প্লীস বসুন! আপনার যখন সময় আসবে তখন আপনার বক্তৃতাতেও আমরা বাধা দেব না। আপাতত আমরা জেঃ কাওয়াবাতার কথা শুনছি।

—আমার বক্তব্য শেষ হয়েছে স্যার!—আসন গ্রহণ করেন শুক্র প্রতিনিধি।

এবার উঠে দাঁড়ালেন পল মিকেলোভিচ্। বক্তৃতা দেওয়ার ক্ষমতা ওঁর রক্তে। এক্স-ওয়াই দু-জাতের ক্রমোসমেই আছে বাগবিস্তার-পটুতার 'জীন'। হোম ইউনিভার্সিটিতে বক্তৃতা দিতে শিখেছেন উনি। ঝাড়া দুঘণ্টা বক বক করে গেলেন। তাতে প্রাসঙ্গিকতা না থাকলেও অনেক ভাল ভাল কথা ছিল—সত্যের জয়, সমাজ নীতির কথা, সাংস্কৃতির কথা, মানব সভ্যতার ঐতিহ্যের কথা, তাঁর মহিমময়ী জননী যে সৌরসাম্যের স্বপ্ন দেখেন তার কথা। বললেন, পৃথিবী এগিয়ে চলেছে! সুদিনের উষালগ্ন সমাগতপ্রায়। বর্তমানের এ অন্ধকার শেষরাত্রির অমা। অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীতে

গরীব দেশ বলে কিছু থাকবে না। সবাই সমান খাবে, সমান পরবে, সমান সুযোগে পৃথিবীকে ভোগ করবে। জেনারেল-সেক্রেটারি সভাপতি হিসাবে একবার চেষ্টা করেছিলেন ওঁর বক্তৃতাটিকে প্রাসঙ্গিক করতে, তখন পল মিকেলোভিচ্ ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলেন, আপনি স্যার কথা দিয়েছিলেন, আমার বক্তৃতা দেবার সুযোগ এলে আমাকে বাধা দেবেন না।

যাই হোক দীর্ঘ ভাষণান্তে কাজের কথাও ছিল কিছু। উনি বললেন, চন্দ্রলোকের এই নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা সাম্যের খাতিরে। ক্রেতার ক্রয়ক্ষমতার সঙ্গে বণ্টন-ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত না হলে সাম্যের মর্যাদা থাকে না। শুক্র আজ একটি অতি অগ্রসর গ্রহ। কী করে তারা যে এতটা অর্থনৈতিক উন্নতি করেছে সেটা তারা জানাচ্ছে না। একটা কৃত্রিম যবনিকা তারা টাঙিয়ে রেখেছে নিজেদের চারিদিকে। শুক্র যেন তার শতকোটি বছরের ঐতিহ্যটা ভুলতে পারছে না। সৃষ্টির আদিকাল থেকে যে কার্বন ডায়ক্সাইড আবরণ তাকে গোপন করে রেখেছিল, সেই আবরণটিই এতদিনে নূতন রূপ পরিগ্রহ করেছে যেন। নিজেকে সে যদি গোপন রাখতে চায় তো রাখুক—পৃথিবীর আপত্তি নেই; কিন্তু টাকার জোরে সে যেন ধরাকে সরা জ্ঞান না করে। শুক্রকে কিছুতেই তার বরাদ্দের চেয়ে বেশি যন্ত্রপাতি চন্দ্রলোক থেকে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। তবে তার ক্রয়ক্ষমতা যদি এতই বেশি হয়ে থাকে যাতে সে পঁচিশ শতাংশ বর্ধিত মূল্য দিতে প্রস্তুত, এবং যদি সে মনে করে চাঁদের মজদুরদের যথেষ্ট মজুরি দেওয়া হচ্ছে না, তাহলে সহজেই বিকল্প ব্যবস্থা করা চলে। শুক্রে রপ্তানি মালের উপর পঁচিশ শতাংশ ট্যাক্স বসিয়ে দিলেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে। আশাকরি বুধ ও মঙ্গলের প্রতিনিধি আমাকে সমর্থন করবেন। রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে পল মিকেলোভিচ্ আসন গ্রহণ করেন।

সভাপতি বললেন, এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার পূর্বে আমি জেঃ

কাওয়াবাতাকে এ বিষয়ে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে বলি। এই বাড়তি ট্যাক্সের বিষয়ে আপনি কি বলেন ?

জেনারেল কাওয়াবাতা বললেন, আমি আর নতুন করে কি বলব ? প্রায় তিনশ বছর আগেই আমার জবাবটা দিয়ে রেখেছেন আমেরিকার আইন বিশারদ স্যামুয়েল এ্যাডামস্। যতদূর মনে পড়ে ১৭৬৪ সালে, যখন ঔপনিবেশিক সরকারের কথায় কর্ণপাত না করে ইংলণ্ডের পার্লামেণ্ট আমেরিকার উপর জোর করে রপ্তানী কর বসাতে চায়। আশা করি মাননীয় সদস্য পল মিকেলোভিচ্ আমাদের বোস্টন-টি-পার্টিতে আমন্ত্রণ করছেন না।

তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ান পল মিকেলোভিচ্ : আপনি কি পৃথিবীকে হুম্‌কি দেখাচ্ছেন ?

: আজ্ঞে না। আমি টী-পার্টিতে নিমন্ত্রণের কথা বলছিলাম।

সভাপতি জোরে জোরে তার হাতুড়িটা ঠোকেন : অর্ডার! অর্ডার! মাননীয় সদস্যেরা এভাবে পরস্পরকে সম্ভাষণ করেন এটা সভা পছন্দ করে না। তাঁদের যা বক্তব্য তা শুধু আমাকেই জানাবেন। সে যাই হোক, এবার আমি আমার রুলিং দিচ্ছি :

দেখা গেল, রুলিং-এর বিষয়ে কারও বিশেষ কোন কৌতূহল নেই। এ জাতীয় আন্তর্গ্রাহিক সমস্যা, যাতে শক্তিশালী গ্রহ দুটির স্বার্থ জড়িত, তাতে কী-জাতীয় সমাধান হয়ে থাকে তা সকলেরই জানা। এবারও তাই হল। সেক্রেটারী-জেনারেল একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করে দিলেন। তারা এ নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে পরবর্তী মিটিং-এ রিপোর্ট দাখিল করবেন। 'এনকোয়ারি কমিশন' বসায় আপাততঃ সমস্যাটাকে ধামা চাপা দেওয়া গেল। ব্যাপারটা সাব জুডিস রইল, অর্থাৎ যথাপূর্বম 'লুনার এক্সপোর্ট কর্পোরেশন' তার ব্যবসা করে যেতে পারবে। যেন কত বড় বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন, নিদাগ হ্যামারস্টোন একগাল হেসে বললেন, আশা করি আমার এই সমাধান সকলে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছেন ?

সকলেই স্মিত সম্মতি জানালেন। শুধুমাত্র মঙ্গলের প্রতিনিধি হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বললেন, আমি সমর্থন করি না!

চমকে ওঠেন নিদাগ! বলেন, কেন? কেন সমর্থন করেন না? এনকোয়ারি কমিশন...

কাওয়াবাতা একটু ঝুঁকে পড়ে বললেন, এক্সকিউজ মি স্যার! আপনি একটু ভুল বুঝেছেন। উনি আপনার প্রস্তাবের বিরোধিতো করেন নি!

—করেন নি মানে! স্পষ্ট বললেন, আমি সমর্থন করি না!

—তা বলেছেন, কিন্তু সেটা মাননীয় সদস্য পল মিকেলোভিচের প্রশ্নের জবাবে। প্রসিডিংস্-এ দেখুন উনি ঠিক দশমিনিট বত্রিশ সেকেণ্ড আগে বলেছেন, 'আশা করি বুধ ও মঙ্গল আমাকে সমর্থন করবে!'

সেক্রেটারী জেনারেল এতক্ষণে হালে পানি পান। একটা চাপা ধমকে থামিয়ে দেন কাওয়াবাতাকে : আই নো! এমন সহজ কথাটা আমি খেয়াল করিনি ভাবছেন?

সে রাত্রে বিশ্ব প্রধানের প্রাসাদে নৈশভোজের আমন্ত্রণ ছিল জেনারেল কাওয়াবাতার। সরকারি অনুষ্ঠান নয়, নিতান্ত ঘরোয়া আয়োজন। সরকারিভাবে সব কয়টি সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তার পরের রাত্রের সায়মাশে।

পানভোজনান্তে মাদাস জ্যাকেলিন বিশিষ্ট অতিথিকে নিয়ে বসেনও একটি অতি সঙ্গোপন কক্ষে। মাত্র ওঁরা দুজন। কারও সেক্রেটারী উপস্থিত নেই। দোভাষীরও প্রয়োজন নেই। কাওয়াবাতা চোস্ত ইংরাজি বলতে পারেন।

সরাসরি কাজের কথায় নেমে এলেন মাদাম, জেনারেল, আপনি নিশ্চয় অনুমান করেছেন—কয়েকটি গোপন ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার উদ্দেশ্যেই আপনাকে এভাবে একক নিয়ন্ত্রণ

করেছি। আপনি কাজের মানুষ, আসুন, আমরা সরাসরি আমাদের বক্তব্যে আসি।

জেনারেল কাওয়াবাতা চুরুটের ল্যাজ কাটতে কাটতে বলেন, আসুন।

—শুক্রবাসী হলেও আপনি মানুষ। মানবসভ্যতার খাতিরে আমরা কি একেবারে খোলাখুলি কথা বলতে পারি না?

এক গাল হাসেন কাওয়াবাতা, কেন পারব না? আমি তো আমার হৃদয় দুয়ার খুলেই রেখেছি মাদাম। বলুন কি বলবেন?

—আমাদের মূল গলদটা কোথায়? পঞ্চাশ ষাট বছর আগে জাপানের সঙ্গে রুশ-মার্কিন গোষ্ঠীর যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল এখন তো তা নেই? আমরা জাপানে বা শুক্রগ্রহে ব্যবসা করতে যাচ্ছি না, আপনারাও পৃথিবীর বাজারে নাক গলাতে চান না। তাহলে এ রেশারেশিটা কেন?

—রেশারেশি তো কিছু নেই মাদাম! আমরা ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ-পথে সূর্য-প্রদক্ষিণ করছি।

—আপনি আমার প্রশ্নটা এড়িয়ে যাচ্ছেন। তাহলে চান্দ্র কারখানায় আপনারা ও-জাতের অফার দিলেন কেন? আপনাদের জনসংখ্যা আমাদের লোকসংখ্যার একশ ভাগের মাত্র একভাগ। অথচ আপনাদের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন আমাদের প্রয়োজনকে ছাপিয়ে উঠছে কেন?

কাওয়াবাতা বলেন, মাদাম, সেটা তো এখানে বসে আপনাকে বোঝাতে পারব না?

মাদাম বিচিত্র হেসে বলেন, কিন্তু উপায় কি বলুন? এখানে বসেই তো আমাকে সব কিছু শুনতে হবে, বুঝে নিতে হবে। আপনারা তো আর আমাকে শুক্রগ্রহে নিমন্ত্রণ করবেন না। এমন কি পাছে আমাকে সৌজন্য-সাক্ষাতে প্রতি-নিমন্ত্রণ করতে হয়, তাই আপনাদের বড়কর্তা আমার নিমন্ত্রণ রাখতেও আসছেন না।

জেনারেল কাওয়াবাতা সক্ষেদে মাথা নেড়ে বলেন, না মাদাম। আপনি আমাদের ভুল বুঝছেন। আমার একটা কথা অন্তত বিশ্বাস করুন—এ জনান্তিক বক্তব্যের কোন রাজনৈতিক মূল্য নেই, এ শুধু আপনাকে আমি ব্যক্তিগতভাবে জানাচ্ছি: পৃথিবী এবং শুক্রের জীবনযাত্রায়, জীবন দর্শনে এখন একটা মৌল পার্থক্য হয়ে গেছে যে, কোন পক্ষেরই আর সৌজন্য-সাক্ষাত সম্ভবপর নয়। মাপ করবেন, এর বেশি আমি বলতে পারছি না।

—বেশ, তাহলে অন্য প্রসঙ্গই তুলি। আপনি আজ আপনার বক্তৃতায় বলেছেন—'শুক্র একটা নূতন দিগন্তের সন্ধান পেয়েছে।' সেটা কী? নাকি সে বিষয়েও আলোচনা করার অধিকার আপনার নেই?

চুরুটের ছাইটা ঝেড়ে সোজা হয়ে বসেন শুক্রমন্ত্রী। বলেন, আজ্ঞে না, এ বিষয়ে শুধু অনুমতি নয়, নির্দেশ আছে আমার উপর। বিষয়টা অত্যন্ত গোপান, তবু আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান বলেছেন—এ সংবাদটা আপনাকে জনান্তিকে জানাতে। এবং এ বিষয়ে আমরা আপনার সাহায্যপ্রার্থীও বটে।

এবার সোজা হয়ে বসার পালা মাদাম জ্যাকেলিন-এর।

জেনারেল কাওয়াবাতা বললেন, ইউ. পি. ও-র অধিবেশনেই আমি বলেছি—চাঁদ, মঙ্গল কিম্বা বুধে মানুষ আছে বটে, তবে কৃত্রিমভাবে আছে। তাতে বিজ্ঞানের প্রভূত সুবিধা হচ্ছে বটে, কিন্তু অমন বদ্ধ খাঁচায় মনুষ্যত্বের বিকাশ হতে পারে না। আপনারা গোপন রাখবার চেষ্টা করলেও আমরা জানি যে, আপনারা অতঃপর টাইটান, গ্যানিমিড, ইউরোপাতে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টা করছেন। করুন। আমাদের আপত্তিও নেই উৎসাহও নেই। কারণ আমরা মনে করি, ঐসব উপগ্রহে মানুষ শুধু কৃত্রিম পরি-মণ্ডলেই বাস করতে পারবে। যতদিন না ঐসব উপগ্রহকে তাদের

গ্রহের বুক থেকে ছিনিয়ে এনে এই ইকোস্‌ফিয়ারে* গ্রহরূপে সূর্য-প্রদক্ষিণ করানো যায়, ততদিন সেখানে মুক্ত আকাশের নিচে মানুষ বাস করতে পারবে না। সে ক্ষমতা আপনাদেরও নেই। তাই আমরা সৌর মণ্ডলের বাইরে যেতে চাই। আমরা খুঁজছি এমন বিশ্ব যেখানে মুক্ত নীলাকাশের নিচে মানুষ অকৃত্রিম জীবন যাপন করতে পারবে—গাছ, নদী, সমুদ্র, বৃষ্টি যেখানে স্বাভাবিক প্রাকৃতিক ঘটনা।

মাদাম মৃদু হেসে বললেন, শুনতে বেশ লাগছিল। থামলেন কেন? কিন্তু তেমন বিশ্ব খুঁজে বার করার ক্ষমতা তো আপনাদেরও নেই, আমাদেরও নেই। বাজারে গুজব, আপনাদের চন্দ্রলোকের মানমন্দিরে নাকি অমন নক্ষত্র খোঁজার পালা শুরু হয়েছে গত দশক থেকে। কিন্তু একটা কথা বুঝিয়ে বলতে পারেন জেনারেল? তেমন কোন নক্ষত্র যদি খুঁজে পানও সেখানে যাবেন কেমন করে? আপনাদের আকাশযান সেখানে পৌঁছাতে যে হাজার বছর পার হয়ে যাবে! অতদিন আপনারা আপনাদের নভোচারীকে হাইবারনেশনে† ঘুমন্ত অবস্থায় রাখতে পারবেন? পারলেও আপনারা সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করবেন কেমন করে? নাকি এ আপনাদের সহস্রাব্দীর পরিকল্পনা?

জেনারেল জবাব দিলেন না। জ্বলন্ত চুরুটের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

* ইকোস্‌ফিয়ার—সূর্য থেকে পৃথিবীর যে দূরত্ব তার কিছু-কম ও কিছু-বেশী দূরত্ব নিয়ে একটা কাল্পনিক অংশ, যেখানে উত্তাপ জীব-বিকাশের উপযুক্ত।

† হাইবারনেশন—বহু পার্থিব জীব সারা শীতকাল অর্ধমৃত অবস্থায় ঘুমায়। আহার করে না, মলমূত্রাদি ত্যাগ করে না, তবু বেঁচে থাকে গর্তের ভিতর। বিজ্ঞান চেষ্টা করে দেখছে মানুষকে কৃত্রিম উপায়ে ঐ ভাবে ঘুমন্ত রাখা যায় কি না। আর্থার ক্লার্ক কল্পনা করেছেন (১০) আগামী শতাব্দীতে ঐ ভাবে দুই একবছর পর্যন্ত মানুষকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যাবে।

—তাছাড়া আরও একটা কথা। শুক্রগ্রহ তো প্রায় পৃথিবীর মতই বড়। পৃথিবীর ক্ষেত্রফল বিশ কোটি বর্গমাইল, শুক্রের আঠার কোটি —প্রায় সমান সমান। অথচ আপনাদের লোকসংখ্যা মাত্র সাত কোটি। পৃথিবীর তুলনায় গড় বসতির ঘনত্ব প্রায় শতভাগ কম। তাই নয়? এক্ষেত্রে নূতন বিশ্ব খোঁজার জন্য আপনাদের এখনই এত ব্যগ্রতা কেন?

—সবই মানছি মাদাম। তবু এ-কথা তো সত্য যে, পঞ্চাশ বছরে মাত্র একশ বাইশ জন দিয়ে শুরু করে আমরা সাত কোটিতে পৌঁচেছি। আপনারা পৃথিবীতে জনসংখ্যাকে সাতশ কোটিতে আটকে রেখেছেন। জন্ম ও মৃত্যু হার সমান সমান রেখেছেন। আমাদের জনসংখ্যার বৃদ্ধি-হারটা একবার দেখুন।

এবার মাদাম প্রশ্ন করেন না—'কেন, জেনারেল?' কারণ জবাবটা তাঁর জানা, এবং প্রসঙ্গটা অপ্রীতিকর। শুক্রগ্রহ-বাসীরা জনসংখ্যার স্বল্পতার জন্যই আজও পৃথিবীকে সমীহ করে চলে; যদিও প্রযুক্তি-বিদ্যায় তারা অনেক—অনেকটা এগিয়ে গেছে। তিনি অনুমান করেন, শুক্রের বিজ্ঞানীরা ওখানে বসেই পৃথিবীকে ধ্বংস করে দিতে সক্ষম। পৃথিবী বোধকরি আজও তা পেরে উঠবে না, ওদের প্রতিরোধ উপেক্ষা করে। কিন্তু কথাপ্রসঙ্গে জেনারেল কাওয়াবাতা একটি গোপন তথ্য ফাঁস করে বসে আছেন। সঠিক সংখ্যাটা জানা ছিল না মাদামের—ঐ একশ বাইশজন আদিম অভিযাত্রীর কথাটা। সে সব প্রসঙ্গ এড়িয়ে শুধু বললেন, বেশ এখন বলুন, আমার কাছে কী-জাতীয় সাহায্য চান? এবং কী প্রতিদান দিতে ইচ্ছুক?

—প্রতিদানের কথাটাই আগে বলি। আমার প্রস্তাব—ঐ যে রপ্তানী-কর বসানোর প্রস্তাবটায় আমরা আপত্তি করেছি, ওটাতে আপনারা কর্ণপাত করবেন না; চন্দ্রলোকের যাবতীয় যন্ত্রপাতি আমাদের কিনতে দিন, বর্ধিত হারেই। আমরা না হয় লুনার

এক্সপোর্ট কর্পোরেশনের মাধ্যমেই সব কিছু কিনব। ওদের না হয় কিছু বাড়তি হারে দালালীও দেব। আমাদের পরিকল্পনাটা এই রকম—আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মত আমরা দাবী করব—বিনা প্রতিনিধিত্বে কর বসানো বে-আইনি। আপনি প্রথমটায় প্রবল আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত আমাদের দাবী মেনে নেবেন।

—তাতে পৃথিবীর লাভ ?

—পৃথিবীর নয়, আপনার লাভ। প্রথমতঃ 'লুনার এক্সপোর্ট কর্পোরেশন'-এর অধিকার অক্ষুন্ন থাকছে। আপনার কনিষ্ঠ পুত্রটির কিঞ্চিৎ লাভ হবে। তার চেয়েও বড় কথা—আমরা জানি, আপনি তৃতীয়বার বিশ্ব-প্রধানের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বয়ং দাঁড়াতে চান না, পল মিকেলোভিচ্‌কে আপনার গদিতে বসাতে চান। এভাবে আপনারা সাতকোটি ভোট রোজগার করবেন। শুক্রগ্রহ 'এন-ব্লক' আপনাকে সাপোর্ট করবে!

মাদাম জ্যাকেলিনের মুখের একটি মাংশপেশীও বিচলিত হল না। নৈর্ব্যক্তিক উদাসীনতায় বললেন, প্রতিদানে আপনারা কী চান ?

—প্রতিদানে চাই অতি সামান্য উপহার। কিছু গিনিপিগ।

—গিনিপিগ ?

—আজ্ঞে হাঁ। আমাদের বৈজ্ঞানিকেরা বলছেন—কয়েকটি মর্মান্তিক পরীক্ষার জন্য কিছু গিনিপিগের দরকার হয়ে পড়েছে তাঁদের ল্যাবরেটারিতে। শুক্রেও গিনিপিগ আছে—সাত কোটি ; কিন্তু ওখানে ব্যক্তি স্বাধীনতায় হাত দেওয়া চলবে না। আমরা গিনিপিগ জোগাড় করতে পারছি না।

মাদাম আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। তাঁর দু-চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। দৃঢ় স্বরে বলেন, কী বলছেন আপ্‌নি জেনারেল! পৃথিবীতে ব্যক্তি স্বাধীনতা নেই ? তারা মানুষ না ? আমার সন্তান নয় ?

কাওয়াবাতাও উঠে দাঁড়ান। সবিনয়ে নিবেদন করেন, মাদাম, আপনি অহেতুক উত্তেজিত হচ্ছেন। আমি মানুষ চাইনি, চেয়েছি

গিনিপিগ। যে অরণ্য থেকে গিনিপিগ সংগ্রহ করব সে অরণ্যের সন্ধান পৃথিবী জানে না।

ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হয় মাদামের : কোন অরণ্য ?

কাওয়াবাতা তাঁর ডায়েরি দেখে বলেন, দ্রাঘিমাংশ ৯২°৩০´ পূর্ব, অক্ষাংশ ১০°৩০´ উত্তর। আমাদের 'ভেনাসোগ্রাফার' পৃথিবীর ভূগোল সম্বন্ধেও ওয়াকিবহাল ; তিনি বলছেন—ঐ অরণ্যে এখনও চারশ বত্রিশটি গিনিপিগ টিকে আছ। তা থেকে কিছু খোয়া গেলে কাকপক্ষীও টের পাবে না।

মাদাম বললেন, জায়গাটা কোথায় ? ম্যাপ না দেখে—

—ভারত মহাসাগরের একটা নগণ্য দ্বীপ, মাদাম। নাম লিট্‌ল্ আন্দামান।

মাদাম শ্রাগ করে বললেন, উঃ! এত খোঁজও রাখেন আপনারা! নিন, আর একটা ড্রাই মার্টিনী নিন্!

—থ্যাঙ্কু!—কাওয়াবাতা আবার একটি পান পাত্র তুলে নিলেন।

সময়ের মাপ হারিয়ে গেছে ডক্টর পার্থিব রায়ের। সে কতদিন হল আটক আছে এই অন্ধ কারাগৃহে ? ঠিক অন্দাজ করতে পারে না। পারবে কেমন করে ? তার না আছে হাতঘড়ি, না ক্যালেণ্ডার। এখনও সে নেংটি-সার! কারা কক্ষের এক ছিদ্র পথে সূর্যের এক গোলাকৃতি কৌতূহল এসে লুটিয়ে পড়েছে ওর কারাগারের পাথর-বাঁধানো চত্বরে। আশ্চর্য! সেটা নড়তেই চায় না! ঘড়ি না থাকুক, নাড়ির স্পন্দন আছে। সময়ের একটা বোধও আছে। চিড়িয়াখানার বাঘকে যেমন খাঁচার উপর থেকে মাংস ছু ড়ে খেতে দেওয়া হয়, এই নেংটি-সার উলঙ্গ জন্তুটাকে ওরা সেভাবেই খেতে দেয়। খাদ্যটার জাত নির্ণয় করতে পারেনি, তবে খেয়ে দেখেছে—হজম হয়। সেই খাবার দেবার সময়ের ব্যবধানটা যদি চব্বিশ ঘণ্টা হয়, তাহলে বলতে হবে পুরো চব্বিশঘণ্টায় সূর্যের ঐ কৌতুহলটা—ঐ গোলাকৃতি রৌদ্রের

টুকরোটা মাত্র দু-চার ইঞ্চি সরে। ডক্টর পার্থিব রায় জানে. তার হেতুটা। সে পৃথিবীতে নেই। আকাশযানে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে সে এসেছে শুক্রগ্রহে। এখানে সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়ের মধ্যে সময়ের ব্যাপ্তি প্রায় চারমাস।

কিন্তু কেন ওকে শুক্রবাসীরা এভাবে অপহরণ করে আনল? যারা ওর সঙ্গীসাথী ছিল, সেই আঙ্গে আদিবাসীরা, তাদের একে একে ওরা কোথায় যেন নিয়ে গেছে। কিছুদিন আগে কারাগৃহের প্রহরী আর একজন মানুষকে অজ্ঞান অবস্থায় ঠেলে ফেলে দিয়েছিল ওরই কারাকক্ষে। পরে লোকটার জ্ঞান হয়েছিল। সে মানুষ—পৃথিবীর মানুষ। ইংরাজী জানে না। হল্যাণ্ডের লোক। পার্থিব আবার ডাচ্-ভাষা জানে না। তা হোক, তবু মর্মান্তিক প্রয়োজনে দুটি মৃত্যু-পথযাত্রী হাত-পা নেড়ে অনেক কথা বলেছিল। পার্থিব বুঝতে পেরেছিল—ডাচ-ছোকরা একজন নভোচারী। মহাকাশ থেকে তাকে ওরা অতর্কিতে অপহরণ করে এনেছে। কেন, তা ওরা বুঝতে পারেনি। পাঁচ দিন—অর্থাৎ পাঁচটি খাবার দেওয়ার সময়ের ব্যবধানে সেই ছেলেটিকে ওরা আবার ধরে নিয়ে গেল। পার্থিব তার অজ্ঞাত বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে প্রহৃত হয়েছিল। ওর খাঁচা থেকে তাকে টানতে টানতে সেই যে নিয়ে গেল, আর সে ফিরে আসেনি।

স্পষ্ট না বুঝলেও আন্দাজ করতে পারে। কয়েক শতাব্দী আগে সভ্য মানুষ আফ্রিকায় গিয়ে নগ্নকায় নিগ্রোদের হাজারে হাজারে ধরে নিয়ে আসত। ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে আঙ্কল টম্‌স্ কেবিনের সেই বাসিন্দাদের দাস রূপে বিক্রয় করত। শুক্রবাসীরা নিশ্চয় তা করছে না। একবিংশ শতাব্দীর অতি-উন্নত সমাজে দাস-ব্যবসা ও-ভাবে চলতে পারে না। ও-ভাবে পৃথিবী থেকে মানুষ আমদানি করার খরচই পোষাবে না। তাছাড়া একটি মাত্র চুরি ধরা পড়ে গেলেই সারা সৌরমণ্ডলে সাড়া পড়ে যাবে। আন্তর্গ্রাহিক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে শুক্র। সুতরাং সে জন্য নয়। দ্বিতীয় সম্ভাবনা—

যে-কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নাৎসী বৈজ্ঞানিকেরা কন্‌সেণ্ট্রেশন ক্যাম্প থেকে ইহুদি সংগ্রহ করত। বিভিন্ন ঔষধ বা বিশেষ বিষের প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করতে নাৎসী বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন হত জ্যান্ত মানুষের। হয়তো এরাও এখন তাই চায়। জীবজন্তু নিয়ে পরীক্ষা বোধকরি শেষ হয়েছে; এখন দেখতে চায় বিভিন্ন উত্তাপে, চাপে, ঘুর্ণনছন্দে, বিষাক্ত গ্যাসে মানুষের দেহ-মনে কী-জাতের প্রতিক্রিয়া হয়। সহযাত্রী আঙ্গে বন্ধুরা হয়তো সেই পরীক্ষার কাঁচামাল হিসাবে অসীম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করেছে। একই ভাবে বীভৎস মৃত্যু বরণ করেছে সেই ডাচ্-ছোকরা। পার্থিবেরও একই পরিণাম। কবে ওর ডাক আসবে, কী-ভাবে মরতে হবে তা আন্দাজ করতে পারে না।

সেদিনও নির্জন কারাকক্ষে বসে এই সব কথাই ভাবছিল, হঠাৎ একটা তীব্র আলো এসে পড়ল উপর থেকে। ওর দৃষ্টিপথের বাইরে বোধ হয় জেল-ফটকটা খোলা হল। নেপথ্যে কয়েকটি ভারী বুটের শব্দ। কারা যেন শুক্রগর্ভের নিচের ঐ কারাগারে আসছে। পার্থিব উঠে দাঁড়ায়। এতদিনে তাহলে প্রতীক্ষার অবসান হল।

নেপথ্যে আবার শিকল ঝঞ্চনা। জনা-তিনেক লোক এগিয়ে আসছে। সশস্ত্র পুরুষটি ওর পরিচিত—এই কারাগৃহের প্রহরী, যে তাকে খাঁচার উপর থেকে খাবার ছুঁড়ে দেয়, মাঝে মাঝে হোস-পাইপের জলে স্নান করায় খাঁচার বাইরে দাঁড়িয়ে। এতক্ষণে আলোয় ওর চোখ সহে এসেছে, লক্ষ্য করে দেখল—বাকি দুজনের একজন পুরুষ, দ্বিতীয় জন মহিলা। দুজনেই মঙ্গোলিয়ান, জাপানী।

মেয়েটিই কথা বলল প্রথমে। পরিষ্কার ইংরাজীতে: গুডমর্নিং ডক্টর রায়, ইনি মেজর নোনোগাকি, প্রিজন ক্যাম্পের কমাণ্ডার। আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

পার্থিব রীতিমত অবাক হয়ে গেছে। একে মহিলা, তায়

ইংরাজি ভাষা, সর্বোপরি তার কৌলিক উপাধী ও স্বোপার্জিত ডিগ্রি! নজর করে দেখল, মেজর নোনোগাকি ওঁকে মাজা ভেঙে 'আরিগাতো' (জাপানী কায়দায় নমস্কার) জানাচ্ছেন। তিনি উনস্বর এবং বিসর্গের বাহুল্যসমেত কিছু বললেন তাঁর মাতৃ-ভাষায়। দোভাষী মেয়েটি অনুবাদ করে শোনালো, মেজর নোনোগাকি বলছেন, 'আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, আপনার মত একজন স্বনামধন্য পণ্ডিত ব্যক্তিকে বদমায়েশ বেটারা ভুল করে ধরে এনে এভাবে ফেলে রেখেছে!'

অনুবাদ শেষ হতেই মেজর প্রহরীটিকে কষে একটি থাপ্পড় মারলেন। লোকটা বেমালুম চড়টা হজম করল। মেজর দোভাষীর মাধ্যমে আরও বললেন, খবর পেয়েই আমরা ছুটে এসেছি আপনাকে উদ্ধার করতে।

বিস্ময়ের ঘোর অনেকটা কেটে গেছে। পার্থিব মেয়েটিকে প্রশ্ন করে, বদমায়েশ ব্যাটারাই বা কে, এবং আমার পরিচয়ই বা আপনারা পেলেন কেমন করে?

দোভাষী মেয়েটি জবাবটা জেনে নিয়ে বললে, সেসব আলোচনার পক্ষে এই অন্ধকূপ প্রশস্ত স্থান নয়। মেজর বলছেন, আপনি আমাদের সঙ্গে আসুন—ওঁর অফিস ঘরে।

পার্থিব বললে, অনুবাদ করে ওঁকে শোনানোর দরকার নেই, আপনাকেই প্রশ্ন করছি—ওঁর পরিচয় পেলাম, জাঁদরেল প্রিজন-ক্যাম্প কমাণ্ডর, এ বেচারির পরিচয়ও পেলাম—ওঁরই অধীনস্থ কর্মচারী অথচ বদমায়েস ব্যাটাদেরও প্রহরী; কিন্তু আপনার পরিচয়টা কি?

মেয়েটি খিলখিলিয়ে হেসে ওঠে। বলে, দোভাষীর পরিচয় থাকে না। আমি ক্যাটালিটিক্-এজেন্ট মাত্র।

: পজেটিভ ক্যাটালিস্ট?

মেয়েটি জবাব দেবার সুযোগ পায় না। মেজর এ-জাতীয়

জনান্তিক আলাপচারী বরদাস্ত করলেন না। অগত্যা তিনজনকে আসতে হল ওঁর অফিস ঘরে।

সেখানে এসে মেজর নোনোগাকি যে আষাঢ়ে গল্পটা শোনালেন সেটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। পার্থিব কিন্তু সে কথা বলল না আদৌ। যারা ওকে পৃথিবী থেকে ধরে এনেছে তারা নাকি 'আকাশদস্যু'। জলদস্যু হার্মাদেরা এককালে যেমন পৃথিবীর সমুদ্র তোলপাড় করত, এরা বর্তমানে মহাকাশে তাই করছে! তবে মেজর সাহেবের বক্তব্যের শেষাংশটা বিশ্বাসযোগ্য। ওদের অপহরণের ব্যাপারটা কি করে জানি পৃথিবীতে জানাজানি হয়ে গেছে। যে-হেতু ডক্টর পার্থিব রায় একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি—ভারত সরকারের তরফে আন্দামানে গবেষণা করছিলেন, তাই অতি উচ্চপর্যায়ে শুক্রের কৈফিয়ৎ তলপ করা হয়েছে। এই সামান্য বিষয় থেকে আন্তগ্র্রাহিক পরিস্থিতিই নাকি আজ জটিল!

মেয়েটি বললে, একটা কথা। দোষ শুধু বোম্বেটেদেরই নয়, দোষ আপনারও। অমন রঙচঙ মেখে সঙ হয়ে বসেছিলেন কেন ওদের মধ্যে? গিনিপিগ সেজে?

পার্থিব বলে, এ অভিমতটা কি মেজরের, না তাঁর ক্যাটালিটিক্ এজেন্টের?

—এজেন্টের!

—তাহলে বলব, তিনি নেগেটিভ ক্যাটালিস্ট!

মেয়েটি হেসে ওঠে। বলে, কেন আপনাকে সঙ বললাম বলে? না গিনিপিগ?

মেজর নোনোগাকি বুদ্ধিমান। ইতিমধ্যে তিনি বুঝে নিয়েছেন —বন্দীকে বাগে আনতে হলে ওদের দুজনকে একটু নিরিবিলি হতে দিতে হবে। ত্রিশ বছরের উঠ্তি জোয়ান ছোকরা, জেলে আটকে ছিল এতদিন। নিক, একটু ঠাণ্ডা হয়ে নিক। উঠে দাঁড়ান তিনি। বলেন, আমার একটা জরুরি কাজ আছে। একটু ঘুরে আসছি।

সাকুরা-কো, তুমি ততক্ষণ আমার বিশিষ্ট অতিথিটিকে সৎকার কর।

নোনোগাকি মাজা ভেঙে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

—কফি খাবেন, না ড্রিংক্‌স্‌?

পার্থিব ঘুরে বসে। মেয়েটির মুখোমুখি। ও হাসছে। ওর সাজ পোষাক পুরুষালী। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, অঙ্গে কোন আভরণ নেই। সার্ট-সর্টস্‌। শুধুমাত্র কণ্ঠস্বর, মসৃণ গণ্ডদ্বয় এবং সার্টের বুক পকেটের উচ্ছ্বাস প্রমাণ দেয় ও কিশোর নয়, যুবতী। পার্থিব বললে, বরং কিছু খাবার পেলে খেতাম!

: আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমার আগেই খেয়াল হওয়া উচিত ছিল।

মেয়েটি একটি ইণ্টারকমে দুর্বোধ্য ভাষায় কিছু বললে। পরমুহূর্তেই ঘরের দেওয়ালের একটি চতুষ্কোণ অংশ খুলে গেল। জানলার পাল্লার মত। না, পাশাপাশি নয়, উপর থেকে নিচে। জমির সামন্তরাল হয়ে দেওয়ালের চতুষ্কোণ অংশটা একটা টেবিলে রূপান্তরিত হল। ঐ ফোকর দিয়েই একটা যান্ত্রিক-হাত রেখে গেল দু' প্লেট খাবার এবং দু-বোতল বিয়ার। একটি প্লেটে কাঁটা-ছুরি, দ্বিতীয়টিতে এক জোড়া চপস্টিপ। খাদ্যটা কী, ঠিক বোঝা গেল না, অনেকটা স্প্যাগেটির স্বাদ। দুজনে আহারে নিবিষ্ট হয়।

মেয়েটি বললে, তোমার প্যাণ্টটা ঝুলে ছোট হয়েছে। দর্জিকে খবর পাঠাব। একটু পরেই তোমার প্যাণ্টের মাপ নিয়ে যাবে।

পার্থিব নিজের পোষাকের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। ইতিমধ্যে মেজর নোনোগাকি নিজের একটি প্যাণ্ট ওকে পরতে দিয়েছেন। খর্বকায় নোনোগাকির ফুলপ্যাণ্ট ওর হাঁটু ছাড়িয়ে বেশিদূর যেতে পারেনি। পার্থিব বললে, প্যাণ্টটা ছোট হলেও তোমার প্যাণ্টের মত ছোট নয়।

মেয়েটিও নিজের পোষাকের দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বললে, আমার প্যাণ্টের ঝুল তোমার প্রাক্তন প্যাণ্টের ঝুলের চেয়ে বেশি।

পার্থিব প্রসঙ্গটা বদলে বললে, তোমার নাম তো শুনলাম সাকুরা-কো। পেশা তো শুনলাম দোভাষী ; কিন্তু থাকো কোথায় ? বাড়িতে কে কে আছে ?

সাকুরা-কো বললে, পেশায় আমি দোভাষী নই ; আমি এ্যাস্ট্রনট, নভোচারী। ইংরাজি ভাষাটা সখ করে শিখেছি।

পার্থিব বলে, আমার প্রশ্ন দুটি তুমি এড়িয়ে গেলে। কোথায় থাক এবং বাড়িতে কে কে আছে।

মেয়েটি হাস্য গোপন করে বললে, এত স্বল্প আলাপেই তুমি আমার টেলিফোন নাম্বার চাইবে, তা আন্দাজ করতে পারিনি।

—টেলিফোন নাম্বার আমি চাইনি। এমনি আলাপ করতে জানতে চাইছি তোমার বাড়িতে কে কে আছেন। বাবা, মা, ভাই, বোন— ?

—এবং স্বামী ?

পার্থিব এবার প্রগলভ মেয়েটির প্রতিপ্রশ্নের জবাব দিল না।

সাকুরা-কো খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে। বলে, কী বলব ? এক কথায় ওর জবাব হয় না। বরং বল, তোমার বাড়িতে কে কে আছে।

পার্থিব একটু আহতকণ্ঠে বললে, নিজের সম্বন্ধে জানাতে না চাও তো জানিও না। বাজে কথা বলছ কেন ? এক কথায় যদি জবাব না হয় তবে ঐ একই প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন ?

মেয়েটি জবাব দিল না। বিয়ারের বোতল খুলে সাবধানে ফেনাসমেত কাচের পাত্রে পানীয় ঢালতে থাকে। পার্থিব নিজে থেকেই যোগ করে, আমার বাবা-মা দুজনেই আছেন। ভাই নেই, একটি ছোট বোন আছে, বুড়ি। আর তার একটা ফুটফুটে বাচ্চা আছে।

—বউ ?

—আমি বিবাহ করিনি। তুমি ?

সাকুরা-কো সাকীর ভূমিকায় পান পাত্রটা বাড়িয়ে ধরে।

পুনরুক্তি করে, এক কথায় এ-প্রশ্নের জবাব হয় না।

পার্থিব এবার অন্যদিক থেকে আক্রমণ করে। বলে, তুমি বোধহয় নিজেকে খুব সুন্দরী ভাব, তাই নয় ?

—একথা কেন মনে হল ?—ভ্রূভঙ্গি করে সাকুরা জানতে চায়।

—তোমার ধারণা, কোন অপরিচিত যুবক প্রথম আলাপেই তোমার টেলিফোন নাম্বার জানতে চায়, তুমি বিবাহিত কিনা খোঁজ নিতে চায়…

মেয়েটি ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললে, তুমি আদ্যোপান্ত আমাকে ভুল বুঝছ। বেশ, আমি বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করছি। দেখ, বুঝতে পার কি না। না—আমার বাবা, মা, ভাই, বোন, পুত্র কন্যা, স্বামী ইত্যাদি কেউ নেই ; কস্মিনকালেও ছিল না, থাকবে না। বুঝলে ?

নৃতত্ত্ববিদ ডক্টর রায় বিষম খেল। সামলে নিয়ে বললে, 'নেই' বুঝি, 'থাকবে না' বুঝি, কিন্তু 'ছিল না' মানে ? আর কেউ না থাক বাবা মা নিশ্চয় ছিলেন ?

—না, ছিল না ! শুধু আমার একার নয়—শুক্রবাসী সাতকোটি নরনারীর বাবা-মা নেই, কস্মিনকালে ছিল না।

ডক্টর রায় ঐ কিশোরপ্রতিম মেয়েটিকে একবার আপাদমস্তক দেখে নিল। না, ও বদ্ধ উন্মাদ বলে তো মনে হচ্ছে না। কত বয়স হবে মেয়েটার ? পঁচিশ-ছাব্বিশ ? মুখে বললে, বাপ কে তা মানুষে নাও জানতে পারে, সে যদি বেজন্মা হয় ; কিন্তু 'মা' ? গর্ভধারিণী মাকে না চেনার কী আছে ? যদি না ঘটনাচক্রে শৈশবে জননী ও সন্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ?

সাকুরা-কো একটা সিগারেট ধরালো। পার্থিবকেও অফার করল। সে নিল না। বললে, খায়না। মেয়েটি এক ঢোক ধোঁয়া গিলে বললে, ও-সব আইন পৃথিবীতে প্রযোজ্য। এখানে মানুষ মাতৃগর্ভে জন্মায় না—তা গর্ভধারিণী মা কোথায় পাব ?

সোজা হয়ে বসে জীববিজ্ঞানী ডক্টর রায়—তার মানে! মায়ের পেট ছাড়া মানুষ আবার কোথায় জন্মায়? মানুষ হয় কোথায়?

—জন্মায় হোমোস্যাপিয়ান্স ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাক্টরিতে। মানুষ হয়—'রিয়ারিং ফার্মে'!

চোয়ালের নিম্নাংশ ঝুলে পড়ে ডক্টর রায়ের। মেয়েটি খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে আবার। বলে, আশ্চর্য! এমন সোজা কথাটা তোমরা, পৃথিবীর লোকেরা বুঝতে পার না?

—সোজা কথা?

—নয়? মাতৃগর্ভে জন্ম নিলে এক-একটা বাচ্চা পয়দা করতে আট-দশ মাস 'প্রসেসিং টাইম' লাগবে না? তাতে শওয়া শ' মানুষ থেকে পঞ্চাশ বছরে সাতকোটি 'ফিনিস্‌ড প্রডাক্ট' পয়দা হতে পারে? প্রতিটি নারী প্রতিটি মুহূর্তে গর্ভিনী হয়ে থাকলেও?

পার্থিব একটা ঢোক গিলে বলে, তুমি দেখেছ সে কারখানা?

—জন্মেছি সেখানেই। বড় হয়েও কতবার গিয়েছি। কাঁচামাল হিসাবে চাই কিছু 'ওভাম' আর 'স্পার্মাটোজুন'। বাদ বাকি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি। এক বছর বয়স থেকে সাইকোলজিকাল প্রয়োজনে কিছু নারীকর্মী কাজ করে। প্রসেসিংটা অদ্ভুত—বিশেষ যখন 'হুলারে' করে 'ফিনিস্‌ড প্রডাক্টটা' বেরিয়ে আসে। হাজারে হাজারে খোকাখুকু।

জীববিজ্ঞানের হাজার প্রশ্ন ছাপিয়ে জীববিজ্ঞানী প্রথমেই বললে, এমন একটা নারকীয় যান্ত্রিক ব্যবস্থা তোমরা মেনে নিয়েছ? প্রতিবাদ হয় না? আন্দোলন হয় না?

সাকুরা-কো হাসল। বললে, 'নারকীয়' বিশেষণটা তুমি প্রয়োগ করছ তোমার সংস্কারের বশে। এখানে জন্ম হলে, এখানকার সমাজ ব্যবস্থায় মানুষ হলে, ও কথা কোনদিন মনেই আসত না। শুধু তাও নয়। আমার মত যারা পৃথিবীর সাহিত্য পড়েছে, সমাজ-ব্যবস্থার সন্ধান রাখে তারাও সর্বান্তঃকরণে মেনে নিয়েছে—এই ব্যবস্থাই ভাল।

—অসম্ভব। তা হতেই পারে না—দৃঢ়স্বরে প্রতিবাদ করে পার্থিব।

—এখানে কিছুদিন থাক। দেখ। তারপর বরং এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে। এই জন্যেই তখন বলেছিলাম—এক কথায় তোমার প্রশ্নের জবাব হয় না।

—তুমি বলতে চাও—শুক্রগ্রহে মানুষে বিবাহ করে না? তাদের সন্তান হয় না!

—এতক্ষণে তুমি আমার কথাটা বুঝতে পেরেছ দেখছি!

—তার মানে স্ত্রী পুরুষ···মানে···

—না, তা নিশ্চয় নয়। যৌনজীবন থাকবে না কেন? তবে সামাজিক বাধা কিছু নেই—

—কুকুর-বেড়ালের মত?

সাকুরা ওর কথা কানে না নিয়ে বলে, আর তাদের সন্তান হবার আশঙ্কাও নেই!

—অর্থাৎ চূড়ান্ত ব্যভিচারের সমর্থন আছে রাষ্ট্রের এবং সমাজের?

মেয়েটি অসহিষ্ণু হয়ে বলে, কী আশ্চর্য! তুমি বুঝছ না কেন? ব্যাভিচার কাকে বল? আচার থাকলে তবেই না ব্যাভিচার? সামাজিক অনুশাসন থাকলেই না তা লঙ্ঘনের প্রশ্ন উঠ্‌বে? তুমি মানববিজ্ঞানী হয়ে এমন সোজা কথাটা বুঝছ না? পৃথিবীর ইতিহাসে তথাকথিত অসভ্য সমাজ-ব্যবস্থায় এমন নজির তুমি খুঁজে পাওনি?

ডক্টর পার্থিব রায় বললে, না, পাইনি। পৃথিবীর অনেক তথাকথিত অসভ্য-সমাজ ব্যবস্থায় পিতৃত্বের সংজ্ঞাটাকে বদলে যেতে দেখছি। ধর মেলানেশিয়ার আদিম সমাজ-ব্যবস্থা। তাদের ধারণায় পিতৃত্ব জিনিসটাই নেই—মাতৃতান্ত্রিক সমাজ। মায়ের গর্ভসঞ্চার কেমন করে হয় ওরা জানত না। বিবাহিত নারীর স্বামী দু-তিন বছর বিদেশে থেকে ফিরে এসে যখন দেখত তার স্ত্রী সন্তানের

জননী হয়েছে তখন তারা খুশি হত। সন্তানদের গ্রহণ করত। কিন্তু তবু তারা বিয়ে করত—স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কটা মানত। অনেক অসভ্য সমাজে যৌথ-বিবাহও প্রচলিত। সন্তান যেখানে বাপের নয়, গোষ্ঠীর। কিন্তু তারা কেউ মাতৃত্বকে অস্বীকার করেনি। পরিবারকে অস্বীকার করেনি। পরিবারের সংজ্ঞা হয়তো বদলেছে দেশ থেকে দেশে, যুগ থেকে যুগে। আমার মাতৃভূমিতেই কয়েক শ' বছর আগে একটি পুরুষ তিন-চারটি, কখনও কখনও দশ-বিশটি বিবাহ করত। বিভিন্ন মায়ের সন্তানেরা একটা রক্তের বন্ধন মেনে চলত —বৈমাত্রেয় ভাই-বোন। তেমনি যে সমাজে এক নারীর দুই বা তিন-চারটি স্বামী থাকবে সেখানেও তাদের সন্তানেরা বৈপিতৃয় ভাই-বোন হবে। কিন্তু তুমি যে মাতৃত্বের ধারণাটাকেই উড়িয়ে দিতে চাইছ! পরিবার বলে কিছু নেই, গোষ্ঠী বলে কিছু নেই। আমার, আমাদের বলে কিছু নেই! মা সন্তানকে স্তন্য দেয় না, বাপ ছেলের সঙ্গে খেলা করে না, স্বামী-স্ত্রী তাদের যৌথ ভালবাসাকে গড়ে তুলবার স্বপ্ন দেখে না! এ যে আমি ভাবতেই পারছি না! তোমাদের জীবন তো উষর, শুকনো, রসকর্ষহীন।

—আমরা তা মনে করি না। আমরা মনে করি পারিবারিক বন্ধনমুক্ত হয়ে আমরা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মত স্বাধীন।

—যেমন স্বাধীন কুকুর-বেড়াল, যেমন স্বাধীন একজন প্রস্টিচুট!

সাকুরা জবাব দিল না।

পার্থিব অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে বললে, সত্যি করে বল তো—জীবনটা একেবারে ফাঁকা ফাঁকা লাগে না?

—তা কেন লাগবে। কত কাজ···

—শুধু কাজ? তুমি···তুমি কখনও কাউকে ভালবাসনি?

—বেসেছি বইকি। আমার অনেক বন্ধু ও বান্ধবী আছে।

—বন্ধু আর বান্ধবী! তফাৎ নেই কোন? বান্ধবীর সঙ্গে বন্ধুর?

—তুমি জীববিজ্ঞানী। কী জবাব দেব? নিশ্চয় আছে। বান্ধবীদের সঙ্গে গল্প করি, সিনেমা দেখি কিন্তু তাদের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে যাই না। আর···

—থামো!

—থামলাম! তবে বুঝতে পারছি তুমি আমার বন্ধুদের ঈর্ষা করছ!

—কক্ষণও নয়! আমি···আমি অমন কুকুর-বেড়াল নই। আমার আত্মসম্মান বোধ আছে। আমি ইন্দ্রিয় সংযম করতে জানি।

খিল্‌খিলিয়ে আবার হেসে ওঠে সাকুরা-কো। বলে, থাক তুমি তোমার সংযম নিয়ে। আমরা জীবনকে উপভোগ করতে চাই! মানুষের জীবন অত্যন্ত স্বল্পমেয়াদী, তার প্রতিটি মুহূর্তকে আমরা আনন্দঘন করতে চাই। এটাকে যদি তুমি অন্যায় বল, আমরা নাচার।

আবার কিছুক্ষণ কী ভাবল পার্থিব। তারপর বলে, আচ্ছা সেই বন্ধুদের মধ্যে কোন একজন বিশেষকে তোমার কখনও একান্ত করে পেতে ইচ্ছে করে না—মানে সাময়িকভাবে নয়, স্থায়ী সঙ্গী হিসাবে?

—অর্থাৎ যাকে বলে—ব্যক্তিগত মালিকানা?

—না, যাকে বলে—একনিষ্ঠ প্রেম!

সাকুরা-কো বললে, রাস্তায় বেরিয়ে যদি তুমি কোন একজন শুক্রবাসীকে এ প্রশ্ন কর সে তার অর্থটাই বুঝতে পারবে না। আমি পারছি; কারণ আমি তোমাদের সাহিত্য পড়েছি—সহস্রাব্দীকাল তোমরা কী-ভাবে ভুলের মাশুল দিয়ে এসেছ তা আমার জানা। তাই বলব, অমন উদ্ভুটে মনোভাব—যৌন সম্পর্কে ব্যক্তিগত মালিকানার ইচ্ছা কোন শুক্রবাসীর অন্তরে কখন জাগেই না।

পার্থিব বললে, তাহলে বলব—তোমরা দুর্ভাগা! তোমরা কী হারিয়েছ, তা তোমরা নিজেরাই জান না।

সাকুরা-কো বললে, জানি। কারণ ঠিক ঐ কথাটাই আমরাও তোমাদের সম্বন্ধে ভাবি কিনা—তোমরা দুর্ভাগা। তোমরা কী পাওনি তা তোমরা নিজেরাই জান না!

পরদিন—সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয়ের হিসাবে নয়, সে-হিসাবে ওখানে দিনের ব্যাপ্তি চারমাস—পরদিন মানে একনিদ্রার পরে, পার্থিবকে নিয়ে আসা হল বৈগ্রাহিক মন্ত্রীর দপ্তরে। আন্তর্গ্রাহিক মন্ত্রকের প্রধান তথা ইউ. পি. এ-র শুক্রসদস্য স্বয়ং জেনারেল কওয়াবাতার মন্ত্রকে। কাওয়াবাতা ইংরাজি বলতে পারেন চমৎকার, দোভাষী নিষ্প্রয়োজন। আরিগাতো করলেন না তিনি, পার্থিবের সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, বসুন, বসুন। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত, ডক্টর রায়। আপনার দুর্ভাগ্যের জন্য। যে মহাকাশ-দস্যুদল আপনার উপর এ অত্যাচার করেছে আমরা তাদের সন্ধানে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি নিয়োগ করেছি। আশা করি ডাকাতের দল শীঘ্রই সদল-বলে ধরা পড়বে। আপনি ছাড়া আরও একটি ডাচ নভোচারীকে··· ও হো! আপনি তো তাকে চেনেন। সে যাই হোক, যে জন্য আপনাকে ডেকেছি—আপনার ব্যাপারটা নিয়ে একটা বিশ্রি আন্তর্গ্রাহিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। পৃথিবী তো বটেই, এমন কি চাঁদ, মঙ্গল, বুধ পর্যন্ত মনে করছে আমরাই আপনাকে জোর করে ধরে এনেছি, আপনার উপর নাকি অকথ্য অত্যাচার হচ্ছে। এমন কি অনেকে মনে করে, আপনাকে ইতিমধ্যে আমরা হত্যা করেছি। আপনি নিশ্চই প্রণিধান করেছেন—এটা আকাশদস্যুদের বোম্বেটেগিরি, আমাদের অমন ইচ্ছা আদৌ ছিল না, এবং নেই। আমরা স্থির করেছি, অবিলম্বে আপনাকে আমরা পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেব। কিন্তু তার পুর্বে আপনি যে জীবিত, মুক্ত অবস্থায় আছেন তার একটা অকাট্য প্রমাণ দিতে হবে। আপনাকে অনুরোধ করব একবার টি. ভি স্ক্রীনের সামনে দাঁড়িয়ে একটা বিবৃত্তি দিতে।

বস্তুত আপনি রাজী হবেন এটা ধরে নিয়ে আমরা ইতিপূর্বেই ঘোষণা করেছি যে, পৃথিবীর জি. এম. টি রাত আটটায় আপনি পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন।

ঘড়ি দেখে নিয়ে বললেন, এখনও চল্লিশ মিনিট সময় আছে। তখন পৃথিবী, চাঁদ, মঙ্গল, বুধে সবাই টি. ভি খুলে আপনার প্রতীক্ষা করবে। আজ আপনিই সৌরজগতের সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি। ও—হ্যাঁ, চাঁদের কোপারনিকাস বেস-এ আপনার বাবা ও মাকে পৃথকভাবে আমরা রেডিওগ্রাম পাঠিয়ে আপনার নিরাপত্তার কথা জানিয়েছি। তাঁরাও আপনার ভাষণ শুনবেন। এই নিন আপনার বিবৃতিটা। পড়ে দেখুন।

পার্থিব সেটা না দেখেই বললে, জেনারেল, আমি আপনার প্রস্তাবে আংশিকভাবে সম্মত। অর্থাৎ টি. ভি-তে ভাষণ দিতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু আপনারা আমাকে দিয়ে যা বলতে চান তা আমি বলব না।

—কী আশ্চর্য! ওতে আপত্তিকর কিছু আছে কিনা আগে পড়ে দেখুন।

—না! প্রশ্ন সেটা নয়। হয় আমি আপনাদের বন্দী, নয় আমি মুক্ত।

—আপনি নিশ্চয় আমাদের বন্দী নন।

—তাহলে আমার বাক-স্বাধীনতা আছে। সেক্ষেত্রে আমার পৃথিবীকে আমি নিজ ভাষাতেই সম্ভাষণ করব। আপনাদের ভাষায় নয়।

—কী বলবেন আপনি?

—মাপ করবেন, কথাটা আমি পৃথিবীকে বলতে চাই, আপনাকে নয়।

—কী আশ্চর্য! আপনি কী বলবেন না জেনে আপনাকে কেমন করে টি. ভি স্ক্রীনের সামনে যেতে দেব?

—দেবেন না। টি. ভি-তে ভাষণ দেবার জন্য আমি লালায়িত হইনি। প্রস্তাবটা আপনারই। আমি তো আগেই বলেছি—টি.ভি স্ক্রীনের বদলে আপনারা আমাকে ডেথ-চেম্বারেও নিয়ে যেতে পারেন। যত যাই হোক, আমি আপনাদের হাতে বন্দী।

—না! আপনি বন্দী নন!—প্রায় ধমকে ওঠেন কাওয়াবাতা।

—তাহলে আমার বাক-স্বাধীনতা আছে। অন্তত পৃথিবীর লজিক তাই বলে।

জেনারেল এবার মিনতির স্বরে বলেন, প্লীজ, ডক্টর রায়, আপনি বুঝতে পারছেন না কেন? আপনি কী বলতে কি বলবেন না জেনে···

—লুক হিয়ার জেনারেল! একই তর্ক চালিয়ে গেলে বাকি আটত্রিশ মিনিটও পার হয়ে যাবে। আমার মনে হয়, আপনার এখন্ আর দ্বিতীয় কোন পথ নেই। আমার প্রস্তাব, আপনি আমাকে টি. ভি-স্ক্রীনের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে দিন। যদি দেখেন, আমি আপনাদের ক্ষতিকর কিছু বলছি, তৎক্ষণাৎ ট্রান্সমিশন বন্ধ করে দিয়ে সেই বিখ্যাত সাইনবোর্ডটা ঝুলিয়ে দেবেন—'যান্ত্রিক গণ্ডগোলে প্রচার বন্ধ হওয়ায় দুঃখিত।'

জেনারেল কাওয়াবাতা একজন পরম পরাক্রান্ত রাজনীতিক। একটা ফচ্‌কে ছোঁড়ার চালে এভাবে বেকায়দা হওয়ায় তিনি বিব্রত বোধ করতে থাকেন। তিনি জানেন, সমগ্র সৌরমণ্ডল আর পঁয়ত্রিশ মিনিট পরে যদি ঐ ছোঁড়াটাকে টেলিভিশনে দেখতে না পায়, তাহলে বিশ্রি একটা সিদ্ধান্ত নেবে। তিনি বাধ্য হয়ে সম্মত হলেন। পার্থিবকে নিয়ে নিজেই রওনা হলেন দূরদর্শন কেন্দ্রে। মুহূর্তে বিপর্যয় হয়ে যেতে পারে। তিনি তাই স্বয়ং সুইচে একটি হাত দিয়ে বসলেন ওর ভাষণ শুনতে।

নির্দিষ্ট সময়ে পার্থিব এসে দাঁড়ালো স্ক্রীনের সামনে। হাসি হাসি মুখে। বললে, "হাই পৃথিবী! আমি হারিয়ে যাইনি তা তো

দেখতেই পাচ্ছ। দিব্যি বহাল তবিয়তে আছি। এরা আমাকে যে বন্দী করে রাখেনি তাও নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ। আমার পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। না হলে ওদের লিখিত বিবৃতি পড়ে শোনাতাম। নিজের ভাষায় এভাবে কথা বলতাম না! এমন কি আমি যদি শুক্রগ্রহের নামে খেস্তি-খেউরও করি এরা আমাকে বাধা দেবে না। কী বলেন জেনারেল কাওয়াবাতা?"

পাশে ফিরে এমনভাবে প্রশ্নটা সে করল যে, ক্যামেরাম্যান স্বভাবতই ক্যামেরা প্যান করে জেনারেলকে ধরল ফ্রেমে। জেনারেল তাড়াতাড়ি সুইচ থেকে হাতটা টেনে নিয়ে মৃদু হাসলেন। বোকার হাসি! মনে মনে মুণ্ডপাত করতে থাকেন ঐ নির্বোধ ক্যামেরাম্যানের।

পার্থিব বলে, "আপনারা হয়তো ভাবছেন জেনারেল কাওয়াবাতা সুইচে হাত দিয়ে কেন বসে আছেন। আমি বেচাল কিছু বলতে শুরু করলেই সুইচ অফ করে দিয়ে বুঝি তিনি ঘোষণা করবেন 'সরি ফর দ্য ইন্টারাপশান'। তা মোটেই নয়। উনি স্বয়ং এই দূর-ভাষণ প্রোগ্রামটা পরিচালনা করছেন।

এবারও কাওয়াবাতা বোকার হাসি হেসে বললেন, থ্যাঙ্কু!

ক্যামেরাম্যানের এতক্ষণে বুদ্ধি খুলেছে। সে ক্যামেরাটা ঘুরিয়ে এনে পার্থিবকে ফ্রেমে ধরল। পার্থিব বলতে থাকে, এখানে কেমন করে এলাম? সে অনেক কথা। ফিরে গিয়ে বলব। আমিই বোধহয় প্রথম পৃথিবীবাসী অ-জাপানী যে শুক্রগ্রহে এসে সবকিছু দেখবার সুযোগ পেল। এ হিসাবে আমি ভাগ্যবান। কী দেখলাম? সে-কথা এখন কেন বলব? ফিরে গিয়ে এক ঢাউস ভ্রমণ কাহিনী লিখব। সেটা হবে এ বছরের বেস্ট-সেলার। পাব্‌লিশারেরা অগ্রিম দিতে পারেন!...রসিকতা থাক! তবে ফিরে যেতে আমার কিছু বিলম্ব হবে। আমি এ গ্রহটিকে খুঁটিয়ে দেখতে চাই, বুঝতে চাই। ওঁরা আমাকে সে সুযোগ দিচ্ছেন এবং দেবেন। আমার নিরাপত্তার জন্য ব্যস্ত হয়ো না। আমি যে বহাল তবিয়তে আছি

এবং গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছি সে-কথা অন্তত পাঁচ মিনিটের জন্যও প্রতি সপ্তাহে এই সময়ে জানিয়ে যায়। তবে এখানে সপ্তাহের হিসাব কেমন করে রাখব জানি না। কারণ এখানে প্রতিটি দিন চারমাস দীর্ঘ!

"…হ্যালো ড্যাডি, হ্যালো মাম্মি! কোপারনিকাস্-বেস্ থেকে তোমরা আমাকে নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ। আমি বেশ ভালই আছি। শুক্রগ্রহটা এখন খুব গরম—মাস দুই পরে যখন রাত নামবে তখন নাকি জবর ঠাণ্ডা পড়বে। তবে তোমাদের কোপারনিকাস্ বেস এর মত আদৌ নয়। এখানে সকালে এবং বিকালে খোলা আকাশের তলায় খুব কিছু কষ্ট হয় না। হ্যালো বুড়ি! তোর বাচ্ছা কেমন আছে রে? তাকে বলিস্ তার মামা এমন একটা দেশে এসেছে যেখানে পশ্চিমদিকে সূর্য ওঠে আর পূর্ব দিকে অস্ত যায়! অনেকটা এ্যালিসের ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের মত! গুডবাই আর্থ। গুডবাই মুন! গুডবাই ভেনাস এ্যাণ্ড মার্কারি—এ্যাণ্ড দ্য মিড-ওয়ে এ্যাস্ট্রনট্স্!"

ব্রডকাস্টিং শেষ হল। কাওয়াবাতা আন্তরিকতার সঙ্গে ওর করমর্দন করে বললেন, আপনাকে অভিনন্দন জানাই! আমি খুব খুশি হয়েছি আপনার নির্ভীক আচরণে। কিন্তু একটা কথা…আপনি কি, মানে সত্যিই এখানে কিছুদিন থেকে যেতে চান?

পার্থিব বললে, দেখুন জেনারেল, আমি খোলা কথার মানুষ। আমি এত বোকা নই যে বুঝব না, ঐ মহাকাশ-দস্যুদের কাহিনীটা অলীক!·· না, না, আমাকে বাধা দেবেন না, সবটা বলতে দিন। তারপর আপনার বক্তব্যও আমি শুনব। আমি জানি, আপনারাই আমাকে ধরে এনেছিলেন; আমাকে এবং আমার আঙ্গে বন্ধুদের। কেন ধরে এনেছিলেন তাও আমার জানা। ঘটনাচক্রে যদি আমি ঐ রকম নেংটিসার হয়ে রঙচঙ মেরে আঙ্গেদের ভিতর না থাকতাম তাহলে এতগুলি মানুষের মৃত্যুর কথা পৃথিবী জানতে পারত না—

যেমন পৃথিবী আজও জানে না, সেই ডাচ্ ছোকরাটির কথা। আপনার সামনে এখন তিনটি রাস্তা খোলা আছে। এক নম্বর, আমাকে হত্যা করে লেঠা চুকিয়ে দিতে পারেন—সেক্ষেত্রে যে আন্তর্গ্রাহিক সমস্যার সমাধানটা আমি এই মাত্র করলাম, সেটা আগামী সপ্তাহে আপনাকে করতে হবে। দু-নম্বর রাস্তা—যে প্রস্তাব আপনি রেখেছেন। আমাকে অবিলম্বে পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো। সে-ক্ষেত্রে আমি যা কিছু দেখেছি, বুঝেছি, তা পৃথিবীতে গিয়ে প্রকাশ করার অধিকার আমার নিশ্চয় থাকবে। তৃতীয় রাস্তা যেটা আমি প্রস্তাব করছি। আমাকে আপনাদের সব কিছু দেখতে দিন, বুঝতে দিন—আমাকে আপনাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করুন। আমি যদি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, আপনারা পৃথিবীর চেয়ে একটা উন্নততর সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন—তাহলে হয়তো আমি কোনদিনই পৃথিবীতে ফিরে যেতে চাইব না। গেলেও আপনাদের বন্ধু হিসাবে যাব। হয়তো জাপানে গিয়ে বসবাস করব। এখন সিদ্ধান্ত নেবার পালা আপনার।

কাওয়াবাতা আসন ছেড়ে উঠে আসেন। আবার ওর করমর্দন করে বলেন, তুমি অত্যন্ত বুদ্ধিমান! কাওয়াবাতাকে এভাবে ইতিপূর্বে কেউ পরপর দুবার মাৎ করতে পারেনি! আমি তোমার তিন নম্বর প্রস্তাবটাই গ্রহণ করলাম।

যে কোন উদ্দেশ্যেই হ'ক, জেনারেল কাওয়াবাতা ওকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন। ও যেখানে ইচ্ছা যেতে পারে। যার সঙ্গে ইচ্ছা কথা বলতে পারে, যে-কোন সভায় উপস্থিত থাকতে পারে, বা যে-কোন বক্তৃতা মঞ্চে উঠে দু-চার-কথা বলতেও পারে। বাধা নেই। প্রশাসনিক বাধা নেই বটে তবে বাধা আছে অন্যত্র। ও কারও কথা বোঝে না, কারও সঙ্গে কথা বলতে পারে না। ওখানে সব কিছুই জাপানী ভাষায়। সূর্য যদি যায় পশ্চিম থেকে পুবে, তবে অক্ষর-গুলো নামে উপর থেকে নিচে।

ডক্টর পার্থিব রায় একেবারে গোড়া মেরে গবেষণা করবে বলে স্থির করল। জাপানী ভাষাটা শিখতে হবে। কিন্তু সেটা সময়-সাপেক্ষ। তার আগে কোন বড় লাইব্রারীতে গিয়ে কিছু বাছাবাছা বই পড়তে হবে—শুক্রের ইতিহাস, ভেনাসোগ্রাফি, ভেনাসোলজি, ওদের মতবাদ, দর্শন, প্রযুক্তিবিদ্যার বিষয়ে একটা প্রাথমিক ধারণা করে নেওয়া দরকার। যে-টুকু শুনেছে, দেখেছে, তাতে একটা তীব্র বিতৃষ্ণা জেগেছে—সবকিছুই বর্বর-ব্যবস্থা মনে হয়েছে। ওর বারে-বারে মনে পড়ে যাচ্ছে, আলডুস হাক্সলের লেখা 'ব্রেভ নিউ ওয়ার্ল্ড' উপন্যাসটির কথা। মানব-বিজ্ঞানী হাক্সলে যন্ত্রসভ্যতার ক্রমোন্নতিকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। দেখিয়েছিলেন, বর্বর সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে অত্যাধুনিক সমাজ-ব্যবস্থায় মানবিক মূল্যায়নে কোনও ফারাক নেই। আদিম বর্বর প্রকৃতি তার মজ্জায়! কিন্তু হাক্সলের সেই নির্ভীক নয়া দুনিয়ার সঙ্গে শুক্রের সভ্যতার তফাৎ আছে, একথা মানতেই হবে। হাক্সলের দুনিয়ায় শৈশব অবস্থা থেকেই কৃত্রিম উপায়ে মনকে বিকৃত করে তোলার ব্যবস্থা ছিল—বিবাহ-ব্যবস্থা, পিতৃত্ব, মাতৃত্বকে তারা অতি শৈশবেই ঘৃণা করতে শিখত। যে বয়সে মানব-শিশুর বিচার-বুদ্ধি থাকে না, তখনই ঘুমের মধ্যে তার কানে ক্রমাগত মন্ত্র দেওয়া হত—পদ্ধতিটার নাম 'হিপ্‌নোপিডিয়া', তাতে শিশুমন ঐভাবেই তৈরী হয়ে যেত। তার মানে হাক্সলের নয়া-দুনিয়ায় পৃথিবী বিচার-বুদ্ধি দিয়ে নয়া-ব্যবস্থাটা মেনে নেয়নি; ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রনিয়ামকদের পাশব-নির্দেশে ঐ ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গোটা জার্মানী যেমন মেনে নিয়েছিল হিটলারের ইহুদি-বিদ্বেষ তত্ত্ব, নাৎসীআর্য কৌলিন্যের তত্ত্ব! এখানে কিন্তু তা হয়নি। প্রচারের মাধ্যমে, ঔষধ প্রয়োগে, ভয় দেখিয়ে বা 'হিপ্‌নোপিডিয়া'য় মন বিকৃত করে সাত কোটি মানুষকে এরা দলে টানেনি! সাকুরা-কো বলেছে—সব জেনে বুঝেই সে শুক্রের ব্যবস্থাকে বরণীয় মনে করেছে। সাকুরা-কো একজন সুস্থ মস্তিষ্কের

সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। তাহলে কোন বিচারে পৃথিবী হেরে গেল শুক্রের কাছে? কেন সাকুরা-কো মানব-সংস্কৃতির হাজার বছর ধরে গড়ে-তোলা সুকুমার হৃদয়-বৃত্তিগুলিকে ছুঁড়ে ফেলে দিল—প্রেম, ভালবাসা, স্নেহ, দেশের জন্য প্রাণ-দেওয়া, জাতির স্বার্থে শহীদ হওয়া! কেন, কেন, কেন?

পার্থিবকে থাকতে দেওয়া হয়েছিল রাজধানীর একটি বিখ্যাত হোটেলে। সকাল-সন্ধ্যা দোভাষী নিয়ে নানান লোকে ওর সঙ্গে দেখা করতে আসে—সাংবাদিক, সমাজবিজ্ঞানী, দর্শনের অধ্যাপক, সাহিত্যিকের দল। টেলিভিশানে ভাষণ দেওয়ার পর থেকেই সে একজন সৌরবিখ্যাত লোক। কাগজে, সাময়িকীতে খুব ফলাও করে ওর ছবি ছাপা হচ্ছে, বিবরণ লেখা হচ্ছে। পার্থিব একজন হাইপার-ভি-আই-পি। সাকুরা-কোও দেখা করতে আসে। প্রায় রোজই। এই বিদেশী, বিদেশী শুধু নয়, বিগ্রহী দীর্ঘদেহী মানুষটির প্রতি সাকুরা-কোরও দুরন্ত কৌতূহল। পার্থিব ঐ মেয়েটিকেই ধরে পড়ল একটা ভাল লাইব্রেরীর সন্ধান দিতে।

—এখনই নিয়ে যাচ্ছি, চল।

পার্থিব তৈরীই ছিল। নোটবই আর কলমটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। হোটেলের ঘরটা তালা বন্ধ করার উপক্রম করতেই সাকুরা-কো বলে ওঠে, তুমি কি রোজ ঘর তালা বন্ধ করে যাও নাকি? অহেতুক। এখানে কেউ তোমার কোন জিনিস চুরি করবে না। ঘর খোলা থাক। এস।

সাদামাটা কথা; কিন্তু পার্থিবের মন বোধকরি কষে বাঁধা তার-সানাইয়ের তারের মত স্পর্শকাতর হয়ে পড়েছে। জবাবে বললে, আমার জিনিস আর কোথায় সাকুরা-কো? এসেছিলাম তো নেংটিসার হয়ে। এই ক্যামেরা, বাইনো, নোটবই, জামা-কাপড় সবই তো তোমাদের অযাচিত দান।

সাকুরা-কো জবাব দিল না। আড়চোখে একবার তাকিয়ে

দেখল ওর দিকে। নীরবে দুজনে করিডোর দিয়ে লিফ্‌টের দিকে চলতে থাকে। পার্থিব পুনরায় বলে, আর তোমার ও-কথাটাও ঠিক। এটা চোরের-দেশ পৃথিবী নয়। সাধুর রাজ্য শুক্রগ্রহ। শুক্রগ্রহে আমার দৈহিক উপস্থিতিটাই তো তার প্রমাণ! সর্বাঙ্গ দিয়ে সে তত্ত্বটা নিত্য অনুভব করি।

এবারও মেয়েটি জবাব দিল না। জানে, কথা বললেই কথা বেড়ে যাবে। স্বয়ংক্রিয় লিফ্‌টের দরজা খুলে যায়। পার্থিব বোতামটা টিপবার উপক্রম করতেই মেয়েটি তার হাত চেপে ধরে, না, আমরা নিচে নামব না। উপরে উঠব।

—উপরে? মানে ছাদে?

—হ্যাঁ, ওখানেই আমার টু-সীটারটা পার্ক করা আছে।

চার-চাকার মটোর গাড়ি নয়, তিন-ডানার হেলিকপ্টার। পেট্রোল নয়, চলে পারমাণবিক-শক্তিতে। শুক্রের মাটির গভীরে সোনার সন্ধান মিলেছে, লোহা, নিকেল, ম্যাঙ্গানিজ, টিন পাওয়া গেছে—কিন্তু কয়লা বা পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়নি। শুক্রের জীবনে 'কার্বোনিফেরাস' বা 'জুরাসিক' যুগ ও-ভাবে আসেনি। প্রাগৈতিহাসিক যুগের অতিকায় মহীরুহ, অতি-বিশাল ডাইনোসর ভবিষ্যৎ মানুষের জন্য দধীচি হয়নি।

টু-সীটার হেলিকপ্‌টার আকাশ পথে চলতে শুরু করে। নিচে শহরের স্কাই-স্ক্রেপারের মিছিল। তিন তলা রাস্তায় মানুষ চলেছে। শহরের মানুষ সচরাচর দূরপাল্লার পাড়ি জমায় আকাশপথে। হেলিকপ্টারে। প্রজাপতি যেমন ফুটন্ত ফুল ছুঁয়ে ছুঁয়ে উড়ে বেড়ায় হেলি-ওমনিবাস তেমনি জনবহুল স্থানগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে যাতায়াত করছে। আকাশমার্গে আপ-ডাউন ট্রাফিকের জন্য নির্দিষ্ট উচ্চতা বাঁধা আছে। ফলে ক্রসিং-র মুখে ট্রাফিক-সিগ্‌নাল প্রয়োজন হয় না। তবে পেট্রল-পুলিশ নজর রাখে কেউ তাড়াতাড়ি যাবার তাগিদে ট্রাফিক-রুল ভেঙে বে-আইনি

'অপ্টিচুডে' যাচ্ছে কিনা।

নিখিল-শুক্র-গ্রন্থাগারের বিশাল অট্টালিকা এই রাজধানীতেই। তার ছাদে ওদের আকাশযান নামল। সারা ছাদটাই পার্কিং-জোন। দারোয়ান নেই। লাল-সবুজ বাতির সঙ্কেতে সহজেই বোঝা যায় কোথায় অবতরণ করা নিরাপদ এবং কোথায় গাড়ি 'পার্ক' করতে হবে। লাইব্রারীর সামনে খোলা মাঠের মাঝখানে একটা প্রকাণ্ড মূর্তি। দণ্ডায়মান একজন দাড়ি-ওয়ালা ঝাঁকড়া-চুল বৃদ্ধ। চেহারাটা চেনা-চেনা। পার্থিব বলে, ওটা কার মূর্তি বল তো?

—তোমার চেনা উচিত ছিল। কার্ল মার্কস্-এর।

—হায় ভগবান! মার্কস্! কেন? শুক্রে ওঁর চেয়ে সুদর্শন কোন লোক তোমরা খুঁজে পেলে না?

সাকুরা-কো বলে, আজ তোমার কী হয়েছে বল তো? ক্রমাগত খোঁচা দিয়ে চলেছ? তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পার, কার্ল মার্কস্‌ই শুক্রের বর্তমান চিন্তাধারার আদি জনক।

—না, বুঝতে পারছি না। একটু বুঝিয়ে দেবে?

—মার্কস-লেনিন অর্থনৈতিক সাম্যের কথা বলেছিলেন—অর্থ, খাদ্য, সম্পদের সমবণ্টন ব্যবস্থা করেছিলেন, ব্যক্তিগত মালিকানার উচ্ছেদ ঘটিয়েছিলেন। আমরা এখানে সেই চিন্তাধারাটাকেই আরও ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করতে চাইছি। সমাজগত জীবন থেকে সাম্যকে বিকশিত করতে চাইছি পরিবারগত জীবনে, ব্যক্তিগত জীবনে। পুত্রের উপর পিতার মালিকানা, স্ত্রীর সতীত্বে স্বামীর মালিকানা—

—থাক! —ওকে মাঝপথে থামিয়ে দিল পার্থিব।

গ্রন্থাগারে কিন্তু বিশেষ সুবিধা হল না। লক্ষ লক্ষ বই ওখানে সাজানো। কিন্তু দীর্ঘদেহী পার্থিবের মনে হয় সে যেন এ্যালিসে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এ আজব-দেশে স্ফটিক টেবিলের উপর চাবিকাঠিটা দেখা যাচ্ছে; কিন্তু সেটা নাগালের বাইরে। এখানে সব

বই জাপানী ভাষায়। গ্রহান্তরের কোন পাঠক এসে যে অন্য ভাষায় বই চাইতে পারে এটা বোধকরি কর্তৃপক্ষ খেয়াল করেননি।

পার্থিব বললে, বৃথাই তোমাকে কষ্ট দিলাম।

—না, সবটাই বোধহয় বৃথা হয়নি। এস, তোমার সঙ্গে রেভারেণ্ড ফুজিসানের আলাপ করিয়ে দিই। তিনি এই গ্রন্থশালার গ্রন্থগারিক। মহাপণ্ডিত এবং মহাস্থবির। জ্ঞানের আকর। বিশ-ত্রিশটা ভাষা জানেন। তোমার অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করতে পারবেন।

পার্থিব বলে, 'রেভারেণ্ড' মানে? উনি কি খ্রীষ্টান?

—না। ওটা এখানকার বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের দেওয়া খেতাব।

—বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম! তাজ্জব! তোমরা ধর্ম মানো?

—আমি মানি না। রাষ্ট্র মানে না। তবে কেউ যদি ব্যক্তিগত জীবনে কোন বিশেষ ধর্মীয় মতবাদ মানতে চায়, তাহলে বাধাও দেওয়া হয় না।

—রেভারেন্স্ট ফুজিসান তাহলে বৌদ্ধ? মহাযানী না হীনযানী?

—না। উনি বৌদ্ধ নন আদৌ। শুনেছি উনি নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী।

—বৌদ্ধ মাত্রেই তো নিরীশ্বরাদী, অন্তত ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরব।

—হতে পারে। আমি ঠিক জানি না। তবে রেভারেণ্ড ফুজিসান বৌদ্ধ নন। যদিও থাকেন ঐ সঙ্ঘারামেই। তাঁর আচার-আচরণও বৌদ্ধ ভিক্ষুকের মত। তিনি এই সঙ্ঘরামে অগ্রসেবকের মত সম্মানিত অর্হং, যদিও নিজে বৌদ্ধ নন। রাষ্ট্র নানান বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নেয়। বস্তুত তিনিই বোধকরি এ গ্রহে সবচেয়ে বড় পণ্ডিত।

—চল, তাহলে তাঁকে প্রণাম করে আসি।

কথা বলতে বলতে গ্রন্থাগারের সংলগ্ন একটি বৌদ্ধ মঠে ওরা এসে উপস্থিত হয়। একটি গুহা-বিহারের মত কক্ষের অলিন্দে এসে

দাঁড়ায়। এখানে যন্ত্র নেই, পীতবসনধারী মুণ্ডিতমস্তক এক শ্রমণ এগিয়ে এসে জানতে চান ওরা কি চায়। সাকুরা জাপানী ভাষায় বললে, ওরা রেভারেণ্ড ফুজিসানের দর্শনমানসে এসেছে। সংক্ষেপে পার্থিবের পরিচয়টাও দিল। বৌদ্ধ শ্রমণ ওদের অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে গেলেন। একটু পরেই ফিরে এসে বললেন, আসুন।

ভিতরের কক্ষটি প্রায়ান্ধকার। কয়েকটি প্রদীপ জ্বলছে, এখানে ওখানে। একটি বেদীর উপর ভূমিতে বসে রেভারেণ্ড কোন গ্রন্থ পাঠ করছিলেন; ওদের আসতে দেখে বইটা বন্ধ করেন। তাঁর বয়স কত বোঝা যায় না, মুখ বলিরেখাঙ্কিত। মস্তক মুণ্ডিত। পরিধানে আ-গুল্‌ফলম্বিত পীত অজীন। ওরা দুজনেই ওঁর সামনে নতমস্তক হল। বৃদ্ধ একটি হাত বাড়িয়ে দিলেন। অস্ফুটে বললেন, আরোগ্য।

সকলে উপবেশন করলে সাকুরাকো বলে, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি···

—আই নো! ওয়েলকাম ডক্টর রয়!

পার্থিব সঙ্কুচিত হয়ে ইংরাজিতে বললে, আপনি আমাকে নাম ধরেই ডাকবেন। 'তুমি' বলবেন। আমার নাম 'পার্থিব'।

রেভারেণ্ড স্মিত হাসলেন। পরিষ্কার বাঙলা ভাষায় বললেন, কেন ভাই? 'শুক্রে' এসে 'পার্থিব' সেজে দূরে সরে যেতে চাইছ কেন? ডাকলে তোমাকে 'বুড়ো' নামেই ডাকা উচিত। কি বল?

পার্থিব বজ্রাহত! ওঁর মুখে বাঙলাভাষা শুনে নয়। ওর ডাক নামটা—যে নামে বিশ পঁচিশ বছর আগে ডাকতেন বাবা-মা, সেই নামটা উনি জানলেন কেমন করে। বৃদ্ধ কি অন্তর্যামী?

—আপনি···আপনি আমার ডাকনামটা—

—অতি সহজে। তুমি জান না পার্থিব, তুমি যেমন শুক্র গ্রহটাকে নিয়ে গবেষণা করছ, আমরাও তেমনি তোমাকে নিয়ে

একটা গবেষণার আয়োজন করেছি। তোমার আদ্যোপান্ত 'বায়োডাটা' আমাকে ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে।

—আমার বায়োডাটা! কেন? কি হবে তা দিয়ে?

—আমরা এখানে একটা বিরাট মানবিক পরীক্ষা করছি—একটা অভিনব সমাজ-ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছি। তাতে এমন কতকগুলি মৌল প্রাক-কল্পনা বা 'হাইপথেসিস্' আছে যা পৃথিবীতে অকল্পনীয়। আমাদের এসব কথা জানতে পারলে পৃথিবী মর্মাহত হবে, হয়তো পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্যের সম্পর্কটা ছিন্ন হয়ে যাবে। তাই শুক্রের চারিদিকে আমরা একটা রহস্যঘন যবনিকা টাঙ্গিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমরা ভেবে দেখলাম—এই গ্রহের সাত কোটি নরনারী এই বাতাবরণেই মানুষ হয়েছে, ওরা এটাকে আশৈশব স্বতঃসিদ্ধের মত মেনে নিয়েছে—এখন তাদের কারও পক্ষে নিরপেক্ষ বিচার সম্ভবপর নয়। তুমি ঘটনাচক্রে আমাদের গ্রহে প্রথম পার্থিব জীব। তুমি নির্বোধ সংস্কারাচ্ছন্ন নও, তোমার বৈজ্ঞানিক শিক্ষা আছে, মুক্ত চিন্তা করার মত মনের প্রসারতা আছে। বিনা বিচারে নিশ্চয় তুমি আমাদের সব কিছু অসভ্য, বর্বর বলে উড়িয়ে দেবে না। তোমার কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা। তুমি দেখ, বোঝ, বিচার কর—তারপর তোমার নিরপেক্ষ মতামত আমাদের জানাও। বস্তুত আমারই পরমর্শে তাই শুক্রের যাবতীয় তথ্য তোমার কাছে অকপটে মেলে ধরা হচ্ছে। আমরা জানতে চাই—সব দেখে শুনে তুমি কি রায় দাও। আমরা মানবসভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, না কি আমাদের এই দ্রুত অগ্রগতি লক্ষ্যের বিপরীতমুখী।

সাকুরা-কো দুজনের মুখে পর্যায়ক্রমে দৃষ্টিপাত করে ইংরাজিতে বললে, রেভারেণ্ড, আলোচনাটা আপনারা ইংরাজিতে করলে আমিও যোগ দিতে পারি।

রেভারেণ্ড তাঁর বলিরেখাঙ্কিত হাতটি বাড়িয়ে দিলেন ওর বব-করা মাথায়। ইংরাজিতে বললেন, না মা! একটু ধৈর্য ধর,

গোপন কথাটা শেষ হলেই আমরা তোমার বোধগম্য ভাষায় ফিরে আসব।

—আয়াম সরি!

পার্থিব সাদা বাঙলাতেই বললে, আমার মতামতের কী দাম?

—দাম আছে বইকি! মহাপণ্ডিতেও যখন কোন গ্রন্থ রচনা করেন, সেটা পড়তে দেন সাধারণ পাঠককে। অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন তার প্রতিক্রিয়া। তাছাড়া··হ্যাঁ, তোমাকে জানানোর সময় হয়েছে···শোন বলি—তুমি জান, অন্তত আন্দাজ করতে পার শুক্রের এই যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা এর মূলে আছে আতঙ্ক! 'ওয়র অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস্' যদি ঠেকিয়ে রাখা না যায়—পৃথিবী আর শুক্র যদি কোন আন্তর্গ্রাহিক মহাযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে তাহলে শুধুমাত্র উন্নততর যুদ্ধাস্ত্র দিয়েই আমরা সে দুর্দৈবকে ঠেকাতে পারব না। আমাদের প্রতিটি সৈনিকের বিরুদ্ধে পৃথিবী আজ একশ' জন সৈনিক যুদ্ধক্ষেত্রে নামাতে পারবে। এ আশঙ্কা যদি না থাকত তাহলে শুক্র এমন পাগলের মত জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে মনোনিবেশ করত না। কিন্তু ভেবে দেখ, এ ভাবে আমরা বস্তুত মানবসভ্যতার সর্বনাশই করছি। পৃথিবীতে আজ যেমন খাদ্যাভাব, স্থানাভাব, খনিজ-সম্পদের অভাব দেখা দিয়েছে কয়েক শতাব্দী পরে শুক্রেরও সেই অবস্থা হবে, নয় কি?

পার্থিব বললে, তাই হবারই আশঙ্কা আছে, মনে হয়।

—এই প্রসঙ্গে আরও বলি···হ্যাঁ, তোমাকে জানাতে কোন বাধা নেই···আমরা হয়তো আগামী দশকেই এই সৌরমণ্ডলের বাইরের কোন জগতে যেতে সক্ষম হব। অন্য কোন নক্ষত্রের অন্য কোনও গ্রহে। সে গ্রহ তার সূর্যকে এমন দূরত্বে এমন ছন্দে প্রদক্ষিণ করছে যাতে সেখানে জীবনের বিকাশ সম্ভব। আমরাও গিয়ে বাস করতে পারি। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? তা হোক, ওটা বরং মেনেই নাও আপাতত। সে-ক্ষেত্রে সেই নূতন সূর্যের নূতন গ্রহে আমরা

হয়তো একটা নূতন ক্ষেত্র পাব। যাকে বলে 'ক্লীন স্লেট'। আমরা এখনই স্থির করতে চাই সেখানে কেমন ছবি আঁকব ? নূতন জগতের সমাজ ব্যবস্থা কেমন হবে—শুক্রধর্মী না পৃথিবীধর্মী, নাকি দুটোর সিন্থেসিস ?

—কিন্তু নিদাগ স্লেট সেখানে পাবেন, এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন ? এমনও হতে পারে সেখানে ইতিমধ্যেই জীব বিবর্তিত হয়েছে।

—পারেই তো। নূতন জগতের ওরা আমাদের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান, বেশি উন্নত হতে পারে, আবার বিবর্তনের পূর্ব অধ্যায়ের বাসিন্দাও হতে পারে। সে গ্রহের আকার, সূর্য থেকে দূরত্ব ভিন্ন প্রকারের হতে পারে—সে ক্ষেত্রে জীব বিবর্তনের ইতিহাসটাও অন্যরকম হবে।

পার্থিব বলে, বুঝলাম। কিন্তু আমি আজ এই গ্রন্থাগারে এসেছিলাম—

ওকে বাধা দিয়ে রেভারেণ্ড এবার ইংরাজিতে বলেন, জানি। তাতে হতাশ হবার কিছু নেই। তুমি আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহের গ্রন্থাগারটি ব্যবহার করতে পার। সেখানে নানান ভাষায় বই আছে। ইংরাজি যথেষ্ট, এমন কি সংস্কৃত, পালি, হিন্দি, বাংলা—

—আপনি কতগুলি ভাষা জানেন ?

বৃদ্ধ মৃদু হাসলেন। মেয়েটির দিকে ফিরে বললেন, সাকুরা-মা, তুমি একে আমাদের 'হোমো-স্যাপিয়ান্স ম্যানুফ্যাক্চারিং ফার্ম', 'সয়ালেণ্ট গ্রীণ' কারখানা ইত্যাদি ঘুরিয়ে দেখিয়ে দিও।

এবার সাকুরা-কো জাপানী ভাষায় বললে, রেভারেণ্ড, আমি ওঁকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিশু জন্মের কথাটা বলেছি, তাতে উনি এতটা 'শক্‌ড' হয়েছেন যে, আমার আশঙ্কা 'সয়লেণ্ট গ্রীণ' প্রকল্পটা উনি আদৌ বরদাস্ত করবেন না।

রেভারেণ্ট বলেন, তা হোক। আমরা কিছুই গোপন করব না। দেখি তার কি প্রতিক্রিয়া হয়।

পার্থিব একটা অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করল। বলল, একটা কথা। 'ফুজিসান' কথাটা কোথায় যেন শুনেছি। ওর মানে কি?

বৃদ্ধ হাসলেন। একটি সুইচ টিপে দিলেন। চৈত্য বিহারের কক্ষটা আলোকিত হয়ে উঠল। উনি পিছনের প্রাচীরে অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন। পার্থিব তাকিয়ে দেখে সেখানে দেওয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড একটা ফ্রেস্কো। অত্যন্ত পরিচিত চিত্র। প্রখ্যাত জাপানী চিত্রকর হকুসাইয়ের একটি বিখ্যাত চিত্রের অনুকরণ: কানাগাওয়া সমুদ্রতীরের উর্মিমালা। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সামুদ্রিক ঢেউ যেন নখদন্ত বিস্তার করে কতকগুলি নাবিককে আক্রমণ করতে আসছে।

রেভারেণ্ড বললেন, শিল্পী তিনটি সমুদ্র-তরঙ্গকে প্রাধান্য দিয়েছেন। বৃহত্তম ঢেউটাকে বাদ দিলে বাকি দুটির 'ফর্ম' একই রকম, নয় কি? কিন্তু দূরের ঐ পিরামিড আকারের ঢেউটাকে মাঝে মাঝে যেন পর্বতচূড়া বলে মনে হয়। তোমারও তাই হচ্ছে?

পার্থিব বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, জাপানের একটি অতি পরিচিত পর্বতশৃঙ্গের সঙ্গে ঐ ঢেউটার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

—কোন পর্বত শৃঙ্গ বল তো?

—এতক্ষণে মনে পড়েছে,—জাপানের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ 'ফুজিয়ামা'।

রেভারেণ্ড বললেন, ঠিক তাই। কিন্তু 'ফুজিয়ামা' শব্দটা ব্যাকরণ সঙ্গত নয়। তার প্রকৃত নাম—'ফুজিসান'। 'সান' মানে পর্বত, জাপানীরা ঐ ফুজিসান পর্বতকে বুদ্ধদেবের প্রতীক বলে মনে করে, যেন ফুজিসান ঈশ্বর-নির্মিত একটি স্তূপ—তথাগতের প্রতীক।

এবার অন্য প্রসঙ্গে আসে পার্থিব, কিন্তু শিল্পী ঢেউটাকে অমন একটি পরিচিত পর্বতের আকারে আঁকলেন কেন?

—তার একাধিক ব্যাখ্যা হতে পারে। নাবিকদের কাছে ঐ তরঙ্গমালা হচ্ছে বাধা, মৃত্যুদূত। অথচ সমুদ্রই ওদের জীবন।

জ্ঞানযোগীর চরম লক্ষ্য যেমন ঐ পরম জ্ঞানের আকর বুদ্ধপ্রতীক ফুজিসান, ঐ কর্মযোগী নাবিকদের কাছে অশান্ত সমুদ্রও তেমন চরম লক্ষ্য—এমন একটা ইঙ্গিত শিল্পী দিয়ে থাকতে পারেন।

পার্থিব লোভ সামলাতে পারে না। বলে, আমার অন্তরে চিত্রটি কিন্তু অন্য একটা ব্যঞ্জনা নিয়ে আসছে। আমার মনে হচ্ছে, ফুজিসান-সদৃশ পর্বত চূড়াকে ছাপিয়ে-উঠা ঐ রাক্ষুসে ঢেউটা দেখিয়ে শিল্পী বলতে চেয়েছেন যে, নাবিকদের জীবনে পরমপ্রাপ্তিকে অতিক্রম করে যাচ্ছে তার প্রত্যক্ষ বাধা। ফুজিসানকে ছাপিয়ে উঠেছে সংসার-সমুদ্রের অশান্ত ঊর্মিমালা!

বৃদ্ধ হাসলেন। বললেন, আমার অন্তরে কিন্তু আজ ঐ চিত্রটির অন্য রকম ব্যঞ্জনা! আমার মনে হচ্ছে—ঐ পর্বতশৃঙ্গ হচ্ছে আমাদের চরম লক্ষ্যের প্রতীক—অমৃতসাধনার শেষ ফলশ্রুতি। ঐ নাবিকেরা সেই ফুজিসান পর্বতের দিকেই যেতে চায়, কিন্তু তাদের সামনে আছে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা। নাবিক যেন 'কচ'; এসেছে শুক্রাচার্যের কাছে 'অমৃত-সাধনা'র সন্ধানে। আর তার পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে ঊর্মিমালার 'দেবযানী'। হয়তো এই গ্রহটার নাম তোমাদের ভাষায় 'শুক্র' হওয়াতেই এই প্রতীক-চিত্রটা আমার মনে জেগেছে।

সাকুরা-কো জানতে চায়: 'কচ' আর 'দেবযানী' মানে?

বৃদ্ধ তাকে প্রত্যুত্তর না দিয়ে পার্থিবকেই বলেন, তুমি তো 'ফুজিসান' শব্দটার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ খুঁজছিলে, কিন্তু 'সাকুরা-কো' শব্দটার অর্থ জেনে নিয়েছ ওর কাছে?

—আজ্ঞে না। 'সাকুরা-কো' মানে কী?

—'কো' হচ্ছে আদরের ডাক—বাঙলার যেমন 'সোনা', 'মনি'। তুমি যেমন ছেলেবেলায় তোমার বোনকে ডাকতে 'বুড়িসোনা' বা 'বুড়িমনি' বলে। আর 'সাকুরা' হচ্ছে চেরিফুল। যা জাপানে ফোটে এবং যে ফুল এত চেষ্টা করেও আমরা শুক্রগ্রহে আজও ফোটাতে পারিনি।

পার্থিব সাহসে ভর করে বললে, এতক্ষণে আপনি একটা ভুল কথা বলেছেন, রেভারেণ্ড। চেরি ফুল শুক্রাচার্যের আশ্রমেও ফোটে। আমি দেখেছি।

সাকুরা-কো লজ্জা পেল। গাল দুটি তার চেরিফুলের মত লাল হয়ে ওঠে।

আশ্চর্য! এই স্বেচ্ছাচারী সমাজে ওসব সূক্ষ্ম অনুভূতি তাহলে আজও মরেনি?

সাকুরা-কো ওকে শহর ও শহরতলীর যাবতীয় দ্রষ্টব্য জিনিস দেখিয়ে এনেছে। শুক্র-সংস্কৃতির বয়স মাত্র পঞ্চাশ বছর। তাই ওখানে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন নেই—এ্যাক্রোপোলিস, পার্থেনন, পিরামিড, তাজমহল ওখানে খুঁজে পাবে না। গাছ আছে, অরণ্য নেই; সমুদ্র আছে তার গভীরতা নেই; জনপদ আছে, তাদের ঐতিহ্য নেই; কীট-পতঙ্গ-পশু-পাখী আছে, তারা সংখ্যায় নগণ্য। ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে। কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, পশু-পাখী, সজীব-গ্রহের আবশ্যিক অঙ্গ। জীবন নাট্য-চক্রের অপরিহার্য কুশীলব। তাই ওরা শুধু প্রজাপতি, মৌমাছি, গুটিপোকা, লাক্ষা-কীটই, নয়—শকুন, শেয়াল, কাকের সংখ্যাবৃদ্ধি করছে অতি সযত্নে। ওরা একটা চিড়িয়াখানা বানিয়েছে। নামটি সুন্দর: 'নোয়াজ আর্ক'। পৃথিবী থেকে জোড়ায় জোড়ায় জন্তু আমদানি করেছে—হাতী, জিরাফ, উট, বাঘ, সিংহ, ক্যাঙ্গারু। একটি খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে সাকুরা-কো বললে, এ জন্তুটা চেন?

—না। কখনও দেখিনি।

—দেখবার উপায়ও নেই। পৃথিবীতে ও জন্তু আর নেই। ওর নাম 'কোয়ালা'। আমরা পৃথিবী থেকে 'ব্লু-হোয়েল'ও আমদানি করে আমাদের সমুদ্রে ছাড়তে চেয়েছিলাম। ষাটের দশকে, মানে পনের ষোলো বছর আগে সে-জন্য একটা বিরাট আকাশযান তৈরী হচ্ছিল;

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পরিকল্পনা পরিহার করতে হল। কী ভাবছ? অতবড় জলচর জীবকে মহাকাশ পাড়ি দিয়ে আনা গেল না বলে?

পার্থিব বললে, না। ওটা আমার সাবজেক্ট। আমি জানি, ২০৬৪ সালের পর পৃথিবীতে 'ব্লু-হোয়েল' আর দেখা যায়নি।

যাদুঘরও আছে। প্রাগৈতিহাসিক জীবের জীবাশ্ম নেই, তার নকল আছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন যুগে, যে-সব বস্তু বা প্রাণী ছিল তার মডেল আছে। শুক্র-সভ্যতার বিবর্তন যেন পার্থিব মানব-সভ্যতার চুম্বকরূপ। পৃথিবীতে হাজার হাজার বছর ধরে যা ঘটেছে ওখানে যেন তাই ঘটেছে কয়েক দশকে। আদিম শুক্রবাসী প্রথম যুগে ২০১০ থেকে ২০৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যাযাবর ছিল। প্রকৃতির তাড়নায়। শুক্র নিজের অক্ষের চারদিকে একপাক ঘুরতে সময় নেয় প্রায় ২৪৩ পার্থিব দিন, এবং সূর্যপ্রদক্ষিণ করে প্রায় ২২৫ দিনে। ফলে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়—এক সূর্যোদয় থেকে পরবর্তী সূর্যোদয়ের ব্যবধান ১১৭ পার্থিব-দিন। অর্থাৎ আমাদের প্রায় চার মাসে। তার দু-মাস রাত, দু-মাস দিন। মধ্যাহ্ন-দিনের উত্তাপ অত্যন্ত বেশী, মধ্যরাত্রির তাপমাত্রা অনেক নিচে। তাই প্রথম দুই-দশক মানুষ শুধুমাত্র মেরু-অঞ্চলে বাস করত। মেরু-অঞ্চলের দিবাভাগে। সেখানে দু-মাস-ব্যাপী দিনের উত্তাপ অনেকটা সহনীয়। দু-মাস পরে যাযাবরের দল তাঁবু গুটিয়ে চলে যেত দ্রাঘিমারেখা ধরে দক্ষিণ-মেরুতে—সেখানকার মেরু-অঞ্চলের দিবাভাগে মাস দুই কাটিয়ে আসতে। তারপর আরও বেশি জোরদার 'ব্লু-এ্যাল্‌গি' প্রকল্পে শুক্রাকাশের কার্বন ডায়ক্সাইড যখন আরও বেশি পরিমাণে অক্সিজেনে রূপান্তরিত হল তখন আরও বৃষ্টি হল, আরও সহনীয় হল উত্তাপের হেরফের। ক্রমে শুক্রসভ্যতা ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র গ্রহে। গড়ে উঠল গঞ্জ, শহর, মহানগরী, মেগানোপোলিস্‌। তবু এখনও বিষুব-অঞ্চল বিরল বসতি।

আর্ট গ্যালারি আছে; কিন্তু পার্থিব লক্ষ্য করে দেখেছে মৌলিক

সৃষ্টি নেই। কেবল নকল, নকল আর নকল। পৃথিবী থেকে ধার করা শিল্পসম্পদ। আল্তামেরা গুহাচিত্র থেকে মিশরীয়, ব্যাবিলোনীয়, মহেন-জো-দারো, নসস্, চীন, গ্রীক শিল্পের নিছক কিন্তু সার্থক অনুকরণ। তারপর রেনেসাঁ ইতালীয়---বত্তিচেল্লি, তিশান, মিকেলাঞ্জেলো, দা-ভিঞ্চি, রাফায়েল, এল গ্রেকো, রেমব্রাঁ, রুবেন্স থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত—মানে, ভ্যানগখ্, মাতিস, পিকাসো ইত্যাদি।

পার্থিব বললে, এ তো সবই নকল। তোমরা মৌলিক ছবি আঁক না!

—আঁকি। সেটা আছে 'ভেনাস আর্ট গ্যালারি'-তে।

সেখানেও গিয়েছিল ওরা। পার্থিব রীতিমত হতাশ হয়। অধিকাংশ ছবিই জ্যামিতিক পদ্ধতিতে আঁকা। বিবর্তনটা ইউক্লিড-জ্যামিতি থেকে ঘন জ্যামিতির পথ ধরে চতুর্মাত্রিক টেনসর ক্যালকুলাসে এসে ঠেকেছে। সবই বিমূর্ত চিত্র। মূর্তি পরিগ্রহ করেনি। কিছু কিছু ফিগর-স্টাডি আছে বটে, কিন্তু তা শুধু বহিরঙ্গের পরিচায়ক। তার যেন প্রাণ নেই। সাকুরা-কো বললে, কেমন দেখছ?

—কী?

—কি-আবার? ছবি! এতক্ষণ যা দেখছ?

—ও! এগুলিকে তোমরা ছবি বল বুঝি?

রুখে ওঠে মেয়েটি, বলে, হ্যাঁ বলি! এ ছবি দেখতে হলে শুধু চোখ নয়, মস্তিষ্ক থাকা চাই।

পার্থিব বলে, হাতের সঙ্গে মস্তিষ্ক যুক্ত হয়ে যা তৈরী করা হয়, আমাদের দেশে আমরা তাকে বলি 'ক্রাফ্ট'। 'আর্ট' পদবাচ্য শুধু তাই, যেখানে হাতের সঙ্গে হৃদয় যুক্ত হয়। তা 'হৃদয়' বলতে তোমরা তো বোঝ শুধু অরিক্ল্ আর ভেন্ট্রিক্ল্-এর সমাহার। তোমাকে কেমন করে বোঝাই?

শুধু এসব দ্রষ্টব্যস্থান নয়, ওকে নিয়ে গেছে অবসর বিনোদনের আড্ডায়—খেলার মাঠে, জুয়ার আড্ডায়, নৈশ-ক্লাবে, ক্যাবারে-নাচের আসরে, সিনেমায়। সিনেমা দেখেও ক্ষেপে উঠেছিল পার্থিব—এও তো সেই ধার করা পৃথিবীর প্লট। ঈর্ষা-দ্বেষ, প্রেম-বিবাহ, খুন-জখম এবং ত্রিকোণাকৃতি প্রেমের কাহিনী। এক মেয়ে দুই ছেলে, আর দুই মেয়ে এক ছেলে। এবারও রুখে উঠেছিল পার্থিব—কই এখানে তো তোমরা মস্তিষ্কের পরিচয়টাও রাখতে পার নি! তোমাদের সমাজ-জীবনের সমস্যা কই? এ তো পৃথিবীর কাছ থেকে ধার করা গল্প?

—সো হোয়াট? আমাদের সমাজই নেই, তার সামাজিক সমস্যা! আর গল্পের খাতিরে অমন পার্থিব-প্লট মেনে নিতে দোষ কি? তোমাদের সাহিত্য দর্শনের গল্পে, জাতকের গল্পেও তো গরুর পাল গুড়গুড়িয়ে গাছে উঠ্‌ত। তোমরা তা দেখে আনন্দ পেতে না?

—হ্যাঁ, পেতাম। কারণ রূপকের মাধ্যমে আমরা আমাদের সামাজিক সমস্যাগুলোকেই নূতন দৃষ্টিতে দেখতে পেতাম।

—দুঃখিত। আমাদের ও-জাতীয় সমস্যা নেই; তাই আমাদের কাছে চলচ্চিত্র শিল্পটা 'আর্ট ফর আর্টস্ সেক'। আমরা সিনেমা দেখি শুধুমাত্র আনন্দ পেতে। সমস্যার সমাধান খুঁজতে নয়। তোমরা যেমন আজও 'স্পার্টাকাস' দেখ, 'আঙ্কল্ টমস্ কেবিন' দেখ—দাস-সমস্যার সমাধান হবার পরেও।

পার্থিব বললে, না। আমরা যখন ওগুলো দেখি তখন এই দৃষ্টি নিয়েই দেখি যে, স্পার্টাকাস মরেনি, 'আঙ্কল্ টমস্ কেবিন' টিকে আছে অন্য নামে।

—আবার বলব 'সরি'! আমাদের বর্বর সমাজ-ব্যবস্থায় তারা অন্য নামে টিকে নেই। আমাদের ও-জাতের কোন সমস্যাই নেই। তাই বলে তোমরা কী ভাবে সমস্যা-সমাধানে ব্যর্থ হয়েছ তাই দেখে

আমরা যদি ট্রাজিক নাটক দেখার আনন্দ পাই তাহলে তোমার আপত্তি কেন ?

পার্থিব অন্যদিক থেকে আক্রমণ করে, আচ্ছা, এই কোন সমস্যা না থাকাটাই একটা সমস্যা নয় কি ? 'উদ্বেগ নাই, প্রত্যাশা নাই, আশা নাই ক' কিছু—অলস মনে দিন চলে যায় দিনের পিছু পিছু'—তোমার এমন একটা অনুভূতি হয় না সাকুরা-কো ?

—আদৌ না। উদ্বেগ, প্রত্যাশা, আশা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। দিনও অত্যন্ত কর্মব্যস্ত। এই ধর আমার কথা—আমি শীঘ্র একটা মহাকাশ অভিযানে যাব। হয় তো আর ফিরব না, মারা যাব। সে জন্য আমার উদ্বেগ নেই ? প্রত্যাশা নেই ? আশা নেই ?

—তুমি আমার কথাটা বুঝতে পারছ না। তোমার বাবা-মা, ভাই-বোন, স্বামী, প্রেমাস্পদ কেউ নেই। তুমি ফিরে না এলে কারও চোখে দু-ফোঁটা জলও পড়বে না। এতে তুমি মরেও শান্তি পাবে ?

—'সরি'। এখানে কেউ কাঁদতে জানে না। কাঁদতে শেখেনি। শুক্রে হাসি আছে, অশ্রু নেই।

—তবে তো তোমরা চরম দুর্ভাগা।

—সো হোয়াট ?

—সব কথাই 'সো হোয়াট' বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

মেয়েটি হেসে ফেলে। বলে, বেশ বাপু, বেশ। তাহলে আমি ফিরে না এলে তুমিই না হয় আমার জন্যে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেল। তাহলে নিশ্চয় আমি মরে শান্তি পাব।

পার্থিব গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

—কা হল ? আমার দুঃখে দু-ফোঁটা চোখের জল ফেলতে রাজী নও ?

—এমন সিরিয়াস বিষয় নিয়ে ইয়ার্কি কর না। আমি তোমার কে ?

—মরবার সময় আমাকে শান্তি দিতে না হয় তুমিই হলে আমার সাময়িক প্রেমাস্পদ।

—'প্রেম' কখনও অমন সাময়িক হয় না। হয় সে চিরন্তন, নয় সে মিথ্যা!

—তবে আমি নাচার! প্রেম করতে আমার আপত্তি নেই—কিন্তু প্রেমের বাজারে ব্যক্তিগত মালিকানার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে আমি নেই।

পার্থিব বললে, জানি। দুঃখ এই যে, আমিও তোমাকে ব্যাপারটা বোঝাতে পারছি না। কিন্তু আমাদের কথা থাক। ছবির কথা হচ্ছিল, তাই হোক। তুমি দেখেছ, ঐ ভেনাস আর্ট গ্যালারিতে হৃদয়বৃত্তির একটাও প্রকাশ নেই? ধর একটা কনসেপ্ট—'মাতৃত্ব'। সেটা তোমাদের শিল্পীদের ধারণাতেই নেই। অথচ পৃথিবীর হাজার হাজার বছরের শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে ওর উপর। তোমাদের কোন শিল্পী 'ম্যাডোনা' মূর্তি গড়তে পারবে না। এটা একটা বিরাট বঞ্চনা নয়?

সাকুরা-কো বললে, তুমি বরং প্রশ্নটা রেভারেণ্ড ফুজিসানকে জিজ্ঞাসা কর।

—কেন? তুমি জবাব দিতে পার না?

—পারি। কিন্তু জবাবটা শুনে তুমি যে রাগ করবে।

—রাগ করব? কেন?

—জবাবে আমি যে ঐ একই কথা বলব: 'সো হোয়াট'? তাতে ক্ষতি কি?

সবচেয়ে বড় আঘাতটা প্রতীক্ষা করছিল 'সয়লেণ্ট গ্রীণ' কারখানায়। পার্থিব তার ভিতরে প্রবেশ করতে পারল না। দ্বার থেকেই ফিরে এল। এতবড় বর্বর, পৈশাচিক পরিকল্পনা যে কোন সভ্য সমাজ প্রবর্তন করতে পারে এটা ওর ধারণাতেই আসছিল না।

ওরা মৃতদেহের সৎকার করে না। না দেয় কবর, না পোড়ায়

চিতায়। ওরা বুঝি হিসাব কষে দেখেছে, মৃত মানুষের দেহে কত শতাংশ ক্যালসিয়াম, কতটা নাইট্রোজেন; ফসফরাস বা জৈবিক প্রয়োজনীয় অংশ আছে। মানুষ মরে গেলে তাই ঐ কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়—ওরা বিচিত্র পদ্ধতিতে তা থেকে নানান প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্য বার করে। কারখানার ওয়ার্কস ম্যানেজারকে রীতিমত গালাগালি দিয়ে পার্থিব বলেছিল—আপনারা বর্বর! রাক্ষস! মানুষ কি মরেও শান্তি পাবে না আপনাদের কাছে?

লোকটা অবাক হয়ে বলেছিল, ডক্টর রয়! আমি আপনার কথা কিছুই বুঝতে পারছি না। মারা যাবার পর তো মানুষের কোন অনুভূতি থাকে না। তাকে চিতায় পোড়ানো হল, না ক্রিমেটোরিয়ামে দাহ করা হল, না কবর দেওয়া হল, তাতে তার কিছু যায় আসে না। সেক্ষেত্রে এতটা দামী জিনিস অহেতুক বরবাদ করার চেয়ে যদি কোন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে—

—থামুন মশাই। এটাকে বিজ্ঞানসম্মত উপায় বলবেন না! আপনারা ক্যানিবল! মানুষকে মানুষের মাংস খাওয়াচ্ছেন।

ভদ্রলোক আবার বলেন, আমি যতদূর জানি, পৃথিবীতে 'এ্যাক্টিভেটেড স্লাজ প্লান্ট' থেকে গ্লিসারিন বার করে নেওয়া হয়। তা দিয়ে যখন সাবান তৈরী হয়, তখন তো তা গায়ে মাখেন? বিষ্ঠা-প্রসূত সাবান বলে তো ঘৃণায় ছু ড়ে ফেলে দেন না!

পার্থিব উঠে দাঁড়ায়। বলে, আপনাকে বোঝাতে পারব না! বিজ্ঞানকে কোন অতলস্পর্শী খাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন আপনারা! শেষকালে নরমাংস!

কারখানা থেকে বেরিয়ে এল সাকুরা-কো বললে, আর নয়! এবার বরং ক্লাবে চল। একটু নাচ গান হৈ হুল্লোড় করা যাক।

পার্থিব জবাব দেয় না। তার সমস্ত মনটা বিষিয়ে গেছে।

নৈশ ক্লাব পৃথিবীর ঢঙেই। সেই জোড়ায় জোড়ায় ছেলে-মেয়ে।

সেই বাজনার তালে তালে ফক্সট্রট কিম্বা টুইস্টের নববিবর্তিত নাচের ধারা। সেই মদিরার পাত্র! তফাৎ এই যে, এখানে কে কখন কার সাথে জোড় বাঁধবে সেটা কোন জ্যোতিষ-সম্রাটও বলতে পারবেন না। এখানকার ক্লাবে স্বামীকে লুকিয়ে বন্ধুর স্ত্রীকে নিয়ে মাতামাতির সুযোগ নেই, পরপুরুষের সঙ্গে প্রেম করার গোপন উন্মাদনা নেই। সকলেই সকলের সহজলভ্য। দুপক্ষের সম্মতিই শেষ কথা। জোট বাঁধার, জোড়-ভাঙার। পার্থিবকে ক্লাবে পেয়ে সকলেই খুব খুশী। ওর কথা সবাই জানে, ওর ছবি সবাই দেখেছে—ও শুক্রগ্রহের একজন বিখ্যাত মানুষ। ফলে ও যখন যেখানে যায় ওকে ঘিরে জটলা বেধে যায়। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের আগ্রহটাই যেন বেশি। একাধিক যুবতী ওর হাত ধরে রীতিমত টানাটানি শুরু করে দিল। ভাষা না বুঝলেও ভাবে-ভঙ্গিতে বোঝা যায়, ঐ দীর্ঘদেহী মানুষটিকে ওরা সবাই শয্যাসঙ্গী হিসাবে পেতে চায়। এমন কাণ্ড ও পৃথিবীতেও হতে দেখেছে—তবে এতটা নির্লজ্জভাবে নয়। সুজি নামে একটি মেয়ে তো নাছোড়বান্দা হয়ে ওর কণ্ঠলগ্না হয়ে পড়ল। পার্থিব বিব্রত হয়ে সাকুরাকে বলে, মেয়েটাকে বল আমাকে ছেড়ে দিতে, নাহলে ওকে ছুঁড়ে ফেলে দেব আমি।

খিল্‌খিলিয়ে হেসে ওঠে সাকুরা-কো। বলে, কিন্তু ও তো অন্যায় কিছু দাবী করছে না তুমি ওর দাবী মিটিয়ে দিলেই পার বাপু। সুজি তো সুন্দরী!

এক ধাক্কায় মেয়েটাকে ঠেলে ফেলে ক্লাব ঘর থেকে বেরিয়ে আসে পার্থিব। কৃত্রিম অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল রৌদ্রালোকে। বলে, কী বেহায়া মেয়েটা!

সাকুরা-কো বান্ধবীর পক্ষ নিয়ে বলে, তুমি অহেতুক রাগ করছ। ও বেচারি তো তোমার মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠেনি। ওর দোষটা কোথায়?

—তোমরা সবাই একরকম!

সাকুরা-কো গাড়িতে স্টার্ট দিচ্ছিল। আড়চোখে ওকে একবার দেখে নিয়ে বললে, না, সবাই নয় পার্থিব। আমি একটি ব্যতিক্রম।

—ব্যতিক্রম। তুমি ঐ ভাবে এক এক রাত এক এক জনের সঙ্গে শোওনি?

—শুয়েছি, তবে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়।

—তার মানে ও বিষয়ে তোমার এখনও কিছুটা শালীনতা বোধ আছে।

—নেই? তুমিই বল। এই তো তোমার সঙ্গে এতদিন মিশছি, কিন্তু ওভাবে কোনদিন তোমার গলা ধরে ঝুলে পড়েছি? অথচ কতবারই তো মনে হয়েছে—এইবার বুঝি তুমি আমাকে বুকে টেনে নিয়ে চুমু খাবে!

পার্থিব স্থির হয়ে বসে থাকে। অবচেতন থেকে চেতন মনে কতকগুলো চিন্তা এতক্ষণে ভেসে ওঠার ছাড়পত্র পায়। নিজের মনটাকে হঠাৎ দর্পণের মত পরিষ্কার দেখতে পায়। আশ্চর্য! মেয়েটি বলায় খেয়াল হচ্ছে—এমন ইচ্ছা তো ওর মনেও অনেকবার জেগেছে!

—কোথায় যাবে এখন? তোমার হোটেলে?

—না। তোমার ঘরে চল। দেখে আসি তোমার আস্তানা।

—রাতটা সেখানে কাটাতে চাইবে না তো?

'রাত' বলতে সুনির্দিষ্ট আটঘণ্টাব্যাপী সময়। আকাশে তখন সূর্য থাকে। হয়তো মধ্য গগনেই। সবাই ঘুমিয়ে নেয় ঘর অন্ধকার করে—যাদের নাইট ডিউটি না থাকে।

পার্থিব বললে, থাকতে চাইলেই বা কি? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে—

—কিন্তু ইচ্ছা-অনিচ্ছার কথাটা কি আমিই জানি ছাই?

—তবে থাক। আমাকে হোটেলেই পৌঁছে দাও।

খিল্‌খিলিয়ে আবার হেসে ওঠে সাকুরা-কো।

রেভারেণ্ড ফুজিসান্ বললেন, দেখ পার্থিব, কোন ভাল জিনিসেরও একটা ছোট অংশ খারাপ হতে পারে, আবার কোন খারাপ জিনিসেরও কোন ক্ষুদ্র অংশ ভাল থাকতে পারে। ফলে কোন সামাজিক ব্যবস্থাকে গ্রহণ বা বর্জন করতে হলে কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হতে হবেই। দেখতে হবে, আমরা মোদ্দা জিতলাম, না হারলাম। তুমি যে কথা বলছিলে—পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা, নরনারীর বিবাহ, তারও নিশ্চয় কিছু ভাল দিক ছিল। স্নেহ, প্রেম, মমতা এগুলি হৃদয়-বৃত্তির প্রসার ঘটিয়েছিল। কিন্তু সেগুলোকে ত্যাগ করে আমরা বোধহয় মোদ্দা লাভবানই হয়েছি।

—কি করে বুঝলেন?

—সংখ্যাতত্ত্ব থেকে। শুক্রগ্রহে অপরাধ একটা দুর্লভ ঘটনা। দেওয়ানি মামলার প্রশ্নই ওঠে না, ফৌজদারি মামলাও খুব কম। কেন এমনটা হয়েছে? মূল প্রশ্নটায় এস। মানুষ অপরাধ করে কেন? এক কথায় জবাব—স্বার্থপরতার জন্য। আমিত্ব থেকে। স্বার্থটা অনেক জাতের—ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সমাজগত, ধর্মগত, রাষ্ট্রগত। লোকে চুরি করে, পরস্বাপহরণ করে, অন্যায় করে—কেন? পরিবার গত স্বার্থে। যাতে তোমার ছেলের চেয়ে আমার ছেলে বেশি ভাল খেয়ে-পরে থাকতে পারে, তোমার চেয়ে আমার বউ ভাল শাড়ি-গহনা পরতে পায়। এখানে পরিবার না থাকায় সেসব প্রেরণাই নেই। ব্যক্তিগত স্বার্থ অবশ্য এখানেও আছে, কিন্তু জীবন-যাত্রার মান এখানেও এত উন্নত যে, সেজন্য মানুষ অপরাধ করে না। এ-ছাড়া অপরাধ-বিজ্ঞানীরা বলছেন, অপরাধের একটা সিংহভাগ দখল করে আছে যৌন ক্ষুধা। শুক্রগ্রহে মানুষের মনে সেজন্য তাপ সঞ্চারিত হয় না, 'সেফ্‌টি ভাল্‌ভ'-এর ব্যবস্থা আছে। ফলে খুন, জখম, নারীহরণ, বলাৎকার এখানে নেই। তুমি তোমার সংস্কার-বশে এটাকে বর্বর ব্যবস্থা বলতে পার; কিন্তু আমরা এভাবে মানুষের জীবনকে সমস্যামুক্ত করে ফেলেছি। এখানে ভোগ আছে, দুর্ভোগ

নেই; হাসি আছে, অশ্রু নেই; আনন্দ আছে, প্রিয়-বিয়োগের বেদনা নেই। এটাকেই তুমি বাঞ্ছনীয় মনে কর না?

পার্থিব দেওয়ালের ঐ প্রকাণ্ড ফ্রেস্কোটা দেখিয়ে বললে, রেভারেণ্ড, শিল্পী হকুসাই যদি ঐ চিত্রটিতে আর সব কিছু এঁকে শুধুমাত্র ঢেউ-গুলোকে না আঁকতেন, তাহলে ছবিটা উৎরাতো?

রেভারেণ্ড বললেন, জীবন তো শিল্পকর্ম নয়?

—ঐখানেই আমার আপত্তি। আমার মতে জীবনও একটি শিল্পকর্ম। প্রতিটি মানুষ তার জীবনের শিল্পী। হোকুসাইয়ের ঢেউগুলোই ঐ চিত্রের প্রাণ। অশ্রু এবং প্রিয়-বিয়োগ বেদনার ভূমিকা জীবনে অনস্বীকার্য; তার উত্তরণেই জীবনের সার্থকতা। জীবনে সমস্যা না থাকাটাও আমার মতে একটা সমস্যা। সমস্যা থাকবে, তাকে ডিঙিয়ে যাবার জন্য নৌকা বাইতেই আমরা নেমেছি এ জীবনসমুদ্রে। নয় কি?

বৃদ্ধ নিমীলিত-নেত্রে কী ভাবতে থাকেন।

পার্থিব সরাসরি প্রশ্ন করে, আপনি নাস্তিক?

—না। ঈশ্বরের বিষয়ে আমার ধারণাটা অন্যরকম। কেন?

—কী ধারণা আপনার?···জানি, এক কথায় তার জবাব হয় না। তবু কোন ধর্মমতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য আছে?

—আমি স্পিনোজার ঈশ্বরকে মানি, ঈশ্বরের যে সংজ্ঞা প্রফেসর আলবার্ট আইনস্টাইন দিয়েছিলেন—অর্থাৎ এই বিশ্বপ্রপঞ্চের যে মূলীভূত নিয়মশৃঙ্খলা তার মননকেই আমি উপসনা বলে মনে করি।

—বেশ, এবারে বলুন, মানব-সভ্যতা—যা নাকি পৃথিবী থেকে চন্দ্রে, মঙ্গলে, শুক্রে বা বুধে ছড়িয়ে পড়েছে, তা যদি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে আপনার সেই ঈশ্বরের কি কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে?

—নিশ্চয় না।

—তাহলে সেই চেষ্টাই বা করছেন না কেন? ভেবে দেখুন, তাতে অতি সহজেই সব মানবিক সমস্যার সমাধান হবে। বিবাহিত

জীবনকে নির্মূল করে আপনারা যাবতীয় দাম্পত্য সমস্যাকে যদি তাড়াতে পেরে থাকেন, এবং তাতে খুশি হন—তাহলে কিছু থার্মোনিউক্লিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র দিয়ে মানব সভ্যতাকে একেবারে নির্মূল করে দিন না? কোন রকম সমস্যাই তাহলে থাকবে না। আর সমস্যা দূরীকরণই তো আপনাদের চরম লক্ষ্য?

বৃদ্ধ বললেন, তোমার কথাটা ভাববার!

দুজনেই কিছুক্ষণ নীরবে নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন থাকেন। শেষে পার্থিব পুনরায় বলে, আমি স্বীকার করতে বাধ্য—একজন শুক্রবাসী একজন পৃথিবীবাসীর চেয়ে সুখী। অনেক দুঃখ, দুর্দশা, দুর্ভাবনার হাত থেকে আপনারা মানুষকে মুক্ত করেছেন। পৃথিবী তা পারেনি। কিন্তু দামটাও এরা বড় কম দেয়নি। এ সমাজ ব্যবস্থায় নিউটন, এডিসন বা আইনস্টাইন জন্মাতে পারেন, কিন্তু বিটোফেন, দা-ভিঞ্চি, মিকেলাঞ্জেলা, রবীন্দ্রনাথ এখানে কোনদিন জন্ম গ্রহণ করবেন না। ধরুন একটা কনসেপ্ট—'মাতৃত্ব'। তাকে আপনারা বিসর্জন দিয়েছেন। আপনি এখনই বলছিলেন, সব ভাল জিনিসেরও একটা খারাপ অংশ থাকতে পারে। 'মাতৃত্বে'র মত পূত পবিত্র জিনিসের কোন খারাপ অংশের বাস্তব উদাহরণ আপনি আমাকে দেখাতে পারেন?

—পারি। তোমার জীবন থেকেই।

—আমার জীবন থেকে! দেখান!

—তুমি এখানে কেন এসেছ তা তুমি জান। শুক্রবাসীরা তোমাকে অপহরণ করে এনেছে। কেন? তুমি তাদের ল্যাবরেটারির গিনিপিগ। অসীম যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুতে তোমাকে শেষ করার জন্য তোমাকে আনা হয়েছিল। এই জন্য শুক্রের উপর তোমার ঘৃণা! সেটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তুমি কি জান, এই অপরাধের পিছনে ছিল পৃথিবীরও সম্মতি?

—না, জানি না।

—আমার পক্ষে জানানো শোভন নয়। ভবিষ্যতে একদিন হয়তো জানতে পারবে—এ অপরাধের পিছনেও আছে অন্ধ মাতৃস্নেহ! স্বার্থপরতা!—ব্যক্তিগত, পরিবারগত, জাতিগত এবং রাষ্ট্রগত!

পার্থিব বললে, যা জানি না, তা নিয়ে আলোচনা করি কেমন করে। তবু আমি বলব—পরিবারগত, জাতিগত এবং রাষ্ট্রগত কারণে পৃথিবীর মানুষ যুগে যুগে স্বার্থত্যাগও করেছে। আপনাদের এই ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজে তা করেছে? এখানে কেউ 'শহীদ' হয়? হয়েছে? হয়নি! কারণ আপনাদের এ সভ্যতায় যেমন স্বার্থপরতা নেই, তেমনি স্বার্থত্যাগও নেই! এখানে 'শহীদ' শব্দটা তাই অর্থহীন!

সাকুরা-কোর ঘরটি ছোট। দু-কামরার সংসার। একা থাকে। তালা খুলে ঢুকতে হল না। দরজা তালাবদ্ধ ছিল না। প্রবেশদ্বারের পরেই যে ঘরটা—সেটা ড্রইং-কাম-ডাইনিং রুম। দেওয়াল-সংলগ্ন কিচেনেট। পাশেই শয়ন কক্ষ। শয্যা দেখা যায়। দ্বৈতশয্যা। পার্থিব এতদিন পর আজ প্রথম ওর ঘরে এল। নিজে থেকেই প্রস্তাব করে ওর অতিথি হল। ওকে ড্রইংরুমে বসিয়ে সাকুরা-কো ফ্রিজটা খুলতে খুলতে বললে, কী খাবে? কড়া কিছু চলবে?

—চলুক। হুইস্কিই বার কর।

—কিছু শুকনা খাবার, হুইস্কির বোতল আর পানপাত্র দুটি টেবিলে রেখে মেয়েটি বললে, আজ সারাদিন বড় ধকল গেছে। ঘামে সারা শরীর ভিজে গেছে। তুমি স্নান করবে?

পানপাত্রটা টেনে নিয়ে পার্থিব শুধু বললে, না।

—তাহলে আমি বরং একটু স্নান করে আসি। তুমি ততক্ষণ টি. ভি. শুনতে পার। পৃথিবীকে ধরব?

—না থাক। আচ্ছা শোন, তোমরা তো পৃথিবীর কোন সমাজ-

ব্যবস্থাই মান না। তাহলে জামা-কাপড় পর কেন? হাত-পা-নাক-মুখ যদি প্রকাশ্য করা যায় তাহলে দেহের বিশেষ-বিশেষ অঙ্গকে এভাবে ঢেকে রাখ কেন?

সাকুরা-কো বললে, কখনও ভেবে দেখিনি। তবে তোমার ধারণাটা একেবারে নির্ভুল নয়। এখন গ্রীষ্মকাল বলে তুমি এমনটা দেখছ রাত্রে, মানে শীতকালেও তাই দেখবে। সকাল ও সন্ধ্যা ঋতুতে অনেকেই জামা কাপড় খুলে, নগ্ন হয়; তখন এটা ন্যুডিস্ট কলোনীর রূপ নেয়।

শুক্রগ্রহে ঋতুর চক্রাবর্তন বৎসরের হিসাবে নয়, দিনের হিসাবে। সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয় হচ্ছে চারমাস। তাতে চারটি ঋতু—এক এক মাসের। সূর্যোদয়ের দিন পনের আগে থেকে পনের দিন পর পর্যন্ত সকাল ঋতু। তখন না খুব গরম, না খুব ঠাণ্ডা। তার পর এক মাসের দিবাঋতুতে উত্তাপ খুব বেশী। আবার সূর্যোস্তের পনের দিন পরে পর্যন্ত বিকালঋতুও নাতিশীতোষ্ণ। পরের একমাস রাত্রি-ঋতুতে জবর শীত।

মেয়েটি তাই বললে, লোকে এখানে পোষাক পরে শীতাতপ থেকে আত্মরক্ষার্থে, শালীনতা-বোধে নয়। ঐ নাতিশীতোষ্ণ ঋতুতে তাই অনেকেই নগ্ন হয়।

—অনেকেই কেন? কেন সবাই নয়?

—এটা ব্যক্তিগত রুচির ব্যাপার।

একটু ইতস্তত করে পার্থিব বলে, তুমি কি কর?

সাকুরা মুচকি হেসে বলে, দিন পনের সবুর কর, তার পরেই দেখতে পাবে যা, দেখতে চাইছ।

—আমি আবার কি দেখতে চাইছি?—রুখে ওঠে পার্থিব।

—কী আশ্চর্য! আমি তখন কী পরি তাই তো জানতে চাইছ তুমি। না কি?

পার্থিব গোঁজ হয়ে বসে থাকে।

—কী ভাবছ বল তো ?—সাকুরা জানতে চায়।

—দ্বিতীয় কথা—তোমরা সবই যখন বিসর্জন দিলে তখন যৌন-জীবন লোকচক্ষুর অন্তরালে যাপন কর কেন ?

—এসব প্রশ্ন বরং রেভারে গুফুজিসানকে জিজ্ঞাসা কর। আমি তো সমাজ-বিজ্ঞানী নই। তবে আবার মনে হয় তার তুটি হেতু। প্রথমতঃ এটা পার্থিব সংস্কারের কৈঙ্কর্য ! মাত্র পঞ্চাশ বছরে অভ্যাসটা আমরা ত্যাগ করতে পারিনি। দ্বিতীয়তঃ ওটা সমাজ-বিজ্ঞানীরা বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন—না হলে জিনিসটার থ্রিল অনেকটাই নষ্ট হয়ে যায়।

লাফিয়ে ওঠে পার্থিব রায়—দেয়ার য়ু আর ! প্রকারান্তরে স্বীকার করলে তুমি। ওটাই আমার থিয়োরির প্রথম ধাপ ! দ্বিতীয় ধাপটাও তোমাকে ক্রমশঃ মানতে হবে—ঐ ঐকান্তিক একনিষ্ঠ প্রেম। বাধাবন্ধহীন যৌনাচার নয় ! তোমাকে যদি আমি পেতে চাই, তবে একনিষ্ঠভাবেই পেতে চাই ! স্ত্রী-রূপে পেতে চাই !

—আমাকে…তুমি…কী বলছ ?

—না, না। আমি কথার কথা বলছি। মানে, কেউ যদি কাউকে পেতে চায়…

সাকুরা-কো ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। হেসে বললে, কী বিশ্রি ভুল দেখ ! আমি ভেবেছিলাম, তুমি বুঝি সত্যিই আমাকে বলছ—

মুহূর্তের ভুল। পার্থিব ঘুরে বসল। অনেকটা হুইস্কিও ইতিমধ্যে পেটে গেছে। ওর হাতটা ধরে বলল, না ! ভুল নয়। তোমাকেও আমি এ কথাই বলছি সাকুরা-কো ! আমি…আমি তোমাকে পেতে চাই ! একান্তভাবে পেতে চাই ! আমি তোমাকে ভালবাসি !

সাকুরা-কো হাসল। বিজয়িনীর হাসি। বললে এতদিনে কথাটা তাহলে বলতে পারলে !

—কিন্তু কই, তুমি তো কিছু বললে না ?

সাকুরা ধীরে ধীরে হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। বলে, একটু অপেক্ষা কর। স্নানটা সেরে আসি।

স্নানের ঘরের দিকে ও চলে যায়।

পার্থিবের স্নায়ু-তন্ত্রীতে তখন আগুন ধরে গেছে। ভুল করল কি? না, ভুল নয়। এই গ্রহান্তরবাসিনী মেয়েটিকে কখন নিজের অজ্ঞাতে সে ভালবেসে ফেলেছে। এ গ্রহের অনেক কিছুই তার পছন্দ হচ্ছে না, ভাল লাগছে না—কিন্তু এ প্রগল্‌ভা মেয়েটির প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণ সে প্রতিনিয়ত বোধ করেছে। ওর ত্রিশ বছরের জীবনে এমনটি আগে কখনও ঘটেনি। কিন্তু হঠাৎ এ উচ্ছ্বাসের কোন অর্থ হয়? পৃথিবীতে পার্থিব আদৌ ফিরে যেতে পারবে কিনা জানে না। যদিও যায়, এরা নিশ্চয় এক শুক্রবাসিনীকে ওর বধূ হিসাবে নিয়ে যেতে দেবে না। তাছাড়া সাকুরাও হয়তো যেতে চাইবে না। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই নয়। সে তো বারে বারে বলেছে, বিবাহ-বন্ধনকে সে বাতুলতা বলে মনে করে। প্রেমের সেটা নাকি ব্যক্তিগত মালিকানা! তবে কি সাকুরা ওকে সাময়িক যৌনক্ষুধার রসদ হিসাবেই পেতে চায়? এক রাত্রের আদিম উচ্ছৃঙ্খলতাতেই যার অবসান! পার্থিব ওর বাড়িতে আজ নিভৃত সাক্ষাতে দেখা করতে এসেছে বলেই কি মেয়েটি ওকে এভাবে ফাঁদে ফেলতে চায়?

হঠাৎ ও ঘর থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর: তোয়ালেটা টেবিলে ফেলে এসেছি। দিয়ে যাবে?

ঘাড় ঘুরিয়ে পার্থিব দেখতে পায় বাথ্‌রুমের দরজাটা একটু ফাঁক করে মুখটুকু বার করে আছে মেয়েটি। ওর মাথায় চুল খুব ছোট করে ছাঁটা—ভিজে চুলের প্রশ্ন নেই, কিন্তু গাল বেয়ে নেমেছে জলের ধারা। পার্থিব উঠে দাঁড়ায়। টেবিল থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে এগিয়ে যেতেই পাল্লাটা পুরো খুলে যায়। একটা শিহরণ বহে যায় ওর সর্বদেহে। স্থানুর মত দাঁড়িয়ে থাকে। সাকুরা-কোই এগিয়ে আসে। হঠাৎ দু-বাহু বাড়িয়ে আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ করে ওকে।

দীর্ঘদেহী পার্থিবের কণ্ঠলগ্না হতে পারে না, বুকের উপর মাথা রেখে বলে, এতদিন পালিয়ে বেড়াচ্ছিলে কেন বলত? আমি কোনদিন তোমার বউ হব না বলে?

সুজির সঙ্গে সাকুরার আর কোন পার্থক্য রইল না!

সাকুরার ভাগ্যেও ঘটল সুজির লাঞ্ছনার পুনরাবৃত্তি! ভূলুণ্ঠিতা মেয়েটি যখন উঠে দাঁড়ালো পার্থিব তখন লিফ্‌টের জন্য অপেক্ষা না করে হনহনিয়ে নিচে নামছে!

আন্‌লিস্টেট টেলিফোনটা ঝন্‌ ঝন্‌ করে বেজে উঠ্‌তেই শুক্র মহাকাশচারণ সংস্থার সর্বাধিনায়ক সেটা তুলে নিয়ে আত্মঘোষণা করলেন: ব্রিগেডিয়ার ইয়ামামোতো।

—জেনারেল কাওয়াবাতা বলছি। শোন, একটা জরুরী 'মেসেজ আছে।

—বলুন স্যার!

—ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তোমার ওখানে একটি ছোকরা যাবে—কাগজে তার ছবি দেখে থাকবে নিশ্চয়, সেই ভারতীয় ছোকরা—ডক্টর পার্থিব রায়। আইডেন্টিটি কার্ড নং E/371964। সে আমাদের 'অপারেশন নিউ-এজ'-এর বিষয়ে জানতে চায়। তাকে সব কিছু ঘুরিয়ে দেখাতে হবে।

ব্রিগেডিয়ার স্তম্ভিত হয়ে যান। লোকটা বিগ্রহী, পৃথিবীর মানুষ। 'অপারেশন নিউ-এজ'-এর যাবতীয় তথ্য শুক্রবাসীর কাছ থেকেও গোপন রাখা হচ্ছে, আর ও ছোকরা কোথাকার কে একজন ভারতীয়—

—শোন, ডক্টর রায় জাপানী-ভাষা জানে না। তোমার একজন দোভাষীর প্রয়োজন হবে। তুমি সাকুরা-কোকে দোভাষী হিসাবে নিযুক্ত কর।

ব্রিগেডিয়ার বলেন, দোভাষী কোন সমস্যা নয়, দোভাষী আরও

আছে, আমি ভাবছিলাম—

—তুমি বরং চিন্তা ভাবনাগুলো আমার জন্য সরিয়ে রাখ; কারণ সমস্যাটা তোমার নয়, সেটা আমার। আমি চাই, সাকুরাকেই দোভাষী হিসাবে নিযুক্ত করা হ'ক। আর কোন প্রশ্ন ?

—না, মানে—ও ছোকরা যদি ভাইটাল স্ট্যাটিস্‌টিক্সগুলোও জানতে চায়—

—খুব সম্ভব চাইবে না। কারণ ও গণিতজ্ঞ, পদার্থবিদ বা জ্যোতির্বিজ্ঞানী নয়। ও হচ্ছে জীববিজ্ঞানী এবং নৃতত্ত্ববিদ। ফলে ওসব ফর্মুলা ও জানতেই চাইবে না, বুঝতেও পারবে না।

—যদি 'অপারেশন নিউ-এজ'-এর শেষ লক্ষ্যস্থল সেই নক্ষত্রের নামটা জানতে চায় ?

—জানাবে! নিজে থেকে উপর-পড়া হয়ে জানিও না, জানতে চাইলে সত্য কথা বলায় কোনও বাধা নেই। আর কোনও প্রশ্ন ?

—আমি স্যার, শুধু ভাবছিলাম—মানে, ইয়ে—কি ভাবে বলব ? —তাছাড়া ধরুন···

—বুঝলাম। দুটো কথা তোমাকে বলে রাখি। প্রথম কথা—আমি টেলিফোনে তোমাকে যে নির্দেশ দিচ্ছি তার লিখিত অর্ডার নিয়ে বিশেষ সংবাদবহ তোমার অফিসে রওনা হয়ে গেছে। এটা তোমার 'মানে, ইয়ে, কিভাবে বলব' প্রশ্নটার জবাব। তোমার ঐ দ্বিতীয় অসমাপ্ত প্রশ্ন 'তাছাড়া ধরুন'-এর জবাবে জানাচ্ছি—ঐ ছোকরা জীবদ্দশায় পৃথিবীতে কোনদিন ফিরতে পারবে না। পৃথিবীর সঙ্গে যাতে কোন বেতার সংযোগ না করতে পারে তাই তাকে সর্বক্ষণ নজরবন্দী করে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আর কোনও আমতা-আমতা আছে ব্রিগেডিয়ার ?

ব্রিগেডিয়ার ইয়ামামোতো গম্ভীরভাবে বললেন, না স্যার!

সশব্দে রিসিভারে টেলিফোনটা নামিয়ে রাখেন। মনে মনে

ভাবেন, পঞ্চাশ বছরেও ওঁরা পার্থিব চালচলন বদলাতে পারেন নি। তিনি একজন ব্রিগেডিয়ার। মহাকাশচারণ সংস্থার সর্বাধিনায়ক—কিন্তু জেনারেল যে ভাষায় কথা বললেন, তা যেন ইস্কুল মাষ্টার ছাত্রকে ধমকাচ্ছে। যেন দেড়শ বছর আগেকার জাপানী জেনারেল টোকিও থেকে বর্মা ফ্রন্টের ব্রিগেডিয়ারকে ঝাড়ছেন!

পর মুহূর্তেই দ্বিতীয় টেলিফোনটা তুলে নিয়ে অপারেটারকে বললেন, সাকুরা-কো!

অপারেটার বললে, তিনি তো ডিউটিতে নেই স্যার!

—জানি। তার বাড়িতে ধর।

—বাড়িতে? কিন্তু আমি ভাবছিলাম···

—ভাবনা চিন্তাগুলো আমার জন্য সরিয়ে রাখ, কারণ সমস্যাটা তোমার নয়, আমার। তুমি সাকুরা-কোকে তার বাড় ধর।

—আজ্ঞে আচ্ছা! এক্ষণি ধরছি!

খণ্ডমুহূর্ত পরেই রিভিং টোন। তার পরেই: মোশে-মোশে। (নমস্কার!) সাকুরাকো বলছি!

—ব্রিগেডিয়ার ইয়ামামোতো বলছি। শোন, একটা জরুরী 'মেসেজ' আসে।

—বলুন স্যার!

—তুমি এক্ষনি আমার অফিসে চলে এস। গাড়ি আছে, না পাঠাব?

—গাড়ি আছে। এক্ষণি যাচ্ছি, কোন জরুরী দুর্ঘটনা?

—তা বলতে পার। এই মাত্র খবর পেলাম—সেই তালঢ্যাঙা লম্বা পৃথিবীর লোকটা, যাকে নিয়ে তোমরা খুব মাতামাতি করছ, সে ছোকরা এখানে আসছে। তাকে আমাদের মহাকাশ-চারণ সংস্থা ঘুরিয়ে দেখাতে হবে। তোমাকে দো-ভাষী হিসাবে আমরা চাই। বুঝলে?···কি হল? তুমি লাইনে আছ তো?

—আছি। শুনুন স্যার! আমার পক্ষে তো এখন অফিসে

যাওয়া সম্ভবপর নয়। আপনার তো অনেকগুলি দো-ভাষী আছে—তাদের কাউকে বরং ডেকে নিন।

—সে কি! এই যে বললে, তুমি এখনই আসছ?

—তখনও জানতাম না, আপনি কী জন্য ডাকছেন। আমি মানে, ইয়ে, কি-ভাবে বলব?…তাছাড়া ধরুন…

ব্রিগেডিয়ার ভারিক্কিচালে বলেন, বুঝলাম! দুটো কথা তোমাকে বলে রাখি। প্রথম কথা—স্বয়ং জেনারেল কাওয়াবাতা আমাকে আদেশ করেছেন—তোমাকে দো-ভাষী হিসাবে নিযুক্ত করতে। এটা তোমার ঐ 'মানে, ইয়ে, কিভাবে বলব' প্রশ্নটার জবাব। আর তোমার ঐ অসমাপ্ত প্রশ্ন 'তাছাড়া ধরুন'-এর জবাব জানাচ্ছি—'বস' এর নির্দেশ অমান্য করায় কি জাতীয় ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, তা লেখা আছে 'কণ্ডাক্ট রুলস্ ৪৩৭'-এ। এ ছাড়া আর কোনও আমতা আমতা আছে!

ওপাশ থেকে আর আমতা-আমতা নয়—ভেসে এল সাকুরা-কোর দৃঢ় কণ্ঠস্বর—শুনুন স্যার। আমি আমার কর্তব্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন। আমি আপনাদের দো-ভাষী নই, এতদিন স্বেচ্ছায় আপনাদের সাহায্য করছিলাম। দ্বিতীয়ত, আমি এখন 'অফ-ডিউটি।' আমি যাব না। আপনি যা ইচ্ছে করতে পারেন।

লাইন কেটে দিল মেয়েটি। ব্রিগেডিয়ার ইয়ামামোতোর মনে হল—পঞ্চাশ বছরে শুক্রের জাপানী মেয়েগুলো আমূল বদলে গেছে। পৃথিবীতে জাপানী মেয়েরা জাপানী পুতুলের মতই নরম, তুলতুলে। আর এই খাণ্ডারণী 'বস'-এর সঙ্গে তার যে ভাষায় কথা বলল তা যেন ইস্কুলের ছাত্রকে মাস্টারনীর ধমক!

টেলিফোনটা নামিয়ে রেখে সাকুরা-কো উঠে দাঁড়ায়। ঘরময় পায়চারি করে। পার্থিব ওকে ধাক্কা মেরে চলে যাবার পর অনেক, অনেকটা সময় অতিবাহিত হয়েছে। মধ্যগগন থেকে সূর্য প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পূর্বদিগন্তের দিকে ঢলে পড়েছেন। তখন ছিল

সূর্যের হিসাবে দুপুর, এখন তিনটে বেজে গেছে। অর্থাৎ পৃথিবী হলে বলা যেত—দু-সপ্তাহ কেটে গেছে ইতিমধ্যে। এই পনের দিনের ভিতর পার্থিবের সঙ্গে ওর দেখা হয়নি। সেও দেখা করতে যাইনি ওর হোটেলে, পার্থিবও ফোন করেনি। এই পনের দিনে অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে মেয়েটির। প্রথমে হয়েছিল তীব্র ক্রোধ—মানুষ খুন করতে ইচ্ছা করছিল তখন। তারপর নানান জাতের অনুভূতি। এখন একটা অবসাদে সে আচ্ছন্ন।

কেন এমন হয়? ওর বন্ধু-বন্ধবীরা এসে ডাকাডাকি করে, টানাটানি করে। ও কোথাও যায় না। না সিনেমা, না ক্লাব, না নাচ-গান পিক্‌নিকে। একাধিক পুরুষ বন্ধু ছিল ওর। তারা বারে বারে ওকে ডেকে সাড়া না পেয়ে অন্য সঙ্গিনী খুঁজে নিয়েছে। এতদিন এটা খুবই স্বাভাবিক মনে হত; কিন্তু আজ কি জানি কেন এটা আর বরদাস্ত হচ্ছে না। মনে হচ্ছে—ওরা কী? কুকুর-বেড়ালেরও অধম!

তার মানে ও কি—না-না-না! তা কেন হবে? পার্থিবের ঐ ধারণাটা একটা অন্ধ কু-সংস্কারের প্রতিক্রিয়া। 'ক্যাপিটালিস্টিক আউটলুক অন লাভ্‌'! প্রেমের বাজারে ব্যক্তিগত মালিকানা—পুঁজিপতির মনোভাব! তুমি আমার বউ—তাই পরপুরুষের সঙ্গে কথা বলবে না, চুমু খাবে না, এক বিছানায় শোবে না! পৃথিবীর এক এক সমাজে এক এক ব্যবস্থা। কোথাও—কথা বলা চলবে চুমু খাওয়া চলবে না; কোথাও চুমু-খাওয়া চলবে, এক বিছানায় শোয়া চলবে না। কোথাও আইন-কানুন অত্যন্ত কঠিন—দাসত্বের প্রতীক-চিহ্ন আঁকতে হবে সিঁথিতে, পর-পুরুষের সামনে বোরখা পরে থাকতে হবে; কোথাও বা আইন অপেক্ষাকৃত শিথিল—পরপুরুষের সঙ্গে এক বিছানায় শুতে পার; তবে হ্যাঁ, ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়ে যায়। সব কিছু ব্যবস্থাপনার মূলেই কিন্তু ঐ একই মনোভাব—প্রেমের বাজারে ব্যক্তিগত মালিকানা! এ অদ্ভুত

অপ্রাকৃত আইন সাকুরা-কো কিছুতেই বরদাস্ত করবে না।

কিন্তু! আজ যদি ও খবর পায় সেই তালঢ্যাঙা ছেলেটা ওর কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সেই সুজির কাছে ফিরে গেছে—তাহলে ও সহ্য করতে পারবে না! কিছুতেই না! জানতে পারলে ও খুন করে ফেলবে সুজিকে। কিম্বা সেই ছেলেটাকে! কেন? এমন অদ্ভুত চিন্তা কেন জাগছে ওর মাথায়? সুজির সঙ্গে বিষয়টা আলোচনা করে দেখেছে। সুজি ওর কথার মাথামুণ্ডু বুঝতেই পারেনি। বলেছিল, তাতে কি হল? আমিও তো সেই তালগাছের মত লম্বা ছেলেটার জন্যে ক্ষেপে উঠেছিলাম। টোপ ঠুকরে মাছটা ফসকে যেতে আর একটা মাছ গেঁথে তুললাম। মাছের অভাব কি? কিলবিল করছে! কোনো, নোনো, আরাই, ইয়াসাকি সবাই তো তোর পিছনে ছোঁক ছোঁক করছে।

সাকুরা বুঝতে পারে—এ এমন একটা বিষয়, যার পরিমাপ ওবা ওদের জ্ঞানবুদ্ধি মতে করতে পারবে না। ওরা সবাই আজন্ম সংস্কারে আষ্ঠেপৃষ্ঠে আবদ্ধ। শুক্রগ্রহের কোন মনস্তাত্ত্বিকও ওকে কোন পরামর্শ দিতে পারবে না। তাদের শাস্ত্র অন্য মন্ত্রে গড়ে উঠেছে। ওর পরিচিত দুনিয়ায় সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা করবার ক্ষমতা রাখেন শুধু একজনই। অগত্যা তাঁর সেই একান্ত চৈত্য-বিহারের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে পড়ে।

সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে মহাস্থবির বললেন, বুঝতে পারছি না সাকুরা-কো, এতদিন ধরে আমরাই ভুল করে চলেছি, না পৃথিবী ভুল করছে।

সাকুরা-কো বললে, রেভারেণ্ড, এতদিন ধরে আমরা কোন ভুল করিনি। তবে ভুল করেছেন আপনারা—অতি সম্প্রতি—ঐ বেজাতের ছেলেটিকে এখানে ঢুকতে দিয়ে! সাজানো ফুলের বাগানও তছনছ হয়ে যায়, যদি বেড়া ভেঙে কোন ষাঁড় ঢুকে পড়ে সেখানে!

বৃদ্ধ মাথা নেড়ে বলেছিলেন, না মা, না। যে সমাজ-ব্যবস্থাকে বাইরের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে এভাবে বাঁচাতে হয় তা কখনও

সুস্থ সজীব নয়। সেটা কৃত্রিম। তুমি যে তুলনা দিলে তা থেকেই বলি—বেড়া দেওয়া ফুলবাগানটি যত সুবিন্যস্তই হক সেটা কৃত্রিম, অস্বাভাবিক। জাপানের 'নিক্কো' বাগান মনে আছে?…ও হো! তুমি তো তা দেখই নি। টোকিও-র অদূরে একটা প্রাকৃতিক উদ্যান। হ্রদ, পাহাড়, ঝরণা, সাঁকো, আর নানান জাতের গাছ! ফুল আর ফুল আর ফুল। আমি যখন টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম—প্রায় একশ বছর আগে, তখন ছুটি পেলেই আমরা 'নিক্কোর' দিকে ছুটতাম। জাপানে একটা প্রবাদ আছে—'নিক্কো-এ কেক্কো।' কেক্‌কো মানে তুমি জানো—'অপূর্ব, ম্যাগনিফিসাণ্ট!' আমরা বিদেশীদের বলতাম—'নিক্কো এ কেক্কো' অর্থাৎ জাপানের যান্ত্রিক বিস্ময় দেখে—হিকারী-কাইকান এক্সপ্রেস দেখে, টোকিও টাওয়ার দেখে, তোশিবা কারখানা দেখে যেন ঐ 'কেক্‌কো' শব্দটা উচ্চারণ কর না! ঐ বিস্ময়সূচক শব্দটা সঞ্চয় করে রাখ 'নিক্কো' বাগানের জন্য। কারণ সেই প্রাকৃতিক অরণ্যকে দেখে তোমাকে প্রাণ খুলে বলতে হবে 'কেক্‌কো'—ম্যাগনিফিসাণ্ট! তা সেই নিক্কো বাগান কিন্তু বেড়া-দেওয়া নয়। সেখানে তৃণভোজী মৃগের দল সচ্ছন্দচরণে ঘুরে বেড়াতো—তাতে আরণ্যক সৌন্দর্যের অকৃত্রিম সুষমা একতিলও নষ্ট হত না! আমরা যদি অকৃত্রিম ত্রুটিহীন হতাম তাহলে ঐ পৃথিবীর বিগ্রহী ছেলেটি এভাবে আমাদের মনে ভাঙন ধরাতে পারত না। বরং ওকেই আমরা স্বদলে আনতে পারতাম। আচ্ছা, তুমি কি ওকে…মানে, তোমার কি এখন মনে হচ্ছে একনিষ্ঠ প্রেমের বন্ধনটাই বরণীয়? বিবাহ প্রথা—

বাধা দিয়ে মেয়েটি বলে, না রেভারেণ্ড! আমি ওকে বিবাহ করতে স্বীকৃত নই। জানি, শুক্রগ্রহে বিবাহ-ব্যবস্থা নেই, কিন্তু আপনারা যদি ওকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠান, আমি ওর কুলবধূ হয়ে সঙ্গে যেতে রাজী নই!

—তাই তো! তুমি বড় ভাবনায় ফেললে!

সাকুরা-কো বলে, রেভারেণ্ড, আপনি ওকে কেন 'অপারেশন নিউ-এজ' সম্বন্ধে অবহিত করতে চান? এইমাত্র শুনলাম, ওকে আমাদের গোপনতম কারখানা দেখানো হচ্ছে।

বৃদ্ধ বলেন, আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে এসেছি মা। জেনারেল কাওয়াবাতা চান না—ও কোনদিন পৃথিবীতে ফিরে যায়। তাই ওকে ঐ অভিযানে পাঠানো হচ্ছে। নক্ষত্রান্তরের সেই নূতন গ্রহে জীব থাকতে পারে, আমাদের টীমে একজন জীববিজ্ঞানী থাকা দরকার। ওর চেয়ে অভিজ্ঞ কোন শুক্রবাসী জীববিজ্ঞানীর সন্ধান আমরা নিশ্চয় পেতাম, কিন্তু ওর বয়স কম। এবং ওকে সরানোটা খুব জরুরী দরকার হয়ে পড়েছে। এছাড়া কাওয়াবাতা মনে করেন—ওকে দলভুক্ত করলে পৃথিবীর সঙ্গে সৌহার্দ্যটা বেড়ে যাবে। পৃথিবী খুশি হবে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না!

সাকুরা বললে, তাহলে আপনাকে আগে ভাগে একটা কথা বলে রাখি। আপনারা আমাকে অব্যাহতি দিন, আমাকে অন্য কোন অভিযানে পাঠান। বর্তমান অবস্থায় ওর সঙ্গে এ দীর্ঘ অভিযানে যেতে আমি প্রস্তুত নই।

কারণটা জানতে চান না জ্ঞানবৃদ্ধ। তিনি শুধু মাথা নেড়ে প্রায় একটা স্বগতোক্তি করেন, ভুল, আমাদেরই ভুল! কিন্তু কোথায় ভুলটা হল?

—আমি একটা কথা বলব?

—বল?

—ভুলটা কোথায় তা আমি বুঝতে পেরেছি! এই পঞ্চাশ বছর সময়টা একটা মানবিক-বিবর্তনের পক্ষে অতি স্বল্প সময়। আমাদের সহস্র সহস্র বৎসরের ধ্যান-ধারণা যা 'জীনের' মাধ্যমে পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়েছি, তার প্রভাবেই এমনটা হচ্ছে। ল্যাবরেটারীতে জন্মালেও আমাদের রক্তের মধ্যে রয়ে গেছে সেই পৃথিবীর আদিম ধ্যান-ধারণার বীজ। ডরম্যাণ্ট রূপে। সুযোগ পাওয়া মাত্র এই কৃত্রিম

সমাজ-ব্যবস্থা ভেদ করে সেই আদিম সংস্কারগুলো মাথা চাড়া দিয়ে উঠ্ছে।

—বোধকরি তোমার কথাই সত্য।

—আরও কারণ আছে। সেই হেতুটা হচ্ছেন আপনারা!

—আমরা?

—হ্যাঁ। যাঁরা পৃথিবীতে জন্মেছেন। পৃথিবীতে বেড়ে উঠেছেন। আপনি নিজেকে একটু বিচার করে দেখুন রেভারেণ্ড। আপনি মনে প্রাণে শুক্রগ্রহের সভ্যতাকে গ্রহণ করতে পারেন নি। শুক্রগ্রহে ক্রস্-ব্রিডিং-এ এত রকমের ফুল ফুটিয়েছি আমরা, তবু চেরী-ফুলের অভাবে আপনি ক্ষুব্ধ। আপনার ঘরে যে ফ্রেস্কো আঁকিয়েছেন, তা কোনও শুক্রবাসী আধুনিক শিল্পীর 'টেনসর-ক্যালকুলাস'-ছন্দে আঁকা নয়—হকুসাইয়ের অনুলিপি। আপনি সেই টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রজীবনের স্মৃতি সযত্নে মনে পুষে রেখেছেন। শুক্রগ্রহের প্রযুক্তি-বিদ্যার অত্যুন্নতি ছাপিয়ে আপনার অন্তরে সঙ্গোপনে অনুরণিত হচ্ছে সেই প্রবাদটা—'নিক্কো এ কেক্কো'! যান্ত্রিক বিস্ময় নয়—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখেই মানুষ বলবে—অপূর্ব!

মহাস্থবির দুটি হাত বাড়িয়ে বলেন, ক্ষান্ত হও সাকুরা মা! আমাকে···আমাকে একটু আত্মসমীক্ষা করতে দাও!

—করুন! কিন্তু আমার কথাটা শেষ করতে দিন। আপনি তো 'মাতৃত্ব' কনসেপ্টটাকেই শুক্রগ্রহে অপাংক্তেয় করেছেন—তাহলে কথায় কথায় আমাকে সাকুরা-'মা' বলে ডাকেন কেন? মা-ছেলের সম্পর্কের যে মাধুর্য, তাও আপনি অবচেতন মনে লুকিয়ে রেখেছেন! যে ব্যবস্থা আপনি—হ্যাঁ, আপনিই এখানে প্রবর্তন করেছেন তা আপনিও মন থেকে গ্রহণ করতে পারেন নি।

সাকুর-কো উঠে দাঁড়ায়। বৃদ্ধ মহাস্থবির দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে থাকেন। সাকুরা-কো বলে, আপনি এবার আত্মসমীক্ষা করুন। পরে এসে খবর নেব।

এ ভাষায়, এভাবে ঐ মহাস্থবির জ্ঞানবৃদ্ধকে কখনও আঘাত করেনি সাকুরা-কো। কিন্তু আজ বোধ করি সে মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। তার রাগ হচ্ছিল, প্রচণ্ড রাগ হচ্ছিল—আর সব চেয়ে রাগ হচ্ছিল নিজের উপর। সে হেরে যাচ্ছে, সে হেরে গেছে—ঐ বিগ্রহী মানুষটার অন্ধ কুসংস্কারের কাছে তাকে তিল তিল করে নতি স্বীকার করতে হচ্ছে। রাগ হওয়াই স্বাভাবিক। তাই সে আজ ওভাবে আক্রমণ করে বসল শ্রদ্ধাভাজন মহাস্থবিরকে—ওর মনে হয় পরাজয়ের বীজ উনিই উপ্ত করেছেন ওর অন্তরে।

বৃদ্ধ মুখ তুলে বললেন, যাও মা। পরে আর এস না।

—বেশ! আসব না।

—না। সেজন্য নয়। পরে এলে আমার দেখা আর পাবে না।

সাকুরা-কো জবাব না দিয়ে হনহনিয়ে চলে যায়।

ব্রিগেডিয়ার ইমামামোতো তাঁর টেবিলের অপরপ্রান্তে-বসা একমাত্র শ্রোতাকে বলছিলেন, আপনি নিশ্চয় জানেন ডক্টর রায়,* আমাদের সূর্য এই গ্যালাক্টিক সিস্টেমের একটি নক্ষত্রমাত্র। আমাদের সেই গ্যালাকটিক সিস্টেম বা নক্ষত্র-জগত এত বিশাল যে, ধারণা করাই শক্ত। তার এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যেতে বেতার-তরঙ্গ সময় নেয় এক লক্ষ বৎসর। যদিও তার গতি সেকেণ্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার। ভাষান্তরে এই নক্ষত্র-জগত দৈর্ঘ্যে এক লক্ষ আলোকবর্ষ এবং গভীরতায় দশ হাজার আলোকবর্ষ। এক জোড়া মুখে-মুখে লাগানো ডিনার-প্লেটে-আবদ্ধ ঘটাকাশের মত তার আকৃতি। চিত্রে তার স্বরূপটা দেখা যাচ্ছে। মহাকাশে যদিচ এই নক্ষত্রজগতের

এমন কোন নক্ষত্র আছে কিনা, যেখানে বাঞ্ছনীয় দূরত্বে, বাঞ্ছনীয় আকারের গ্রহ বাঞ্ছনীয় পদ্ধতিতে দীর্ঘ দিন তার সূর্যকে পরিক্রমা করছে।

সেই অজ্ঞাত সূর্যের অজানা গ্রহে জীবনের বিকাশ অন্য ঢঙে হয়ে থাকতে পারে। তবে জীবন বলতে আমরা যা বুঝি, অর্থাৎ পৃথিবীর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি—গ্রহের বয়স পাঁচশত কোটি বছর হওয়া দরকার। কারণ পৃথিবীর জন্ম থেকে ঠাণ্ডা হতে, সমুদ্র ও অক্সিজেন জন্মাতেই তিন চার শ' কোটি বছর সময় লেগেছে। তারপর আদিম এক-কোষ বিশিষ্ট প্রথম-প্রাণ থেকে উন্নততর মানুষ বিবর্তিত হ'তেও একশ কোটি বছর লেগেছে। ফলে, সেই অজ্ঞাত গ্রহটির বয়স আন্দাজ চার পাঁচশ কোটি বছর হওয়া চাই। অর্থাৎ সেই গ্রহের সূর্য যেন সুস্থিত-অবস্থায় চার পাঁচশ কোটি বছর থাকেন। হার্ৎস্প্রাং-রাসেল তালিকায় যে নক্ষত্রগুলিকে 'মেন সিকোয়েন্স'-এ দেখা যাচ্ছে তারা সুস্থিত। তাদের তাপ বিকীরণ ছন্দে খুব একটা হের-ফের নেই। কিন্তু তারা যে সবাই চার-পাঁচশ শত কোটি বছর পাড়ি দিয়েছে এমন কথা বলতে পারি না। ওদের অনেকেই বয়সে নবীন। বিজ্ঞানীরা নানান হিসাব কষে বললেন, যে নক্ষত্রগুলি বর্ণালী-তালিকায় 'F_2 থেকে K_5' অংশের ভিতরে আছে তাদেরই অতটা বয়স হয়েছে। হিসাবে দেখা গেল—নক্ষত্র-জগতের যাবতীয় তারকার ভিতর মাত্র এক শতাংশ নক্ষত্র ঐ দুটি সর্তই পূরণ করছে। অর্থাৎ, এক নম্বর—তারা আছে সুস্থিত-অবস্থায়; দু-নম্বর—তাদের বর্ণালী ঐ F_2 থেকে K_5-এর মধ্যে। তা হোক, তারকার মোট সংখ্যাটাও যে দশ হাজার কোটি! তার মাত্র এক শতাংশও হচ্ছে একশ কোটি! সোজা কথায়—বোঝা গেল, আমাদের নক্ষত্র-জগতেই না হোক একশ কোটি নক্ষত্রের গ্রহে জীবন বিকশিত হওয়া সম্ভব।...আপনার এ পর্যন্ত বুঝতে কোন অসুবিধা হয়নি, ডক্টর রয়্?

পার্থিব বললে, না। আপনি এ পর্যন্ত যা বলেছেন, তা আমার মোটামুটি জানাই ছিল। বস্তুতপক্ষে একশ বছর আগেও বিজ্ঞান এগুলি জানত। আপনি বলে যান—

—আপনি তাহলে এ কথা নিশ্চয় জানেন যে, গ্যালিলিও প্রথম দূরবীন আবিষ্কার করার পর থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত পৃথিবীতে এমন কোন শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র নির্মাণ করা যায়নি যা দিয়ে অত দূরে অবস্থিত নক্ষত্রের গ্রহ-উপগ্রহ দেখতে পাওয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর শেষ পাদে যখন চন্দ্রলোকের আবহাওয়াহীন আকাশে লক্ষগুণ শক্তি সম্পন্ন দূরবীন বসানো গেল, তখনই এ জাতীয় অনু-সন্ধানের প্রকৃত সুযোগ এল। আপনি আরও জানেন, চন্দ্রলোকের এক অর্ধে শুক্র এবং অপর অর্ধে পৃথিবী দুটি পৃথক মানমন্দির বানিয়েছে। আমাদের বিজ্ঞানীরা ভেবে দেখলেন, দূরস্থিত নক্ষত্রে ঐ জাতীয় সংবাদ পেলেও আমাদের খুব কিছু লাভ নেই। তাই তাঁরা অপেক্ষাকৃত নিকটতর নক্ষত্রগুলিকেই বছরের পর বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। বস্তুত ওঁরা কুড়িটি নক্ষত্রকে বেছে নিয়েছিলেন—যাদের দূরত্ব বাইশ আলোকবর্ষের ভিতরে এবং যারা ঐ দুটি সর্তই পূরণ করছে। অর্থাৎ তারা আছে সুস্থিত-অবস্থায় এবং ঐ F_2-K_5 বর্ণালী রেখার ভিতরে। সেই কুড়িটি নক্ষত্রের পরিচয় এই রকম : (১১)

তালিকায় দেখুন, আমাদের সবচেয়ে কাছে আছে আলফা-সেণ্টরাই নক্ষত্র। মাত্র চার আলোকবর্ষ দূরে। কিন্তু সেটা একটি মাত্র নক্ষত্র নয়—তিনটি নক্ষত্রের সমাহার। যেন তিন নক্ষত্র-কন্যা অভিকর্ষের আনন্দে হাত ধরাধরি করে নাচছে। তিনটির মধ্যে যেটি আমাদের সবচেয়ে কাছে—প্রক্সিমা-সেণ্টরাই, সেটি একটি লাল-বামন। সেখানে কোন গ্রহে জীবের বিকাশ সম্ভব নয়। অপর দুটি বর্ণালী তালিকায় আশাপ্রদ স্থানে আছে। প্রথমটি আছে G অবস্থানে, প্রসঙ্গতঃ আমাদের সূর্যের অবস্থানও G_2-তে।

নক্ষত্র	দূরত্ব আলোকবর্ষ	বর্ণালী পরিচয়
আলফা-সেণ্টরাই A	৪'৩	G_2
আলফা-সেণ্টরাই B	৪'৩	K_4
এপ্সাইলন এরিডানি	১০'৮	K_2
৬১ সিগনাই A	১১'১	K_5
এপ্সাইলন ইণ্ডি	১১'৩	K_5
তাউ চেটি	১২'২	G_8
৭০ ওফিউচি A	১৭'৩	K_1
ঐ B	১৭'৩	K_5
ইটা ক্যালিওপিয়ী A	১৮'০	F_9
সিগ্মা ড্রাকনিস্	১৮'২	G_9
৩৬ ওফিউচি A	১৮'২	K_2
ঐ B	১৮'২	K_1
হারভার্ট ক্যাটালগ		
৭৭০৩ A	১৮'৬	K_2
ঐ ৫১৬৮ A	১৮'৮	K_4
ডেলটা পাভনিস	১৯'২	G_7
৮২ এরিডানি	২০'৯	G_5
বীটা হাইড্রা	২১'৩	G_1
হারভার্ট ক্যা. ৮৮৩২	২১'৪	K_3
পি এরিডানি A	২২'০	K_2
ঐ B	২২'০	K_2

দ্বিতীয়টিও আছে K_4-এ। ওদের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে প্রায় ৪৭ সৌর দূরত্ব (*)। বিজ্ঞানীরা দূরত্বটা শুনে বললেন, সে-ক্ষেত্রে ঐ তুটি যমজ নক্ষত্রের কোন গ্রহে জীব-বিকাশ সম্ভবপর নয়। ফলে, বাদ গেল নিকটতম প্রতিবেশীটি।

তালিকার অন্যান্য নক্ষত্রে অবশ্য যথেষ্ট গ্রহের সন্ধান মিলেছে (†)। কিন্তু আমরা নেতি-নেতি করে এমন একটি গ্রহকে খুঁজছি যা অন্তত নিম্নলিখিত সর্ত-চতুষ্টয়ের প্রত্যেকটি পূরণে সমর্থ :

(ক) সেই গ্রহ থেকে তার সূর্যের দূরত্ব বাঞ্ছনীয় সীমারেখা অতিক্রম করবে না। সেই সূর্যের তাপ বিকীরণ ছন্দ যদি আমাদের

(*) 'সৌর-দূরত্ব' বলতে পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব—নয় কোটি ত্রিশ লক্ষ মাইল বা পনের কোটি কিলোমিটার। যেহেতু বর্তমানে আমরা জীব বিকাশের কথা আলোচনা করছি, তাই দূরত্বের মাপকাঠিটা 'পারসেক' বা 'আলোকবর্ষের' বদলে সৌর-দূরত্ব করে নিই ; তাতে ধারণা করা সহজ হবে।

(†) এই তথ্যটি, বলা বাহুল্য লেখকের কল্পনা। ২৭০৬ সালের সম্ভাব্য তথ্য।

সূর্যের অনুরূপ হয়, তবে ঐ গ্রহের সৌর-দূরত্ব ০'৮ থেকে ১'২ সীমা-রেখার ভিতরে থাকা চাই। তার চেয়ে বেশি দূরে হলে গ্রহটি হবে অত্যন্ত শীতল, তার চেয়ে কাছে হলে অত্যন্ত উত্তপ্ত।

(খ) সেই গ্রহের ভর পৃথিবীর ভরের অন্তত দশভাগের একভাগ হতে হবে। তার চেয়ে কম হলে বাঞ্ছনীয় সৌর-দূরত্ব সত্ত্বেও গ্রহটি জীববিকাশের উপযুক্ত হবে না। কারণ তার অভিকর্ষ সে-ক্ষেত্রে এত কম হবে যে, 'আবহাওয়াকে' সে ধরে রাখতে পারবে না। 'আবহাওয়া' মহাকাশে বিলীন হয়ে যাবে। এর জলন্ত দৃষ্টান্ত—বরং বলা উচিত নিভন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে আমাদের চাঁদ। বাঞ্ছনীয় সৌর-দূরত্ব সত্ত্বেও চাঁদ মৃত—জীবনের বিকাশ সেখানে হতে পারেনি।

(গ) সেই গ্রহের ভর পৃথিবীর তুলনায় দুই হাজার গুণের বেশী হলেও চলবে না। কারণ তার বেশি হলে সেই গ্রহের অভিকর্ষ এত বেশি হবে, যাতে আবহাওয়ায় হাইড্রোজেনের অংশ হয়ে পড়বে অসহনীয়। যেমন, বৃহস্পতি গ্রহ যদি পৃথিবীর দূরত্বে সূর্যপ্রদক্ষিণ করত তাহলে অন্যান্য অসুবিধা না থাকলেও শুধুমাত্র ঐ কারণেই সেখানে জীবনের বিকাশ ঘটত না।

(ঘ) সেই গ্রহের আহ্নিক-গতি বা নিজ অক্ষের চারিদিকে ঘুর-পাক খাওয়ার ছন্দটা হওয়া চাই জুৎসই। শুক্র যেমন ধীর গতিতে ঘুরছে (২৪৩ পার্থিব দিনে এক পাক) তাতে দিনে হবে অসহ্য তাপ, রাত্রে হবে অত্যন্ত ঠাণ্ডা আবার বৃহস্পতি যেমন দ্রুত গতিতে ঘুরছে (মাত্র দশ ঘণ্টায় এক পাক) তাতে অন্যান্য জাতের অসুবিধা দেখা দেবে।

মোট কথা, বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলেছিলেন—দুই জাতের নক্ষত্রেই ঐ সর্ত চতুষ্টয় পূরণ-করতে-সমর্থ গ্রহ থাকা সম্ভব। দুই জাতের বলতে—একক-সঞ্চারী, যেমন আমাদের সূর্য, অথবা যুগ্ম-(দুই-তিন-চারও হতে পারে) তারকা, যেমন সিরাস কিম্বা আলফা-সেণ্টরাই ওঁরা (১২) একক-সঞ্চারীদের

মধ্যে ঐ বিশটি নক্ষত্রের তালিকা থেকে চারটি তারকাকে চিহ্নিত করে দিলেন—তাউ চেটি, সিগমা ড্রাকনিস্, ৮২ এরিডানি এবং বীটা হাইড্রি। যুগ্ম-তারকার ভিতরেও ওঁরা সম্ভাব্য-নক্ষত্র বলে চিহ্নিত করেছিলেন দুটিকে—এপ্‌সাইলন এরিডানি এবং এপ্‌সাইলন ইণ্ডি। ১৯৭৫ সাল থেকেই বিজ্ঞানীরা ঐ ছয়টি তারকার বিষয়ে উৎসাহী হয়ে ওঠেন। আমরা এত দিনে ওদের ভিতর একটি গ্রহ আবিষ্কার করেছি যেটি সব কয়টি সর্তই পূরণ করছে। গ্রহটির বয়স থেকে আমরা আন্দাজ করছি, সেখানে প্লাইওসিন যুগ শুরু হবার কথা। অর্থাৎ চারপেয়ে জীব এত দিনে দু-পায়ে দাঁড়াতে শিখেছে। এখনও হয়তো ওরা আগুন জ্বালাতে শেখেনি।

দীর্ঘ ভাষণ অন্তে ব্রিগেডিয়ার থামলেন। পার্থিব তন্ময় হয়ে মনশ্চক্ষে দেখতে থাকে সেই গ্রহটিকে—আদিম অরণ্যে যেখানে নয়া ঢঙের ম্যামথ আর স্যেবর-টুথ্‌ড্‌ টাইগারের সঙ্গে লড়াই করছে প্রায়-মানব দু-পেয়ে জন্তু! অদ্ভুত দৃশ্য! ওর তন্ময়তা ছুটে গেল ব্রিগেডিয়ারের কণ্ঠস্বরে : এনি কোশ্চেন, ডক্টর রয় ?

পার্থিব 'না'-য়ের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে। আধোবদনে সে কি যেন ভাবছে।

—ছয়টি নক্ষত্রের মধ্যে কোনটিতে আমরা অমন গ্রহের সন্ধান পেয়েছি জানবার কৌতূহল হচ্ছে না ?

পার্থিব মুখ তুলে তাকায়। হাসে। বলে, কৌতূহল জিনিসটা সব সময় ভাল নয় ব্রিগেডিয়ার। অত বেশি জানা ঠিক নয়। আমি পৃথিবীতে একদিন ফিরে যাওয়ার বাসনা রাখি। তবে হ্যাঁ, আমার মনে আর একটি প্রশ্ন জেগেছে। কথার কথা ধরে নিলাম, যে-নক্ষত্রটির কথা বলছেন, তার দূরত্ব বিশ আলোকবর্ষ! শুক্র বর্তমানে সবচেয়ে দ্রুতগতি যে মহাকাশযান পাঠাতে সমর্থ, সেটা ওখানে পৌঁছাতে কত সময় নেবে ?

—আপনার প্রশ্নটি সুপ্রযুক্ত। অন্তত: সহস্র বৎসর!

—সুতরাং কোন মরমানুষের পক্ষে সেখানে যাওয়া সম্ভবপর নয়, যে-হেতু হাজার বৎসর সে বাঁচবে না!

ব্রিগেডিয়ার একটুক্ষণ চুপ করে কি-যেন ভাবলেন। তারপর বললেন, না, ডক্টর! হয়তো মরমানুষের পক্ষে তা-সত্বেও জীবিত অবস্থায় সেখানে পেঁাছানো সম্ভব!

—কেমন করে?

ব্রিগেডিয়ার বলেন, ডক্টর রায়, আপনি 'হাইপার-স্পেস' বা 'সুপার-স্পেস' শব্দটা শুনেছেন?

—শুনেছি। ভাসা ভাসা ধারণা আছে। বুঝিয়ে বলুন।

—এক কথায় ওটা বুঝিয়ে বলতে পারব না। তবে মোটামুটি একটা ধারণা দিতে পারি। গত শতাব্দীর শেষপাদ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা ঐ 'সুপার-স্পেস' বা 'আধিভৌতিক জগত'কে শুধুমাত্র অঙ্কের খাতিরেই মেনে নিয়েছিলেন। তারপর ১৮৭০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে 'প্রিন্সটন ইন্সট্যাট অফ এ্যাডভান্সড স্টাডিস্' প্রতিষ্ঠানের জোসেফ ওয়েবার বিজ্ঞানজগতে একটি পেপার দাখিল করেন (১৩)। যার ফলে আধিভৌতিক জগত বা সুপার-স্পেসকে বিজ্ঞান মেনে নিতে বাধ্য হল। বিস্তারিত আলোচনা আপনার বোধগম্য হবে না—তবে এটুকু বলব, মেনে নেওয়া হল মহাবিশ্বে আমাদের চৈতন্যগ্রাহ্য জগতের সমান্তরালে একটা আধিভৌতিক ব্রহ্মাণ্ড আছে! এতদিন বোঝা যেত না—মৃত তারকার দল 'ব্ল্যাক-হোলে' বিলীন হয়ে কেমন করে অস্তিত্ব হারায়, বোঝা যেত না—নূতন নক্ষত্রজগত কোথা থেকে আদিম-উপাদান সংগ্রহ করছে। এখন ধরে নেওয়া হল—মৃত তারকার দল ঐ আধিভৌতিক জগতে চলে যায় বলেই তা আমাদের চৈতন্যগ্রাহ্য জগত থেকে বোঝা যায় না; এবং নূতন তারকার উপাদানও আসে ঐ সুপার-স্পেস থেকে! প্রশ্ন হচ্ছে, কোন মহাকাশ-যান যদি কোনক্রমে ঐ সুপার-স্পেস-এর সর্টকাট রাস্তাটা চিনে নিতে পারে, তাহলে বেতার বা আলোক-তরঙ্গের চেয়েও অল্পতর সময়ে সে লক্ষ্যস্থলে পেঁাছে যাবে।

—বলতে চান, সেই আকাশযান আলোক-তরঙ্গের চেয়েও দ্রুতগতিতে যাবে? আইনস্টাইনের থিয়োরি—

—না! আমি বলেছি, 'আলোক-তরঙ্গের চেয়েও অল্পতর সময়ে সে লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে যাবে।' ঐ সর্টকাট পথে লক্ষ্যস্থলের দূরত্বটাই যে কমে যাচ্ছে! একটা এ্যানালজি দিয়ে বোঝাই—ধরুন, কোন কারণে আপনি ডাইনে বাঁয়ে ফিরতে জানেন না, শুধু-মাত্র নাক-বরাবর চলতে জানেন। তাহলে টিকিট কাউন্টারের 'কিউ'-এ যে লোকটি ঠিক আপনার পিছনে দাঁড়িয়ে আছে তার কাছে পৌঁছাতে আপনাকে গোটা পৃথিবী ঘুরে আসতে হবে। অর্থাৎ চল্লিশ হাজার কি মি.! আপনি দ্রুততম জেট প্লেনে ছুটলেও আমার আগে তার কাছে পৌঁছাতে পারবেন না। কারণ আমি পাশ ফিরতে এবং পিছন ফিরতে জানি। আমি ধীরে সুস্থে একশ আশি ডিগ্রি ঘুরে আপনার আগেই সেই লোকটিকে ছুঁয়ে ফেলব!

পার্থিবের মনে পড়ে গেল, ছেলেবেলায় শোনা একটি পৌরাণিক কাহিনী—একবার নাকি কার্তিক আর গণেশের মধ্যে বিতর্ক হয়েছিল, কে বেশি করিৎ-কর্মা! তর্কে কোন মিমাংসা না হওয়ায় ওরা শেষবেশ মহাদেবকে বিচারক মনস্থ করল। মহাদেব বললেন, তা ঝগড়া কাজিয়ার দরকার কি? হাতে কলমে তোমাদের কেরামতিটা দেখাও। যাও, তোমরা তুজনেই ঝটপট ত্রি-ভুবন পরিক্রমা করে এস। যে আগে ফিরে আসতে পারবে সেই বেশি করিৎকর্মা। ছোট! ওয়ান…টু…থ্রি!

কার্তিক ডানে-বাঁয়ে না তাকিয়ে পড়ি-তো-মরি ময়ূরে রওনা হয়ে পড়েন। গণেশ মোটা মানুষ—তাঁর বাহনও ক্ষীণজীবী প্রাণী। তিনি ওসব হাঙ্গামায় গেলেন না। হেলতে তুলতে গৌরীপট-সমেত শিবলিঙ্গটি প্রদক্ষিণ করে এসে গ্যাঁট হয়ে বসলেন। যুক্তকরে বললেন, ওঁ শিবায় নমঃ! আমার ত্রি-ভুবন পরিক্রমা শেষ হয়েছে প্রভু!

বলা বাহুল্য বিদ্যুৎলাঞ্ছিতগতি কার্তিক তখনও ত্রিভুবন পাক মারছেন। শুক্রবাসীরাও সেই জ্ঞানী গণেশের মত কোনও 'ওঁ শিবায় নমঃ'-র আধিভৌতিক সর্টকাট রাস্তা খুঁজে পেল নাকি ?

ব্রিগেডিয়ার ইয়ামামোতো বলেন, আপনার আর কোন প্রশ্ন আছে ডক্টর রয় ?

—না। যেটুকু শুনেছি সেটুকুই আগে হজম করি।

—তাহলে আমার একটি প্রশ্ন আছে।

—বলুন ?

—শুক্র যদি অমন একটা অভিযানের আয়োজন করে তাহলে যে অভিযাত্রীকে তারা নির্বাচন করবে তার দুর্লভ সৌভাগ্য—একথা স্বীকার করেন ?

—নিশ্চয়। মানব সভ্যতার ইতিহাসে শাশ্বতকাল তার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। সে জীবিত ফিরে আসুক আর নাই আসুক।

—শুক্রগ্রহ যদি আপনাকেই নির্বাচন করে আপনি রাজী হবেন ?

—আপনি কি পরিহাস করছেন ?

—না, ডক্টর রায়। সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে, আপনার কাছে এই প্রশ্নটি পেশ করে জবাবটা জেনে নিতে।

একটু বিহ্বল হয়ে পড়ে পার্থিব। তবু বলে, আমি তো জ্যোতির্বিজ্ঞানী নই ?

—জ্যোতির্বিজ্ঞানী ছাড়া আমরা একজন জীববিজ্ঞানীকেও সেখানে পাঠাতে চাই। কারণ মূলতঃ জীবের সন্ধানেই এই অভিযান।

পার্থিব ম্লান হাসে। ওর মনে পড়ে যায় একটা গল্পের কথা: 'দ্য ম্যান হু নিউ টু মাচ্'। ওকে এভাবেই সরিয়ে ফেলতে চাইছেন জেনারেল কাওয়াবাতা। তা হোক। এ দুর্লভ সৌভাগ্য সে প্রত্যাখ্যান করবে না। মুহূর্তকাল ভেবে নিয়ে বললে, এ আমার পরম সৌভাগ্য। আমি সানন্দে রাজী।

ব্রিগেডিয়ার ওর করমর্দন করে বললেন, আমার অভিনন্দন গ্রহণ

করুন। আসুন, আমরা ব্যবস্থাটা পাকা করতে এখনই যাব হেড-কোয়ার্টার্সে। জেনারেল কাওয়াবাতা আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

জেনারেল কাওয়াবাতার কক্ষে প্রবেশ করেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে পার্থিব। ওকে এখানে এ-ভাবে দেখবে তা আশঙ্কা করেনি। আজ দু-সপ্তাহ পরে সাকুরা-কোকে দেখল সে। কাওয়াবাতার প্রকাণ্ড সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপাশে বসে আছে। সে যে পার্থিবকে দেখেছে তা বোঝা যায়—কারণ একবারও সে এদিকে ফিরল না।

—কনগ্র্যাচুলেসন্স ডক্টর রায়! আমি জানতাম, আপনি রাজা হবেন।

কাওয়াবাতার প্রসারিত কর গ্রহণ করে করমর্দন করে। পার্থিব আসন গ্রহণ করতেই কাওয়াবাতা বললেন, পরিচয় করিয়ে দিই, এ মহিলাটি—

বাধা দিয়ে পার্থিব বললে, উনি আমার পরিচিতা!

সাকুরা-কো যেন পাষাণ প্রতিমা। তিলমাত্র নড়ে বসল না। পার্থিব কিন্তু একটু অবাক হল ওর সাজ-গোজ দেখে। মেয়েটিকে চিরকাল পুরুষের পোষাকে দেখেছে। সার্ট-সর্ট অথবা ফুলপ্যাণ্ট। আজ ওর পরণে একটা মিশ্‌কালো কিমোনো। শুক্রগ্রহে ইতিপূর্বে কোন মহিলাকে ও কিমোনো পরতে দেখেছে বলে মনে করতে পারল না।

—আমি নিঃসন্দেহ যে, আপনারা নূতন বিশ্ব জয় করে সগৌরবে ফিরে আসবেন। তখন সারা সৌরজগতে আপনার নাম ছড়িয়ে পড়বে—

জেনারেল রীতিমত উচ্ছ্বসিত।

পার্থিব বলে, কিন্তু আমি তো নভোচারণের কিছুই জানি না।

যাত্রী হিসাবে বার তিন-চার মহাকাশ পাড়ি দিয়েছি যদিও, চালক হিসাবে আমার—

—জানি। এজন্য আপনাকে ট্রেনিং নিতে হবে। আমাদের যাত্রামুহূর্তটি ২০৭৮ খ্রীষ্টাব্দে। এখনও দু-বছর সময় আছে। আকাশযানের যাবতীয় যন্ত্রপাতি টুকরো টুকরো অবস্থায় চন্দ্রলোকে পাঠানো হচ্ছে। ওখানকার 'এসকেপ ভেলসিটি' অনেক কম। মূল মহাকাশযান ওখান থেকেই যাত্রা করবে। ফলে মহাকাশযাত্রার আগে আপনি আপনার পরিবারের সঙ্গেও মিলিত হতে পারবেন—

পার্থিব বলে, আমি ভাবছিলাম, এ অভিযানে কোন জীববিজ্ঞানীকে প্রথম পর্যায়েই পাঠানোর কি সত্যিই কোন প্রয়োজন আছে?

—আছে ডক্টর রয়, আছে। শুধু তাই নয়, শুক্রগ্রহের এই অভিযানে একজন পৃথিবীর মানুষ স্বেচ্ছায় যোগদান করলে সৌর-মণ্ডলের আন্তর্গ্রাহিক পরিস্থিতিটা কত উন্নত হবে ভেবে দেখুন।

—ঠিক আছে। আমি যে রাজী, একথা তো আগেই জানিয়েছি। এখন বলুন, আর কে কে আমার সহযাত্রী হবেন? এখন থেকেই আলাপ-পরিচয় করে রাখা ভাল।

—চূড়ান্ত নির্বাচন আর একজনেরই মাত্র হয়েছে। তিনি আপনার অপরিচিতা নন। আপনি সম্মত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাতে তিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন।

পার্থিবের দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ পড়ল মেয়েটির উপর। সে যেন পাথরের মূর্তি। অভিনন্দন জানানোর কোন লক্ষণ নেই তার। নির্বাক বসে আছে। পার্থিব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ায়। বলে, আমার অবশ্য আগেই এটা আশঙ্কা করা উচিত ছিল। সে যাই হোক, জেনারেল, সে-ক্ষেত্রে এ অভিযানের গৌরবভাগী হতে আমি অস্বীকৃত।

—সে কি! কেন? সাকুরা-কোর সঙ্গে তো আপনার···

—কারণটা হয়তো উনিই আপনাকে জানাবেন। আমার তরফে এটুকু শুধু বলতে পারি—আমাদের জীবনদর্শনে এমন মৌল পার্থক্য

আছে, যাতে উভয়ের পক্ষে একত্রে এ অভিযানে অংশ নেওয়া সম্ভবপর নয়।

জেনারেল মেয়েটির দিকে ঝুঁকে পড়ে তাকে বলেন, তুমিও কি তাই মনে কর? তুমি ওঁর সঙ্গে একত্রে—

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালো। প্রস্তর-প্রতিমা বাঙ্ময় হল এতক্ষণে। বললে, জেনারেল, আমি আপনার এম্প্লয়ী। আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রশ্ন ওঠে না। তবে প্রশ্ন যখন করলেন, তখন বলি—হ্যাঁ। আমি ওঁর সঙ্গে একমত। আমাদের জীবনদর্শনে যে মৌল পার্থক্য তা অনতিক্রম্য।

জেনারেল অশান্তভাবে পদচারণ করতে থাকেন: আমি দুঃখিত, আমি মর্মাহত। এমনটা যে ঘটতে পারে তা যে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

সাকুরা-কো বললে, আশা করি আমাকে আর আপনার প্রয়োজন নেই। আপনি অনুমতি করলে এবার শোকযাত্রায় যেতে পারি।

—শোকযাত্রা! কিসের শোক যাত্রা?—প্রশ্ন করে পার্থিব কাওয়াবাতাকে। কাওয়াবাতা ঘড়ি দেখে বললেন, ইয়েস! এবার আমাদের যাবার সময় হয়েছে। ডক্টর রায়। আজ আমাদের একটি জাতীয় শোকদিবস। শুক্রগ্রহের একজন বিশিষ্ট নাগরিক আজ মৃত্যুবরণ করেছেন। আপনি তাঁকে চেনেন। আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারের মহাস্থবির রেভারেণ্ড ফুজিসান।

—রেভারেণ্ড মারা গেছেন! কেমন করে? কী হয়েছিল তাঁর?

—আসুন। আমরা এবার সেখানেই যাব।

ওঁরা বের হয়ে এলেন। এতক্ষণে খেয়াল হল পার্থিবের—কালো-কিমোনো শোকের অভিব্যক্তি।

লোকে লোকারণ্য আজ চৈত্য-বিহার। শুক্রগ্রহের সবচেয়ে পণ্ডিত ব্যক্তিটি দেহ রেখেছেন। তাঁর কী হয়েছিল, কেমন করে

মারা গেলেন, চিকিৎসার কি আয়োজন হয়েছিল কেউ জানে না। ওদের গাড়ি গেটের সামনে আসতেই আরক্ষা-প্রহরীরা পথ করে দিল। লক্ষ লোকের জনতা স্তব্ধ, নীরব। শুধু মাত্র চৈত্য-মন্দির থেকে ভেসে আসছে এক প্রার্থনা সঙ্গীত। বৌদ্ধ সামগাথা: লোকুত্তমো তং পণমামি বুদ্ধম!

ওরা চারজনে গাড়ি থেকে নামল। প্রশস্ত সোপান অতিক্রম করে উঠে এল একটি প্রকাণ্ড হল-কামরায়। দীপাধারে আলোর মালা। ধূপের গন্ধে সঙ্ঘারাম আমোদিত। নেপথ্যে ত্রিপিকট-মন্ত্রের সঙ্গে ভেসে আসছে ধাতব ঘণ্টাধ্বনি। হল-কামরার কেন্দ্রস্থলে একটা উচ্চ বেদীতে কাচের অথবা প্ল্যাস্টিকের স্বচ্ছ শবাধারে তাঁর মরদেহ শায়িত। মহাশব আপাদমস্তক একটি চাদরে ঢাকা। মুখখানিও দেখা যাচ্ছে না। দর্শনপ্রার্থীরা একদিক দিয়ে ঢুকছে, অপর দিক দিয়ে বার হয়ে যাচ্ছে। কেউ কোন ফুলের স্তবক উপহার দিচ্ছে না কিন্তু। শুক্রে ফুল ছেঁড়া মানা। প্রতিটি ফুলের প্রতিটি পুংকেশর এবং গর্ভকেশর কাজে লাগাতে হবে। শুক্রের সতের কোটি বর্গমাইল ক্ষেত্রফল এখনও প্রধানত উষর, পাদপতৃষিত। শবাধারে শায়িত ঐ কয়েক কিলোগ্রাম ক্যাল্‌সিয়াম-ফস্‌ফরাস-নাইট্রোজেনের উদ্দেশ্যে তাই ফুল অপব্যয় করা চলবে না। এখানে উচ্চনীচ ভেদ নেই তা বলে। দর্শনার্থীর কিউ-য়ে দাঁড়াতে হল ওদের—জেনারেল কাওয়াবাতা সমেত। তিনি কোন ভি. আই. পি খাতির পেলেন না। সর্পিল গতিতে একসময় ওরা এসে পৌঁছালো মহাশবের সন্নিকটে। পার্থিব ব্রিগেডিয়ারকে জনান্তিকে বললে, ওঁর মুখের ঢাকাটা সরিয়ে নিলে হত না?

দোভাষী ছাড়া ব্রিগেডিয়ার বুঝবেন না। তিনি বিহ্বল হয়ে তাকালেন পার্শ্ববর্তী সাকুরা-কোর দিকে। সাকুরা-কো অনুবাদ করে তাঁকে শোনালো না। পার্থিবকে নিজেই জবাবে বলল, ওঁর মুখের ঢাকাটা সরিয়ে দিলে একটা বীভৎস-দৃশ্যে আঁৎকে উঠ্‌ত সবাই।

—বীভৎস-দৃশ্য। সে কি! কেন?

—অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু হয়েছিল ওঁর। উনি মারা গেছেন আমার চোখের সামনেই! আমাদের ল্যাবরেটারীতেই!

—বল কি! কী হয়েছিল ওঁর?

সাকুরা-কো জবাব দেবার অবকাশ পায় না। ততক্ষণে ওরা পৌঁচেছে। মহাশবের সম্মুখে। সাকুরা-কো জাপানী প্রথায় মৃতের প্রতি সম্মান জানাতে হাঁটু গেড়ে বসল। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেলল মেয়েটি!

জেনারেল সবই লক্ষ্য করেছেন, শুনেছেন। মেয়েটির বাহুমূল ধরে ওকে তুলে নেন। ওরা সরে আসে এক নির্জন অংশে। সেখানে কলকোলাহল নেই—দেওয়ালগিরির প্রদীপে আলোছায়ার মোহময় পরিবেশ। জেনারেল কাওয়াবাতা বললেন, ডক্টর রায়, আমার মনে হয় আপনাকে আমাদের সব কথা জানানো দরকার।···হ্যাঁ, সেই রকম নির্দেশই দিয়ে গিয়েছিলেন রেভারেণ্ড ফুজিসান—আপনার কাছে আমরা কিছুই গোপন করব না।

—কী কথা?—পার্থিব অবাক হয়ে জানতে চায়।

—রেভারেণ্ড কী-ভাবে মারা গেছেন।

—কী ভাবে?

—যে-মৃত্যু আপনার বরণ করার কথা ছিল স্বেচ্ছায় সেই মৃত্যুই বরণ করেছেন রেভারেণ্ড!

পার্থিব প্রশ্ন করতেও ভুলে যায়। জেনারেল বলতে থাকেন, আপনি জানেন, এখন আর গোপন করার চেষ্টা নিরর্থক···বিজ্ঞানের প্রয়োজনে কোন একজনকে ঐ বীভৎস মৃত্যু বরণ করতেই হত। সেই আঙ্গেলোকগুলো এবং ডাচ্-ছোকরাকে নিয়ে পরীক্ষা করার পরেও আরও একটি পরীক্ষা করা বাকি ছিল। তার জন্য আমরা আপনাকে রেখেছিলাম। কিন্তু·· বুঝতেই পারছেন···আমরা··· মানে, আপনার স্থলাভিষিক্ত করতে আর কোন মানুষকে এখানে

খুঁজে পাচ্ছিলাম না। শেষে রেভারেণ্ড—

রুখে ওঠে পার্থিব—ছি! ছি! ছি! অমন একটি মহাপ্রাণকে এভাবে নারকীয় যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করলেন আপনারা!

—প্লীজ ডক্টর রয়! ভুল বুঝবেন না! তিনি স্বেচ্ছায় এসেছিলেন। আমরা প্রথমটা অস্বীকৃত হই; কিন্তু তিনি শেষ পর্যন্ত আমাদের আদেশ করলেন। তাঁর আদেশ আমাদের কাছে অমোঘ ছিল! বিশ্বাস করুন, আমরা মর্মান্তিকভাবে দুঃখিত!

পার্থিবের ইচ্ছে করছিল ছুটে কোথাও বেরিয়ে যায়। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে একটু কাঁদে! জেনারেলকে বলে, আমি একটু একলা থাকতে চাই!

—অফ কোর্স! অফ কোর্স! তবে যাবার আগে একটা কথা বলি। উনি ডেথ্-চেম্বারে ঢুকবার আগে একখানা চিঠি আপনাকে লিখে আমার হাতে দিয়েছিলেন। এই চিঠিটা—

পার্থিব হাত বাড়িয়ে কাগজের টুকরাখানা নিল। খোলা হাত চিঠি, খামবন্ধ নয়। বললে, আপনি পড়েছেন?

—চেষ্টা করলেও পারতাম না। ভাষাটা আমার অজানা।

খোলা হাত-চিঠিটা নিয়ে পার্থিব কয়েকটি মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চৈত্য-বিহারের এই একান্ত কক্ষে। দেওয়াল-গিরির অস্পষ্ট আলোয় পরিবেশটা কেমন যেন মোহময়,—অপার্থিব নয়, পার্থিব; আর সেজন্যই ওর অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে, একবিংশ-শতাব্দীর শেষপাদে শুক্র-গ্রহের অত্যুন্নত সমাজ-ব্যবস্থার কেন্দ্রমূলে নয়, সে দাঁড়িয়ে আছে বাগোড়া-নদী-বিধৌত অজন্তাগুহার দশম চৈত্যে—দু-হাজার বছর আগেকার কোন কালে। দূর থেকে ভেসে আসছে বৌদ্ধ প্রার্থনা-গাথা আর ধাতব ঘণ্টা ধ্বনি। চন্দন-ধূপের একটা মৃদু-সৌগন্ধ ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পথে ওকে নিয়ে যাচ্ছে বিস্মৃত অতীতের কোন যুগে। চোখ তুলে দেখল—সৌজন্যবোধে ব্রিগেডিয়ার এবং জেনারেল ওকে একলা থাকার সুযোগ দিয়ে কখন ধীর পদে

নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেছেন গুহামন্দির থেকে। তবু সে ওখানে একা নয়। গুহার দূরতম প্রান্তে পাষাণচত্বরে বসে আছে নতনয়না সেই মেয়েটি, কোলের কাছে টেনে-আনা হাঁটুর উপর চিবুকটা রেখে। তার গাল বেয়ে নেমেছে জলের দুটি ধারা। বোধকরি ও মেনে নিয়েছে গ্রহান্তরের মানুষটির বক্তব্য : কারও চোখে দু-ফোঁটা জল ঝরতে না দেখলে মানুষ মরেও শান্তি পায় না!—শুক্রতনয়া দেবযাণী তাই আজ যেন প্রথম বেদনার আনন্দকে খুঁজে পেল!

দেওয়াল-গিরির স্তিমিত আলোয় ভাঁজ করা কাগজটা মেলে ধরল পার্থিব।

সাকুরা-কো নিশ্চয় জানে না—চিঠিতে কী লেখা আছে। তবু এটুকু যেন সে জানে, ঐ টুকরো কাগজটাতেই লেখা আছে তার বাকি জীবনের বিধিলিপি। তাই ও স্থানত্যাগ করতে পারেনি। তাই ও অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে।

গোটা-গোটা ঋজু অক্ষরে বাঙলা হরফে বাংলাভাষায় লেখা :

"পরমকল্যাণীয়েষু—

অনেক ভেবেছি তোমার প্রশ্নটা নিয়ে। মনে হয়—ভুল তোমরাও করেছ, ভুল আমরাও করেছি। ভুল ভুলই। তা শোধরানোই মানুষের ধর্ম। ইকুসাইয়ের প্রখর-নখর তরঙ্গের মৃত্যুগ্রাস যদি সত্য, তাহলে নাবিকদের ঐ নৌকা বাওয়াও সত্য। দুঃখের বেশে এগিয়ে আসা ঐ ভয়ঙ্করী মৃত্যুতরঙ্গকে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে ধরা, তাকে ফুজিসান পর্বতরূপে কল্পনা করাই তো শিল্পীর সাধনা—তাকে যে শেষ কথা বলে যেতে হবে : আমি মৃত্যু চেয়ে বড়!

আমার ভুলের মাশুল আমি দিয়ে গেলাম।

তোমরা দুজনেও যেন আর নতুন করে ভুল কর না।

প্রার্থনা করি : নূতন সূর্যের নূতন গ্রহে তোমরা নূতন অমৃত-লোক সৃজন কর!

আরও দুটি কথা। এখন মনে হচ্ছে, সেদিন তোমার প্রশ্নের

ভুল জবাব দিয়েছিলাম। আমাদের জ্ঞাত-জগত থেকে যদি চৈতন্যময় জীবনের চিহ্ন মুছে যায় তবে আমার ধ্যানের সেই ঈশ্বর—স্পিনোজার ঈশ্বর, আইনস্টাইনের ঈশ্বর, বোধকরি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলবেন। সেদিন তুমিও ভুল বলেছিলে। বলেছিলে: ব্যক্তি-কেন্দ্রিক মানসিকতায় মানুষ স্বার্থত্যাগ করতে পারে না, শহীদ হতে পারে না। কথাটা ঠিক নয়। দধিচী যখন তাঁর বুকের পাঁজর খুলে দেন, তখন যাচাই করে দেখেন না—দেবতারা তাঁর সগোত্র কিনা; নবকুমার যখন কাষ্ঠাহরণে যায় তখন এ-কারণে যায় না যে, নৌকার সহযাত্রীরা তার নিকট আত্মীয়।

কাষ্ঠাহরণের এইটাই বোধহয় রীতি।

তুমি আমার পুত্রতুল্য! তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি। সাকুরা-কো আমার মেয়ের মত, মায়ের মত—তাকে তো জানি; বড় অভিমানী সে। তাকে ভুল বুঝো না। নবকুমার নবকুমারীর প্রতি রইল আমার আশীর্বাদ। ইতি—

প্রথম পর্বের তথ্য উৎস

(১) "World Population Data Sheet 1958", Population Reference Bureau, Washington D. C.

(২) "Economic Growth of Nations," by Simon Kuznets (Cambridge). Harvard University Press, 1921.

(৩) "World Bank Atlas" (International Bank for Reconstruction & Development) Washington D. C. 1970.

(৪) "The Limits to Growth", Universe Books, N. Y. 1972. P. 48.

(৫) "Population, Resources & Environment", by Paul & Anne Ehrlich, Sanfrancisco 1958, P. 72.

(৬) "The Limits to Growth", P. 56-60.

(৭) U. N. Dept. of Economic & Social Affairs, Statistical Quality". American Govt. Publ., Washington D. C,, 1958, P. 158.

(৮) "The Carbon Cycle", by Bert Bolin, Scientific American, Sept '58, P. 131.

(৯) 'Thermal Pollution & Aquatic Life', by John. R. Clark, Scientific American, March '58, P. 18.

(১০) B. B. C. Broadcast, vide "Tomorrows World", by David Paterson, Leeds, P. 28.

(১১) Do. Do. P. 58.

(১৩) "Social Aspects of Population Dynamics", Journal of Mammalogy, Vol. 33, 1952, P. 139-59.
(১৪) B. B. C. Television Broadcast, 'Tomorrow's World'. by D. Paterson, P. 68.
(১৫) Do. Do. P. 71.
(১৬) 'The Next Ten Thousand Years', by A. Berry, 1958, P. 18.
(১৭) 'Hearings on Biological and Environmental Effects of Nuclear War', Special Subcommittee on Military Operations, Govt of America.
(১৮) P. 32.
(১৯) 'Climate and the Changing Sun', by E. J. Opik, Scientific Americans, June '58.
(২০) 'Intelligent Life in the Universe' by Carl Sagan & Iosif Schlovskii, (1958) P. 475. Also 'Galactic Explosions as Sources of Radio Emission', by G. R. Burbidge, 'Nature,'
(২১) 'Science & Sanctity of Life', by Sir. P. Medawater, 'Encounter', December 1958.
(২২) Shackleton's interview with Dr. Anthony Michaelis, reported in 'Daily Telegraph', Dec. 20, 1958.

দ্বিতীয় পর্বের তথ্য উৎস

(১) 'The Next Ten Thousand Years', A, Berry, June 1958 (P. 48).

(২) 'Journal of Vacuum Science & Technology', Vol. 3, No. 2, 1958.

(৩) 'Extraterrestrial Imperative', Bulletin of the American Scientists, Nov. '71.

(৪) 'The Next Ten Thousand Years', A. Berry (P. 56).

(৫) 'Report on Planet Three & Other Speculations', by Arthur C. Clarke, 1958.

(৬) 'Time' Magazine, October 25 (1958). P, 59.

(৭) NASA Technical Memorandum No T M. X-58061 presented to the American Institute of Chemical Engineers, National Symposium at Houston, Texas. March 1-6, 1958.

(৮) 'The Next Ten Thousand Years', by A Berry (P, 44).

(৯) 'The Challange of the Stars', by P. Moore & D. A. Hardy.

(১০) 'Intelligent Life in the Universe', by Carl Sagan & Shklovskii, P. 263.

(১১) 'Journey to Mars', by Kenneth F. Weaver, National Geography, Feb. 73.

(১২) 'The Search For Life on Mars', by Kenneth F. Weaver Nationel Geography, Feb. 73.

(১৩) 'The Challange of tbe Stars', by Patric Moore & D. A. Hardy. (P. 22).

(১৪) 'Brave New World', Aldous Huxley, Penguine Publ, 1931.